ফেলুদা সমগ্র

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদনা - অরিজিৎ চক্রবর্ত্তী (দিন্দা)

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলুদা এমন একটি নাম, যে নাম চিরকাল তার স্রষ্টার নামের মতই অমর থাকবে। সত্যজিৎ রায় তার জীবনে ফেলুদাকে নিয়ে ১৭টি উপন্যাস আর ১৮টি গল্প লিখেছেন। তবে সবসময় সবার পক্ষে সব বই কিনে পড়া সম্ভব হয় না, আবার ইন্টারনেটেও সব বই একসাথে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই প্রয়াস, আর এটা তখন-ই সফল হবে যদি পাঠকদের এটা পছন্দ হয়।।

- দিন্দা

উপন্যাস

বাদশাহী আংটি

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

সোনার কেল্লা

বাক্স রহস্য

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

জয় বাবা ফেলুনাথ

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

গোঁসাইপুর সরগরম

গোরস্থানে সাবধান

ছিন্নমস্তার অভিশাপ

হত্যাপুরী

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

টিনটোরেটোর যীশু

দার্জিলিং জমজমাট

নয়ন রহস্য

রবার্টসনের রুবি

গল্প

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি

কৈলাশ চৌধুরীর পাথর

শেয়াল দেবতা রহস্য

সমাদ্দারের চাবি

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

গোলোকধাম রহস্য

নেপোলিয়নের চিঠি

অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

বোসপুকুরে খুনখারাপি

অপ্সরা থিয়েটারের মামলা

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

শকুন্তলার কণ্ঠহার

লণ্ডনে ফেলুদা

ডাঃ মুনসীর ডায়রি

গোলাপী মুক্তা রহস্য

ইন্দ্রজাল রহস্য

কমিকস্

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

গোঁসাইপুর সরগরম

দার্জিলিং জমজমাট

রবার্টসনের রুবি

শেয়াল দেবতা রহস্য

নেপোলিয়নের চিঠি

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ ফেলুদা

বাক্স রহস্য (প্রথম খসড়া)

তোতা রহস্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খসড়া)

আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার

প্রবন্ধ

আমি আর ফেলুদা - সন্দীপ রায়

ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে

উঠ বনাম ট্রেন

ফেলুদা - সৌমিত্র না সব্যসাচী

উপন্যাস সমগ্র

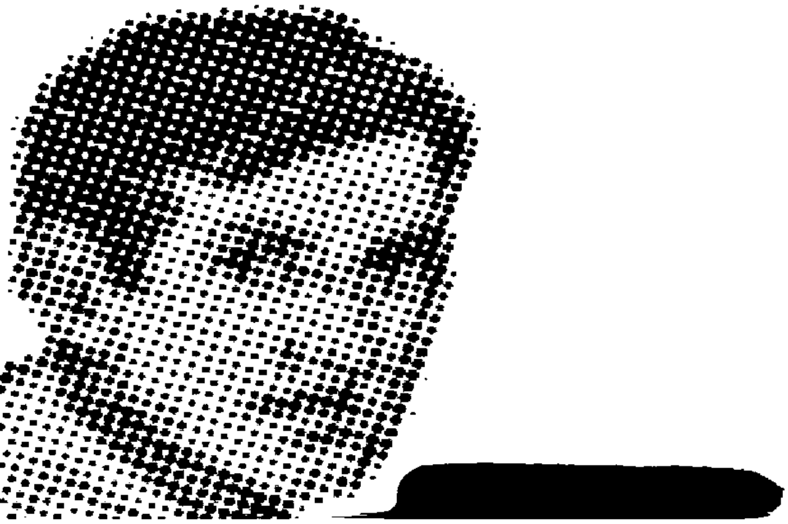

বাদশাহী আং

Pradosh C. Mitte

Private Investigat

বাদশাহী আংটি

॥ ১ ॥

বাবা যখন বললেন, 'তোর ধীরুকাকা অনেকদিন থেকে বলছেন—তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিটা লখ্নৌতেই কাটিয়ে আসি'—তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল লখ্নৌটা বেশ বাজে জায়গা। অবিশ্যি বাবা বলেছিলেন ওখান থেকে আমরা হরিদ্বার লছমনঝুলাও ঘুরে আসব, আর লছমনঝুলাতে পাহাড়ও আছে—কিন্তু সে আর কদিনের জন্য ? এর আগে প্রত্যেক ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি। আমার পাহাড়ও ভাল লাগে, আবার সমুদ্রও ভাল লাগে। লখ্নৌতে দুটোর একটাও নেই। তাই বাবাকে বললাম, 'ফেলুদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে ?'

ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন, ওকে ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটনা সব গজিয়ে ওঠে। আর সত্যিই, দার্জিলিং-এ যেবার ও আমাদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেবারই রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল। তেমন যদি হয় তা হলে জায়গা ভাল না হলেও খুব ক্ষতি নেই।

বাবা বললেন, 'ফেলু তো আসতেই পারে, কিন্তু ও যে নতুন চাকরি নিয়েছে, ছুটি পাবে কি ?'

ফেলুদাকে লখ্নৌয়ের কথা বলতেই ও বলল, 'ফিফ্‌টি-এইটে গেস্‌লাম—ক্রিকেট খেলতে। জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়। বড়াইমামবড়ার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তোর চোখ আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে। নবাব-বাদশাহের কী ইম্যাজিনেশন ছিল—বাপ্‌রে বাপ্ !'

'তুমি ছুটি পাবে তো ?'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর শুধু

ভুলভুলাইয়া কেন—গুম্‌তী নদীর ওপর মাঙ্কি ব্রিজ দেখবি, সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি দেখবি।'

'রেসিডেন্সি আবার কী ?'

'সেপাই বিদ্রোহের সময় গোরা সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা। কিস্যু করতে পারেনি। ঘেরাও করে গোলা দেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সেপাইরা।'

দুবছর হল চাকরি নিয়েছে ফেলুদা, কিন্তু প্রথম বছর কোনও ছুটি নেয়নি বলে পনেরো দিনের ছুটি পেতে ওর কোনও অসুবিধে হল না।

এখানে বলে রাখি—ফেলুদা আমার মাসতুতো দাদা। আমার বয়স চোদ্দো, আর ওর সাতাশ। ওকে কেউ কেউ বলে আধপাগলা, কেউ কেউ বলে খামখেয়ালি, আবার কেউ কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়। আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকে পারে। তা ছাড়া ও ভাল ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু একটু হিপ্‌নটিজম্‌ জানে, ডান হাত আর বাঁ হাত দুহাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমারি এত ভাল ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো 'দেবতার গ্রাস' মুখস্থ করেছিল।

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটি হল—ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ শিখে নিয়েছে। তার মানে অবশ্যি এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেক্‌টিভ।

সেটা বোঝা যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

যেমন্‌ লখ্‌নৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরুকাকাকে দেখেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল, 'তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ ?'

আমি যদিও জানতাম ধীরুকাকার বাগানের কথা, ফেলুদার কিন্তু

মোটেই জানার কথা নয়, কারণ, যদিও ফেলুদা আমার মাসতুতো ভাই, ধীরুকাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন, বাবার ছেলেবেলার বন্ধু।

তাই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী করে জানলে ?'

ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল, 'উনি পিছন ফিরলে দেখবি ওঁর ডান পায়ের জুতোর গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ পাতার ডগা বেরিয়ে আছে। আর ডান হাতের তর্জনীটায় দেখ টিনচার আয়োডিন লাগানো। সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল ঘাঁটার ফল।'

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখ্‌নৌ শহরটা আসলে খুব সুন্দর। গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চারদিকে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার, আর তাতে মোটরগাড়ি ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম। তার একটার নাম টাঙ্গা আর অন্যটা এক্কা। 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'—এই জিনিসটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম। ধীরুকাকার পুরনো সেভ্রোলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো ওরই একটাতে চড়তে হত।

যেতে যেতে ধীরুকাকা বললেন, 'এখানে না এলে কি বুঝতে পারতে শহরটা এত সুন্দর ? আর কলকাতার মতো আবর্জনা কি দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটে ? আর কত গাছ দেখো, আর কত ফুলের বাগান।'

বাবা আর ধীরুকাকা পিছনে বসেছিলেন, ফেলুদা আর আমি সামনে। আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরুকাকার ড্রাইভার দীনদয়াল সিং। ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ভুলভুলাইয়ার কথাটা জিজ্ঞেস কর।'

ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না। তাই বললাম, 'আচ্ছা ধীরুকাকা, ভুলভুলাইয়া কী জিনিস ?'

ধীরুকাকা বললেন, 'দেখবে দেখবে—সব দেখবে। ভুলভুলাইয়া হল ইমামবড়ার ভেতরে একটা গোলকধাঁধা। আমরা

বাঙালিরা অবিশ্যি বলি ঘুলঘুলিয়া, কিন্তু আসল নাম ওই ভুলভুলাইয়া। নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন ওই গোলকধাঁধায়।'

এবার ফেলুদা নিজেই বলল, 'ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে নাকি আর বেরোনো যায় না?'

'তাই তো শুনিচি। একবার এক গোরাপল্টন—অনেকদিন আগে—মদটদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে। বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে—ও নিজেই বেরিয়ে আসবে। দুদিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলকধাঁধার এক গলিতে।'

আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই টিপটিপ করতে শুরু করেছে।

ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি একা গিয়েছিলে, না গাইড নিয়ে?'

'গাইড নিয়ে। তবে একাও যাওয়া যায়।'

'সত্যি?'

আমি তো অবাক। তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'কী করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা?'

ফেলুদা চোখটা ঢুলুঢুলু করে ঘাড়টা দুবার নাড়িয়ে চুপ করে গেল। বুঝলাম ও আর কথা বলবে না। এখন ও শহরের পথঘাট বাড়িঘর লোকজন এক্কা টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে।

ধীরুকাকা কুড়ি বছর আগে লখ্নৌতে প্রথম আসেন উকিল হয়ে। সেই থেকে এখানেই আছেন, এবং এখন নাকি ওঁর বেশ নামডাক। কাকিমা তিনবছর হল মারা গেছেন, আর ধীরুকাকার ছেলে জার্মানির ফ্র্যাংকফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাড়িতে এখন উনি থাকেন, ওঁর বেয়ারা জগমোহন থাকে, আর রান্না করার বাবুর্চি আর একটা মালী। ওঁর বাড়িটা যেখানে সে জায়গাটার নাম সেকেন্দার বাগ, স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। বাড়ির সামনে গেটের উপর লেখা—'ডি. কে. সান্যাল এম. এ., বি.এল. বি., অ্যাডভোকেট'। গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর

ঢালা রাস্তার পর একতলা বাড়ি, আর রাস্তার দুদিকে বাগান। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মালী 'লন মোয়ার' দিয়ে বাগানের ঘাস কাটছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা বললেন, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছ, আজ আর বেরিয়ো না। কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা যাবে।' তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের ম্যাজিক শিখেছি। ফেলুদা বলে—'ইন্ডিয়ানদের আঙুল ইয়োরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিব্‌ল। তাই হাত সাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ।'

বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউক্যালিপটাস্ গাছটার পাশে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি, তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। ফেলুদা না দেখেই বলল 'ফিয়াট'। তারপর রাস্তার পাথরের উপর দিয়ে খচমচ খচমচ করতে করতে ছাই রঙের সুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন। চোখে চশমা, রং ফরসা আর মাথার চুলগুলো বেশির ভাগই সাদা। কিন্তু তাও দেখে বোঝা যায় যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয়।

ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন, 'জগমোহন, আউর এক কুরসি লাও', তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—ইনি ডক্টর শ্রীবাস্তব, আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'নার্ভাস হয়ে আছে। তোর বাবাকে নমস্কার করতে ভুলে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'শ্রীবাস্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ, আর একেবারে খাস্ লখনৌইয়া।'

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি?'

আমি বললাম, 'না।'

'হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার। অস্টিও আর অস্থি—মিলটা লক্ষ করিস। অস্থি মানে হাড় সেটা জানিস তো?'

'তা জানি।'

আরেকটা বেতের চেয়ার এসে পড়াতে আমরা সকলেই বসে পড়লাম। ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা তুলে আরেকটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন, এমন সময় বাবা একটু খুক্ খুক্ করে কাশাতে 'আই অ্যাম সো সরি' বলে রেখে দিলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'আজ যেন তোমায় একটু ইয়ে বলে মনে হচ্ছে। কোনও কঠিন কেসটেস দেখে এলে নাকি?'

বাবা বললেন, 'ধীরু, তুমি বাংলায় বলছ—উনি বাংলা বোঝেন বুঝি?'

ধীরুকাকা হেসে বললেন, 'ওরে বাবা, বোঝেন বলে বোঝেন! তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও না।'

শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, 'আমি বাংলা মোটামুটি জানি। ট্যাগোরও পড়েছি কিছু কিছু।'

'বটে?'

'ইয়েস। গ্রেট পোয়েট।'

আমি মনে মনে ভাবছি। এই বুঝি কবিতার আলোচনা শুরু হয়, এমন সময় কাঁপা হাতে তারই জন্যে ঢালা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু আসিয়াছিল।'

ডাকু? ডাকু আবার কে? আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা ছেলে আছে যার ডাকনাম ডাকু।

কিন্তু ধীরুকাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

'সেকী—ডাকাত তো মধ্য প্রদেশেই আছে বলে জানতাম। লখ্‌নৌ শহরে আবার ডাকাত এল কোত্থেকে?'

'ডাকু বলুন, কি চোর বলুন। আমার অঙ্গুরীর কথা তো আপনি জানেন মিস্টার সানিয়াল?'

'সেই পিয়ারিলালের দেওয়া আংটি? সেটা কি চুরি গেল নাকি?'

'না, না। লেকিন আমার বিশ্বাস কি, ওই আংটি নিতেই চোর আসিল।'

বাবা বললেন, 'কী আংটি?'

শ্রীবাস্তব ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনি বোলেন। উর্দুভাষা এঁরা বুঝবেন না আর অত কথা আমার বাংলায় হোবে না।'

ধীরুকাকা বললেন, 'পিয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখ্নৌ-এর নামকরা ধনী ব্যবসায়ী। জাতে গুজরাটি। এককালে কলকাতায় ছিলেন। তাই বাংলাও অল্প অল্প জানতেন। ওর ছেলে মহাবীরের যখন বারো কি তেরো বছর বয়স, তখন তার একটা কঠিন হাড়ের ব্যারাম হয়। শ্রীবাস্তব তাকে ভাল করে দেন। পিয়ারিলালের স্ত্রী নেই, দুই ছেলের বড়টি টাইফয়েডে মারা যায়। তাই বুঝতেই পারছ, সবেধন নীলমণিটিকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীবাস্তবের উপর পিয়ারিলালের মনে একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই মারা যাবার আগে তিনি তাঁর একটা বহুমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান।'

বাবা বললেন, 'কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'লাস্ট জুলাই। তিনমাস হল। মে মাসে ফার্স্ট হার্ট অ্যাটাক হল। তাতেই প্রায় চলে গিয়েছিলেন। সেই টাইমে আংটি দিয়েছিলেন আমায়। দেবার পরে ভাল হয়ে উঠলেন। তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড অ্যাটাক হল। তখনও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিন দিনে চলে গেলেন।...এই দেখুন—'

শ্রীবাস্তব তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাই-এর বাক্সর চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বার করে ঢাকনাটা খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল।

তারপর শ্রীবাস্তব এদিক ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে আংটিটা বার করলেন।

দেখলাম আংটিটার উপরে ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনির সাইজের ঝলমলে পাথর—নিশ্চয়ই হিরে—আর তাকে ঘিরে লাল নীল সবুজ সব আরও অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর।

এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনওদিন দেখিনি।

ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে পাকাচ্ছে, যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে।

বাবা বললেন, 'দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরনো। এর কোনও ইতিহাস আছে নাকি ?'

শ্রীবাস্তব একটু হেসে আংটিটা বাক্সে পুরে বাক্সটা পকেটে রেখে চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তা একটু আছে। এর বয়স তিনশো বছরের বেশি। এ আংটি ছিল আওরঙ্গজেবের।'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী! আমাদের আওরঙ্গজেব বাদশা ? শাজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেব ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হ্যাঁ—তবে আওরঙ্গজেব তখনও বাদশা বনেননি। গদিতে শাজাহান। সমরকন্দ দখল করবেন বলে ফৌজ পাঠাচ্ছেন বার বার—আর বার বার ডিফিট হচ্ছে। একবার আওরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল। আওরঙ্গজেব মার খেলেন খুব। হয়তো মরেই যেতেন। এক সেনাপতি সেভ করল। আওরঙ্গজেব নিজের হাত থেকে আংটি খুলিয়ে তাকে দিলেন।'

'বাবা! এ যে একেবারে গল্পের মতো।'

'হ্যাঁ। আর পিয়ারিলাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেনাপতির এক বংশধরের কাছ থেকে আগ্রাতে। দাম কত ছিল তা পিয়ারিলাল

বলেননি। তবে—দ্যাট বিগ স্টোন ইজ ডায়মন্ড, আমি যাচাই করিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন কতো দাম হোবে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কমপক্ষে লাখ দুয়েক। আরওরঙ্গজেব না হয়ে যদি জাহান্নম খাঁ হত, তা হলেও লাখ দেড়েক হত নিশ্চয়ই।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'তাইতো বলছি—কালকের ঘটনার পর খুব আপসেট হয়েছি। আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি। আজ যদি পুলিশকে বলি, কাল আমি বাইরে গেলে রাস্তায় কেউ যদি ইট পাটকেল ছুঁড়িয়ে মারে? একবার ভেবেছিলাম কি কোনও ব্যাঙ্কে রেখিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম—এত সুন্দর জিনিস বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়েও আনন্দ। ওই জন্যেই তো রেখে দিলাম নিজের কাছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'অনেককে দেখিয়েছেন ও আংটি?'

'মাত্র তিনমাস হল তো পেলাম। আর আমার বাড়িতে খুব বেশি কেউ তো আসে না। যাঁরা এলেন—বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, তাঁদেরই দেখিয়েছি।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ইউক্যালিপ্টাসের মাথায় একটু রোদ লেগে আছে, তাও বেশিক্ষণ থাকবে না। শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না।

ধীরুকাকা বললেন, 'চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার।'

আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে। ও সোফাতে বসেই পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বার করে হাতসাফাই প্র্যাকটিস করতে লাগল।

বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু যখন বলেন তখন বেশ ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় বলেন। বাবা বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা এসেছিল? আপনার অন্য কোনও জিনিস চুরি যায়নি? এমনও তো হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর, টাকাকড়ি নিতেই এসেছিল?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ব্যাপারটা কী বলি। বনবিহারীবাবু আছেন

বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর-টোর আসে না। আর আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আর তার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিলিমোরিয়া—বোথ ভেরি রিচ। আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। তাদের কাছে আমি কী? তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর?'

ধীরুকাকা বললেন, 'তারা যেমন ধনী, তেমনি তাদের পাহারার বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই খুব জমকালো। সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে কেন? তারা তো বিরাট ধনদৌলতের আশায় যাবে না। শ' পাঁচেক টাকা মারতে পারলে তাদের ছ মাসের খোরাক হয়ে যায়। কাজেই আমার-আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হবার কিছু নেই।'

শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। উনি বললেন, 'আমি জানি না মিস্টার সানিয়াল—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই আংটি নিতেই এসেছিল। আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি খুলেছিল। দেরাজ খুলেছিল। তাতে অন্য জিনিস ছিল। নিতে পারত। টাইম ছিল। আমার ঘুম ভাঙতে চোর পালিয়ে গেলো, একেবারে কিচ্ছু না নিয়ে। আর, কথা কী জানেন?—'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন। তারপর ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'পিয়ারিলাল যখন আমাকে আংটি দিয়েছিলেন, তখন মনে হল কী—উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। তাই আমাকে দিয়ে দিলেন। আউর—'

শ্রীবাস্তব আবার থেমে ভ্রূকুটি করলেন।

ধীরুকাকা বললেন—'আউর কেয়া, ডক্টরজি?'

শ্রীবাস্তব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্বিতীয়বার যখন হার্ট অ্যাটাক হল, আর আমি ওঁকে দেখতে গেলাম, তখন উনি একটা কিছু আমাকে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তবে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কী কথা?'

'দুবার বলেছিলেন—"এ স্পাই..." "এ স্পাই..."।'

ধীরুকাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

'না ডক্টরজি—পিয়ারিলাল যাই বলে থাকুক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চোর সাধারণ চোর, ছ্যাঁচড় চোর। আপনি বোধহয় জানেন না, ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্তিরের বাড়িতেও রিসেন্টলি চুরি হয়ে গেছে। একটা আস্ত রেডিয়ো আর কিছু রুপোর বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। তবে আপনার যদি সত্যিই নার্ভাস লাগে, তা হলে আপনি ও আংটি স্বচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন। আমার গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা, তারপর আপনার ভয় কেটে গেলে পর আপনি ওটা ফেরত নিয়ে যাবেন।'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ হাঁফ ছেড়ে একগাল হেসে ফেললেন।

'আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম, লেকিন নিজে থেকে বলতে পারছিলাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, মিস্টার সানিয়াল। আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।'

শ্রীবাস্তব তাঁর পকেট থেকে আংটি বার করে ধীরুকাকাকে দিলেন, আর ধীরুকাকা সেটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

এইবার ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল।

'বনবিহারীবাবু কে?'

'পার্ডন?' শ্রীবাস্তব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি বললেন না যে, বনবিহারীবাবু পাড়ায় আছেন বলে চোর-টোর আসে না—এই বনবিহারীবাবুটি কে? পুলিশ-টুলিশ নাকি?'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ও নো নো। পুলিশ না। তবে পুলিশের বাড়া। ইন্টারেস্টিং লোক। আগে বাংলাদেশে জমিদারি ছিল। তারপর সেটা গেল—আর উনি একটা ব্যবসা শুরু করলেন। বিদেশে জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা।'

'জানোয়ার?' বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হাঁ। টেলিভিশন, সার্কাস, চিড়িয়াখানা—এইসবের জন্য এদেশ থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এইসব জায়গায়। অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে। বনবিহারীবাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন। তারপর রিটায়ার করে এখানে চলে এলেন আজ দু-তিন বছর। আর আসার সময়

সঙ্গে সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন।'

বাবা বললেন, 'বলেন কী—ভারী অদ্ভুত তো।'

'হাঁ। আর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশালিটি হল কি, ওর প্রত্যেক জানোয়ার হল ভারী...ভারী...কী বলে—'

'হিংস্র ?'

'হাঁ, হাঁ—হিংস্র।'

লখ্‌নৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব ভাল। ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না। জাল দিয়ে ঘেরা দ্বীপের মতন তৈরি করা আছে, তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় আর গুহার মধ্যে থাকে ওরা। তার উপর আবার এই প্রাইভেট চিড়িয়াখানা!

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওঁর কাছে। হাইনা আছে, কুমির আছে, স্করপিয়ন আছে। আওয়াজ শুনা যায়। চোর আসবে কী করিয়ে?'

এর পরে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা আমার আগেই সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলল।

'চিড়িয়াখানাটা একবার দেখা যায় না?'

ধীরুকাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। যে কোনও দিন গেলেই হল। উনি মানুষটি মোটেই হিংস্র নন।'

শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন। বললেন, 'লাটুশ রোডে আমার এক পেশেন্ট আছে। আমি চলি।'

আমরা সবাই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম। ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ধীরুকাকাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। বাবা আর ধীরুকাকা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফেলুদা সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, এমন সময় হুশ্‌ করে একটা কালো গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল।

ফেলুদা বলল, 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। নম্বরটা মিস্‌ করে গেলাম।'

আমি বললাম, 'নম্বর দিয়ে কী হবে ?'

'মনে হল শ্রীবাস্তবকে ফলো করছে। রাস্তায় ওদিকটা কেমন অন্ধকার দেখছিস ? ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল। আমাদের গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করল দেখলি না ?'

এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল।

বাড়ির গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। আমার আন্দাজ আছে, কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্ড্রেড ইয়ার্ডস দৌড়েছি। ধীরুকাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। জানালা দিয়ে ভিতরের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে। বাবা আর ধীরুকাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই জানালার দিকে দেখছে। ওর চোখে ভ্রূকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত।

'জানিস তোপ্‌সে—'

আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয়। ফেলুদা তপেশ থেকে তোপ্‌সে করে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'কী ?'

'আমি থাকতে এ ভুলটা হবার কোনও মানে হয় না।'

'কী ভুল ?'

'ওই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। গেট থেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইলেক্‌ট্রিক লাইট হলে তাও বা কথা ছিল, কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন ফ্লুয়োরেসেন্ট।'

'তাতে কী হয়েছে ?'

'তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস ?'

'শুধু মাথাটা। উনি যে চেয়ারে বসে আছেন।'

'ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল ?'

'ডক্টর শ্রীবাস্তব।'

'আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেবার সময় উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে ?'

'এর মধ্যেই ভুলে যাব ?'

'সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থেকে থাকলে তার পক্ষে ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয়।'

'এই রে! কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছ কেন?'

ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের উপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা সিগারেটের টুকরো।

'মুখটা ভাল করে লক্ষ কর।'

আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম, আর রাস্তার ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেখবার সেটা দেখে নিলাম।

ফেলুদা হাত বাড়িয়েই সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল।

'কী দেখলি?'

'চারমিনার। আর যে লোকটা খাচ্ছিল, তার মুখে পান ছিল, তাই পানের দাগ লেগে আছে।'

'ভেরি গুড। চ' ভেতরে চ'।'

রাত্রে শোবার আগে ফেলুদা ধীরুকাকার কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিল। ওর যে পাথর সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না। ল্যাম্পের আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগল—

'এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস, এগুলোকে বলে স্যাফায়ার, যার বাংলা নাম নীলকান্ত মণি। লালগুলো হচ্ছে চুনি অর্থাৎ রুবি, আর সবুজগুলো পান্না—এমারেল্ড। অন্যগুলি যতদূর মনে হচ্ছে পোখরাজ—যার ইংরেজি নাম টোপ্যাজ। তবে আসল দেখবার জিনিস হল মাঝখানের ওই হিরেটা। এমন হিরে হাতে ধরে দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না।'

তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলে পরে বলল, 'আওরঙ্গজেবের আঙুল আর আমার আঙুলের সাইজ মিলে যাচ্ছে, দেখেছিস।'

সত্যিই দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে।

ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা বলল, 'কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ আংটির সঙ্গে

কে জানে। তবে কী জানিস তোপ্‌সে—এর অতীতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট্‌ নেই। এটা আওরঙ্গজেবের ছিল কি আলতামসের ছিল কি আক্রম খাঁর ছিল, সেটা আনিম্পরট্যান্ট। আমাদের জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কী, আর বর্তমানে কোনও বাবাজি সত্যি করেই এর পেছনে লেগেছেন কি না, আর যদি লেগে থাকেন তবে তিনি কে এবং তাঁর কেন এই দুঃসাহস।'

তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যা, ফেরত দিয়ে আয়। আর এসে জানালাগুলো খুলে দে।'

॥ ২ ॥

পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবড়া দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা আর ধীরুকাকা মোটরে গেলেন। গাড়িতে যদিও জায়গা ছিল, তবু ফেলুদা আর আমি দুজনেই বললাম যে আমরা টাঙ্গায় যাব।

সে দারুণ মজা। কলকাতায় থেকে তো ঘোড়ার গাড়ি চড়াই হয় না। সত্যি বলতে কী, আমি কোনও দিনই কোনওরকম ঘোড়ার গাড়ি চড়িনি। ফেলুদা অবিশ্যি চড়েছে। ও বলল কলকাতার ঠিকা গাড়ির চেয়ে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয়, আর সেটা নাকি হজমের পক্ষে খুব ভাল।

'তোর কাকার বাবুর্চি যা ফার্স্ট ক্লাস রাঁধে, বুঝছি এখানে খাওয়ার ব্যাপারে হিসেব রাখাটা খুব মুশকিল হবে। কাজেই মাঝে মাঝে এই টাঙ্গা রাইডটার এমনিতেই দরকার হবে।'

নতুন শহরের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে আর টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেতে খেতে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলল সেটার নাম কাইজার-বাগ। ফেলুদা বলল, 'জর্মনি আর উর্দুতে কেমন মিলিয়েছে দেখছিস?'

নবাবি আমলের যত প্রাসাদ-টাসাদ সব নাকি এই কাইজার-বাগের আশেপাশেই রয়েছে। গাড়োয়ান এদিকে ওদিকে

আঙুল দেখিয়ে সব নাম বলে দিতে লাগল।

'উয়ো দেখিয়ে বাদশা মনজ়িল...উয়ো হ্যায় চাঁদিওয়ালি বরাদরি...উস্‌কো বোলতা লাখুফটক...'

কিছুদূর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে দিয়ে। গাড়োয়ান বলল, 'রুমি দরওয়াজা।'

রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই 'মচ্ছি ভওয়ন' আর মচ্ছি ভওয়নেই হল বড়া-ইমামবড়া।

ইমামবড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় প্রাসাদ যে হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না।

টাঙ্গা থেকেই ধীরুকাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাবা আর ধীরুকাকা একজন লম্বা মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ব্লাক স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড।'

সত্যিই তো। ধীরুকাকার গাড়ির পাশে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'মাডগার্ডে একটা টাট্‌কা ঘষটার দাগ দেখছিস?'

'টাট্‌টা কী করে জানলে?'

'চুনের গুঁড়ো সব ঝরে পড়েনি এখনও—লেগে রয়েছে। রং-করা পাঁচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘষটে ছিল বোধ হয়। আজ সকালে যদি গাড়ি ধোওয়া না হয়ে থাকে, তা হলে ও দাগ কাল রাত্রে লেগে থাকতে পারে।'

ধীরুকাকা আমাদের দেখে বললেন, 'এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই বনবিহারীবাবু—যাঁর চিড়িয়াখানা আছে।'

আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম। ইনিই সেই লোক! প্রায় ছ ফুট লম্বা, ফরসা রং, সরু গোঁফ, ছুঁচলো দাড়ি, চোখে সোনার চশমা। সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ভদ্রলোক বললেন, 'লক্ষ্মণের রাজধানী কেমন লাগছে খোকা? জানো তো, রামায়ণের যুগে

লখ্‌নৌ ছিল লক্ষ্মণাবতী।'

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও দেখলাম বেশ মানানসই।

ধীরুকাকা বললেন, 'বনবিহারীবাবু চৌক-বাজারে যাচ্ছিলেন, আমাদের গাড়ি দেখে চলে এলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। দুপুরবেলাটা আমি বাইরে কাজ সারতে বেরোই। সকালসন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে অনেকটা সময় চলে যায়।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম দলেবলে একবার আপনার ওখানে ধাওয়া করব। এদের খুব শখ একবার আপনার চিড়িয়াখানাটা দেখার।'

'বেশ তো। এনি ডে। আজই আসুন না। আমি তো কেউ এলে খুশিই হই। তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না। তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত মজবুত নয়। তাই যদি হবে তো আমি আছি কী করে?'

এ কথায় ফেলুদা ছাড়া আমরা সকলেই হাসলাম। ফেলুদা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, 'জানোয়ারের গন্ধ ঢাকার জন্য কষে আতর মেখেছে।'

স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারীবাবুর নয়, কারণ তিনি তার পাশের একটা নীল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেকে তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা ইমামবড়া দেখবেন তো? তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'তা হলে আপনিও ভেতরে আসছেন আমাদের সঙ্গে?'

'চলুন না। নবাবের কীর্তিটা দেখে নেওয়া যাবে। সেই সিক্সটিথ্রিতে গিয়েছিলাম লখ্‌নৌতে আসার দুদিন বাদেই। তারপর আর যাওয়া হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের উপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বনবিহারী বললেন, 'দুশো বছর আগে নবাব আসাফ-উদ্-দৌল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদে। ভেবেছিলেন

আগ্রা দিল্লিকে টেক্কা দেবেন। ভারতবর্ষের সেরা প্রাসাদ-করনে-ওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন। তারা সব নকশা পাঠাল। তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হল এই ইমামবড়া। বাহারের দিক দিয়ে মোগল প্রাসাদের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না, তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নাম্বার ওয়ান। এত বড় দরবার-ঘর পৃথিবীর কোনও প্রাসাদে নেই।'

দরবার-ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায়। আর একটা কুয়ো দেখলাম, অত বড় কুয়ো আমি কখনও দেখিনি। গাইড বলল অপরাধীদের ধরে ধরে ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া। এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে, যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে ছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে এলাম। একটা গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই—দুদিকে দেয়াল, মাথার ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি। গাইড বলল, নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, তখন ওই খুপরিগুলোতে পিদিম জ্বলত। রাত্তিরবেলা যে কী ভুতুড়ে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ফেলুদা যে কেন বারবার পেছিয়ে পড়ছিল, আর দেওয়ালের এত কাছ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না। আমিও গোলোকধাঁধাটা দেখতে দেখতে, আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবতে ভাবতে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় খেয়ালই ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'আরে ফেলু কোথায় গেল ?'

সত্যিই তো ! পেছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ করে উঠল। তারপর 'ফেলু, ফেলু' বলে বাবা দুবার ডাক দিতেই ও আমাদের পিছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকধাঁধার প্ল্যানটা ঠিক মাথায় তুলে নিতে পারব না।'

গোলকধাঁধার শেষ গলিটার শেষে যে দরজা আছে, সেটা দিয়ে বেরোলেই ইমামবড়ার বিরাট ছাতে গিয়ে পড়তে হয়। গিয়ে দেখি সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লখ্নৌ শহরটাকে দেখা যায়। আমরা ছাড়াও ছাতে কয়েকজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক ধীরুকাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এল।

ধীরুকাকা বললেন, 'মহাবীর যে—কবে এলে?'

ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না, তবু তিনি বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তিন দিন হল। এই সময়টাতে আমি প্রতি বছরই আসি। দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই। এবারে দুজন বন্ধু আছেন, তাদের লখ্নৌ শহর দেখাচ্ছি।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ইনি পিয়ারিলালের ছেলে—বোম্বাইতে অভিনয় করছেন।'

মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কী রকম যেন অবাক হয়ে দেখছেন—যেন ওকে আগে দেখেছেন, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছেন না।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে কি?'

মহাবীর বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তোমার স্বর্গত পিতার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল বটে, তুমি তো তখন এখানে ছিলে না।'

মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, 'ও! তা হলে বোধহয় ভুল করছি। আচ্ছা, আসি তা হলে।'

মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়তো ফেলুদার চেয়েও কিছুটা কম—আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত। মনে হল নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন, কিংবা খেলাধুলা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হয়। জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই হয়, তা হলে আলো থাকতে থাকতে দেখাই ভাল। খাঁচাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি।'

আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাত থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একদম নীচে নেমে এলাম।

গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে।

॥ ৩ ॥

বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই যে ভিতরে একটা চিড়িয়াখানা আছে, কারণ যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায়।

'মিউটিনিরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সওদাগর এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন' বনবিহারীবাবু বললেন। 'আমি বাড়িটা কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে।'

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরনো। আর দেওয়ালের গায়ে যে সব কারুকার্য আছে তা থেকে নবাবদের কথাই মনে হয়।

বাড়ির ভিতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনারা সবাই কফি খান তো? আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই।'

আমাকে বাড়িতে বেশি কফি খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার খেতে খুব ভাল লাগে, তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল। কিন্তু কফি পরে—আগে জানোয়ার দেখা।

বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পরেই প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাগানেই এদিকে ওদিকে রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা। বাগানের মাঝখানে ছুঁচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। সেটায় একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটাকে বছর দশেক আগে মুঙ্গের থেকে এনেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। প্রথমে আমার কলকাতার বাড়ির চৌবাচ্চায় ছিল। একদিন দেখি বেরিয়ে এসে একটা আস্ত বেড়ালছানা খেয়ে ফেলেছে।'

পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগুলোর দিকে গেছে। একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ শুনে আমরা কুমির ছেড়ে সেইদিকেই গেলাম।

গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের

সাইজের বেড়াল, তার চোখ দুটো সবুজ আর জ্বলজ্বলে, আর গায়ের রং ডোরাকাটা খয়েরি। এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে করে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার বাসস্থান আফ্রিকা। এটা কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এ জিনিস আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই।'

বেড়ালের পর হাইনা, হাইনার পর নেক্‌ড়ে, নেক্‌ড়ের পর আমেরিকান র‍্যাট্‌ল স্নেক। দারুণ বিষাক্ত সাপ। একরকম সরু ছুঁচলো শামুক পুরী থেকে আমরা অনেকবার এনেছি ; এই সাপের ল্যাজের ডগায় সেইরকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে। সাপটা এদিক ওদিক চলার সময় ল্যাজটাকে কাঁপায়, আর তাতে ওই জিনিসটা মাটিতে লেগে একটা ঝুমঝুমির মতো করকর্ করকর্ শব্দ হয়। আমেরিকার জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই এরকম শব্দ শুনতে পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র‍্যাট্‌ল স্নেক ঘোরাফেরা করছে।

আরও দুটো জিনিস দেখে ভয়ে গা শিউরে উঠল। একটা কাচের বাক্সর মধ্যে দেখলাম নীল রঙের বিশ্রী বিরাট এক কাঁকড়া বিছে। এটাও আমেরিকার বাসিন্দা। এর নাম ব্লু স্করপিয়ন। আর আরেকটা কাচের বাক্স দেখলাম, একটা মানুষের আঙুল ফাঁক করা হাতের মতো বড় কালো রোঁয়াওয়ালা মাকড়সা—আফ্রিকার বিষাক্ত 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সা।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই বিছে আর ওই মাকড়সা—ওই দুটোরই বিষ হল যাকে বলে নিউরোটক্সিক। অর্থাৎ এক কামড়ে একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই।'

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানায় এলাম। আমরা সোফায় বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারীবাবু বললেন, 'রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে মাঝে আমার বাগান থেকে বনবেড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁসানি, হাইনার হাসি, নেকড়ের খ্যাঁকরানি আর র‍্যাট্‌ল স্নেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই। তাতে ঘুমটা হয় বড় আরামের। এরকম বডিগার্ডের সাপ্লাই আর কজনের আছে বলুন। অবিশ্যি চোর এলে এরা খুব হেল্‌প করতে পারে না

বটে, কারণ এরা খাঁচায় বন্দি। তার জন্যে আমার আলাদা ব্যবস্থা আছে। —বাদশা!

হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট কালো হাউন্ড কুকুর। এটাকেই নাকি বনবিহারীবাবু পাহারার জন্য রেখেছেন। শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয়—চিড়িয়াখানারও কোনও অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না।

ফেলুদা আমার পাশেই বসে ছিল। কুকুরটা দেখে আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ল্যাব্রেডর হাউন্ড। বাস্কারভিলের কুকুরের জাত।'

বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'আচ্ছা, সত্যিই আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভাল লাগে?'

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'কেন লাগবে না বলুন? ভয়টা কীসের? এককালে কত বাঘ ভালুক মেরেছি জানেন? ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল্ ছাড়া মারতুম না। অব্যর্থ টিপ ছিল। একবার কী যে ভীমরতি ধরল। চাঁদার জঙ্গলে এক মার্কিনি সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম। আর তারপর সে কী অনুতাপ! সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে পারব না, তাই চালান দেবার ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসা যখন ছাড়লুম, তখন বাধ্য হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম। এদের নিয়ে বাস করার কী আনন্দ জানেন? এরা যে হিংস্র ও বিষাক্ত, সেটা সকলেরই জানা। এরা তো নিরীহ ভালমানুষ বলে চালাতে চাইছে না নিজেদের! অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন—একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল। অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার জো আছে? তাই স্থির করেছি জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি জীবনটা কাটাব—তাতে শান্তি অনেক বেশি। আমি মশাই সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ করছি—তাতে কে কী ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে

কী হবে ? তবে শুনিচি আমার এ চিড়িয়াখানার দৌলতে পাড়ায় নাকি চুরিচামারি বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে বলতে হয় অজান্তে আমি লোকের উপকারই করছি !'

এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরুকাকার দিকে, তারপর ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কি তা হলে শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঘটনাটা জানেন না ?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কারণ বনবিহারীবাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবাস্তবে এসে হাজির হলেন।

সকলকে নমস্কার-টমস্কার করে ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির কাছেই কেলভিন রোডে একটি ছেলে গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে। তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনারা ফেরেননি। তাই এখানে চলে এলাম।'

ধীরুকাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আংটি ঠিকই আছে।

বনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখলাম শ্রীবাস্তবের যথেষ্ট আলাপ। ছোট শহরে পাড়ার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধহয় সহজেই হয়।

শ্রীবাস্তব ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বনবিহারীবাবু, আপনার পাহারাদারেরা কিন্তু আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে।'

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কী রকম ?'

'কাল আমার বাড়িতে চোর এল, আর আপনার একটি জানোয়ার কিছু সাড়াশব্দ করল না।'

'সে কী ? চোর ? আপনার বাড়িতে ? কখন ?'

'রাত তিনটের কাছাকাছি। নেয়নি কিছুই। ঘুমটা ভেঙে গেল আমার, তাই পালিয়ে গেল।'

'না নিলেও—খুব এক্সপার্ট বলতে হবে। আমার 'বাদশা' অন্তত খুবই সজাগ। দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি—আর চোর এলেও আমার কম্পাউন্ডের পিছন দিয়েই তাকে যেতে হবে।'

'যাক গে ! আপনাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম।'

কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল প্লেটে। শ্রীবাস্তব বললেন সেটার নাম সান্ডিলা লাড্ডু।

'সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি, আর ভুনা পেঁড়া—এই তিন মিষ্টি হল লখ্নৌয়ের স্পেশালিটি।'

আমার নিজের মিষ্টি জিনিসটা খুব ভাল লাগে না, তাই আমি ও সব কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারীবাবুকে লক্ষ করছিলাম। ওঁকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। ফেলুদা কিন্তু দেখি এর মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে, আমার কফির পেয়ালার উপর মাছি তাড়াবার মতো করে হাত নাড়িয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো?'

শ্রীবাস্তবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন—'ও বাবা—আপনার দেখি মনে আছে!'

বনবিহারীবাবু পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মনে থাকবে না! আমার যদিও ও সব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তবুও ওরকম আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আংটি ঠিকই আছে। ওর ভ্যালু আমার জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি—আমার বেড়ালের খাবার সময় হয়ে গেছে।'

এ কথার পর আর থাকা যায় না—তাই আমরাও উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বনবিহারীবাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। তার যে দারুণ মাস্‌ল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায়। শুনলাম তার নাম নাকি গণেশ গুহ। বনবিহারীবাবুর যখন জানোয়ার চালান দেবার কারবার ছিল তখন থেকেই নাকি ইনি আছেন; এখন নাকি চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা মেনটেন করা হত না। ওর ভয় বলে কোনও বস্তুই নেই। একবার ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্ত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি।’

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারীবাবু বললেন, ‘আপনারা আসাতে খুব ভাল লাগল। মাঝে মাঝে এসে পড়বেন না হয়! এখন এখানেই আছেন তো?’

বাবা বললেন, ‘কদিন আছি। তারপর ভাবছি এদের একবার হরিদ্বারটা দেখিয়ে আনব।’

‘বটে? লছমনঝুলা থেকে একটা বারো ফুট পাইথনের খবর এসেছে। আমিও তাই একবার ওদিকটায় যাব যাব করছিলাম।’

শ্রীবাস্তবকে আমরা ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময় বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম।

ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল, ‘হাইনা।’

বাপরে!—একেই বলে হাইনার হাসি!

শ্রীবাস্তব বললেন তাঁর নাকি প্রথম প্রথম এই হাসি শুনে গা ছম্ ছম্ করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

‘আপনার বাড়িতে কাল আর কোনও উপদ্রব হয়নি তো?’ ধীরুকাকা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, ‘নো, নো। নাথিং।’

আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক-ঢোলের শব্দ আসছে। ধীরুকাকা বললেন, ‘দেওয়ালির সময় এখানে রামলীলা হয়। এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে।’

আমি বললাম 'রামলীলা কী রকম?'

‘প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভিতর বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দুজন ছেলেকে মেকআপ-টেকআপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায়। তারা রথে চড়ে এসে তীর দিয়ে রাবণের দিকে তাগ করে মারে—আর সেই সঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই

চরকি রংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে একটা দেখবার জিনিস !'

বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল। তারপর বলল, 'আউর এক সাধুবাবা ভি আয়া থা। আধঘণ্টা বইঠ্‌কে চলা গিয়া।'

'সাধুবাবা ?'

ধীরুকাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনও সাধুবাবাকে এক্সপেক্ট করছিলেন না।

'কোথায় বসেছিলেন ?'

বেয়ারা বলল, 'বৈঠকখানায়।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম করেছিলেন ?'

বেয়ারা তাতেও বলল হ্যাঁ।

'তাজ্জব ব্যাপার !'

হঠাৎ কী মনে করে ধীরুকাকা ঝড়ের মতো শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর গোদরেজ আলমারি খোলার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই শুনলাম ধীরুকাকার চিৎকার—

'সর্বনাশ !'

বাবা, আমি আর ফেলুদা প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরুকাকার ঘরে ঢুকলাম।

গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কৌটোর ঢাকনা খোলা, আর তার ভিতরে আংটি নেই।

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ্‌ করে তাঁর খাটের উপর বসে পড়লেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে মনে হল যে শীতটা একটু বেড়েছে, তাই বাবা বললেন গলায় একটা মাফ্‌লার জড়িয়ে নিতে। বাবার কপালে ভ্রূকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি খুব ভাবছেন। ধীরুকাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন—আর কাউকে কিছু বলেও যাননি। কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল বললেন—শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাব কী করে? বাবা অবিশ্যি অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 'বিকেল বেলা সন্ন্যাসী সেজে চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটি নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে কী করে। তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও। তুমি তো বলছিলে ইন্‌স্পেক্টর গরগরির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ আছে।' এও হতে পারে যে ধীরুকাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই বেরিয়েছেন।

সকালে যখন চা আর জ্যামরুটি খাচ্ছি, তখন বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডেন্সিটা দেখিয়ে আনব, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক। তোরা দুজনে বরং কোথাও ঘুরে আসিস কাছাকাছির মধ্যে।'

কথাটা শুনে আমার একটু হাসিই পেয়ে গেল, কারণ ফেলুদা বলছিল ওর একটু পায়ে হেঁটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে, আর আমিও মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব। আমি জানতাম শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি সন্ধেবেলা থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে কেমন জানি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি—বক্ বক্ করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। বোকা সেজে থাকবি, আর পাশে পাশে হাঁটবি।'

'কিন্তু ধীরুকাকা যদি পুলিশে খবর দেন?'

'তাতে কী হল?'

'ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে ?'

'তাতে আর কী ? নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলব !'

ধীরুকাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড। বেশ নির্জন রাস্তাটা। দুদিকে গেট আর বাগান-ওয়ালা বাড়ি, তাতে শুধু যে বাঙালিরা থাকে তা নয়। ফ্রেজার রোডটা গিয়ে পড়েছে ডাপ্‌লিং রোডে। লখ্‌নৌতে একটা সুবিধে আছে—রাস্তার নামগুলো বেশ বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। কলকাতার মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না।

ডাপ্‌লিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে, সেই মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে দুলতে সেটার সামনে গিয়ে বলল, 'মিঠা পান হ্যায় ?'

'মিঠা পান ? নেহি, বাবুজি। লেকিন মিঠা মাসাল্লা দেকে বানা দেনে সেকতা।'

'তাই দিজিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাংলো দেশ ছাড়লেই এই একটা প্রবলেম।'

পানটা কিনে মুখে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আমি এ-শহরে নতুন লোক। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে পার ?'

ফেলুদা অবিশ্যি হিন্দিতে প্রশ্ন করছিল, আর লোকটাও হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি।

দোকানদার বলল, 'রামকিষণ মিসির ?'

'রামকৃষ্ণ মিশন। শহরে একজন বড় সাধুবাবা এসেছেন, আমি তাঁর খোঁজ করছি। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন।'

দোকানদার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে কী জানি বলে বিড়ি বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় একটা ইয়াবড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরনো মরচে ধরা বিস্কুটের টিন বাজিয়ে গান করছিল, সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল, কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পরা সাধু কি ? তাই যদি হয় তা হলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে দিয়েছিলাম।

'কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড ?'

'এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ওই দিকে প্রথম চৌমাথাটায় গেলেই সার সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন।'

'শুক্রিয়া!'

শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম। ফেলুদা বলল ওটা হল উর্দুতে থ্যাংক ইউ।

টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌঁছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করার পর আট বারের বার সাতান্ন নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে গতকাল সন্ধ্যায় একজন গেরুয়াপরা দাড়িগোঁফওয়ালা লোক তার গাড়ি ভাড়া করেছিল বটে।

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে সাধুবাবাকে ?'—ফেলুদা প্রশ্ন করল।

গাড়োয়ান বলল, 'ইস্টিশান।'

'স্টেশন ?'

'হাঁ।'

'কত ভাড়া এখান থেকে ?'

'বারো আনা।'

'কত টাইম লাগবে পৌঁছুতে ?'

'দশ মিনিটের মতো।'

'চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌঁছে দেবে ?'

'টিরেন পাকাড়না হ্যায় কেয়া ?'

'টিরেন বলে টিরেন! বঢ়িয়া টিরেন—বাদশাহী এক্সপ্রেস!'

গাড়োয়ান একটু বোকার মতো হেসে বলল, 'চলিয়ে—আট মিনিটমে পৌঁছা দেঙ্গে!'

গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই সাধুবাবা কি এখনও বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে ?'

এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কট্‌মট্ করে চাইল যে আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ যাবার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'সাধুবাবার সঙ্গে কোনও মালপত্তর ছিল কি ?'

গাড়োয়ান একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'মনে হয় একটা বাক্স ছিল।

তবে, বড় নয়, ছোট !'

'হুঁ।'

স্টেশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের লোক, গেটের চেকার, কুলি-টুলি এদের কাউকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাঙালি ; তিনি বললেন, 'আপনি কি পবিত্রানন্দ ঠাকুরের কথা বলছেন ? যিনি দেরাদুনে থাকেন ? তিনি তো তিনদিন হল সবে এসেছেন। তাঁর তো এখনও ফিরে যাবার সময় হয়নি। আর তাঁর সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা !'

সবশেষে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের যে দারোয়ান, তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল একজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল বটে।

'ওয়েটিংরুমে বসেছিলেন ?'

'আজ্ঞে না। বসেননি।'

'তবে ?'

'বাথরুমে ঢুকেছিলেন ; হাতে একটা ছোট বাক্স ছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর তো জানি না।'

'সে কী ? বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখোনি ?'

'দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি এখানেই ছিলে তো ?'

'তা তো থাকবই। ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন। ঘরে অনেক লোক যে।'

'তা হলে হয়তো খেয়াল করোনি। এমনও হতে পারে তো ?'

'তা পারে।'

কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল যে সে বলতে চায় যে সাধুবাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কিন্তু তা হলে সে সাধুবাবা গেলেন কোথায় ?'

স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন, আর তারই একটাতে আমরা উঠে

পড়লাম। টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না, কারণ সাতান্ন নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল।

এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পরে আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল—

'সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিস করে গেল?'

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক্ করে খানিকটা পানের পিক রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল, 'তা হতে পারে। আগেকার দিনে তো সাধুসন্ন্যাসীদের ভ্যানিস-ট্যানিস করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি।'

বুঝলাম ফেলুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না, যদিও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের আওয়াজ পেলাম। ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর...আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

তারপর দেখলাম আমাদেরই মতো একটা টাঙ্গা, কিন্তু সেটার গায়ে কাগজের ফুল, বেলুন, ফ্ল্যাগ—এই সব দিয়ে খুব সাজানো হয়েছে। বাজনাটা বাজছে একটা লাউডস্পিকারে, আর একটা রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভিতর থেকে গোছা গোছা করে কী একটা ছাপানো কাগজ রাস্তার লোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন।'

সত্যিই তাই। গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রংচঙে ছবি আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেলাম। ছবির নাম 'ডাকু মনসুর।'

হ্যান্ডবিলের দু-একটা আমাদের গাড়ির ভিতর এসে পড়ল, আর ঠিক সেই সময় একটা দলাপাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির মধ্যে এসে ফেলুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ির মেঝেতে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটাকে দেখেছি ফেলুদা। কাবলিওয়ালার পোশাক, কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হল না। ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে

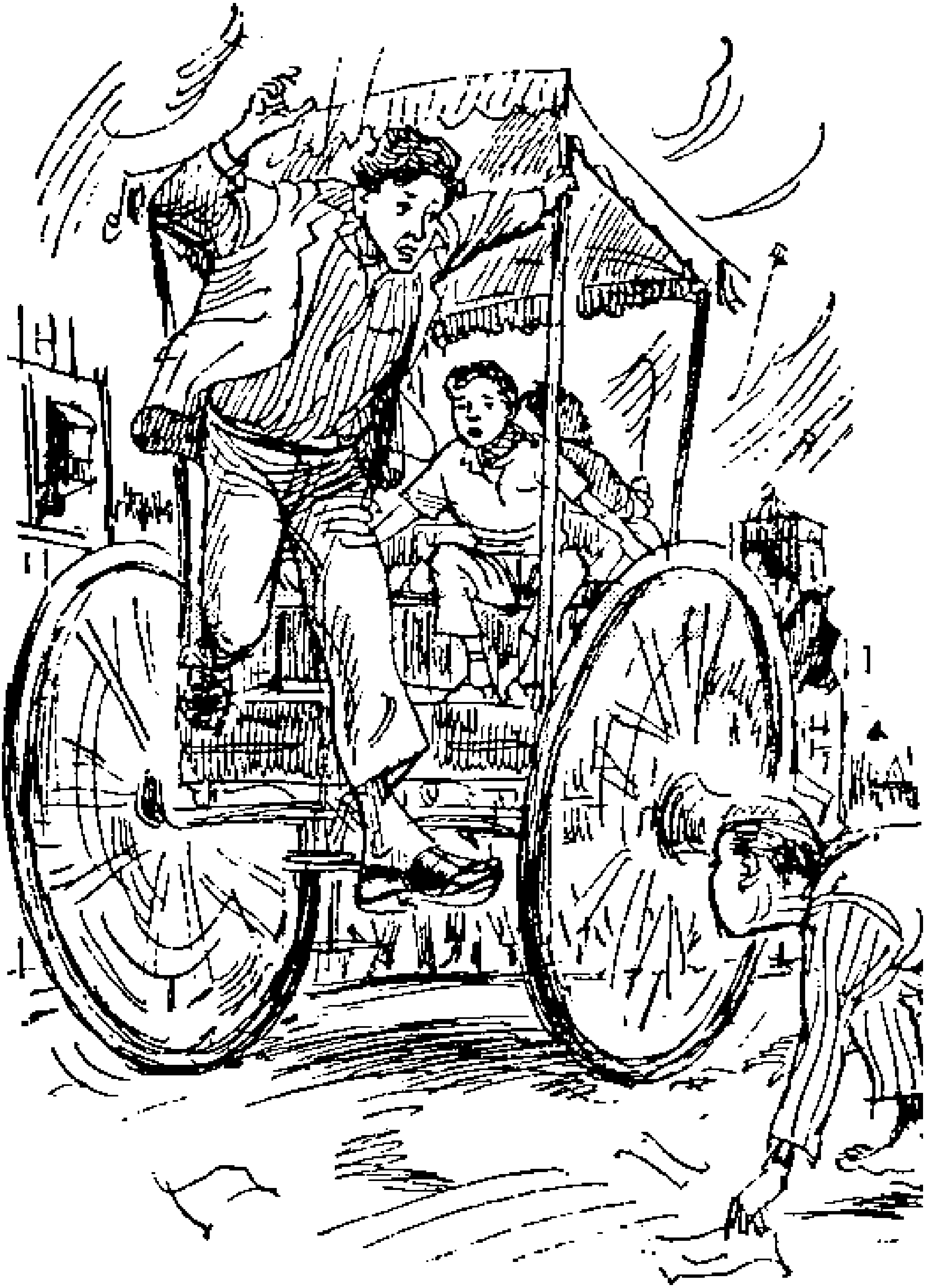

নিয়ে একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাঁই পাঁই করে যে দিকে লোকটাকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে ছুটে গেল। ভিড়ের মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে একটা মানুষ কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম দেখলাম।

এর মধ্যে অবিশ্যি টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে। আমি আর কী করব ? অপেক্ষা করে রয়েছি। ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে, তবে রাস্তায় কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এখনও হ্যান্ডবিল কুড়োচ্ছে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ্ করে সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল, 'নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো জানা নেই, তাই বাবাজি রক্ষে পেয়ে গেলেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি লোকটাকে দেখেছিলে ?'

'তুই দেখলি, আর আমি দেখব না ?'

আমি আর কিছু বললাম না। ফেলুদা লোকটাকে না দেখে থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার গায়ে কাবলিওয়ালার পোশাক ছিল, কিন্তু অত কম লম্বা কাবলিওয়ালা আমি কখনও দেখিনি।

ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজটা খুলে হাত দিয়ে ঘষে সমান করে, চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ে ফেলল। তারপর সেটাকে তিনভাঁজ করে ওর মানিব্যাগের ভিতর নিয়ে নিল। লেখাটা যে কী ছিল সেটা আর আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হল না।

বাড়ি ফিরে দেখি ধীরুকাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন। শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হল না যে আংটিটা যাওয়াতে তাঁর খুব একটা দুঃখ হয়েছে। তিনি বললেন, 'উ আংটি ছিল অপয়া। যার কাছে যাবে তারই দুশ্চিন্তা হোবে, বিপদ হোবে, বাড়িতে ডাকু আসবে। আপনি তো লাকি, ধীরুবাবু। ধরুন যদি ডাকু এসে ঝামেলা করত, গোলাগালি চালাতো !'

ধীরুকাকা একটু হেসে বললেন, 'তা হলে তবু একটা মানে হত। এ যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে

চলে গেল। এটা যেন কিছুতেই হজম করতে পারছি না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনি কেন ভাবছেন ধীরুবাবু। আংটি আমার কাছে থাকলেও যেত, আপনার কাছে থাকলেও যেত। আর আপনি যে বলেছিলেন পুলিশে খবর দেবেন—তাও করবেন না। ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। যারা চুরি করল, তারা ক্ষেপে গিয়ে ফির আপনাদের উপর হামলা করবে।'

ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা 'লাইফ' ম্যাগাজিন দেখছিল, এবার সেটাকে বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে সোফার মাথার পিছনে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'মহাবীরবাবু জানেন এ আংটির কথা?'

'পিয়ারিলালের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো আমি জানি না ঠিক। মহাবীর ডুন স্কুলে পড়ত, ওখানেই থাকত। তারপর মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন করেছিল। তারপর সেটা ছেড়ে দিল, বোম্বাই গিয়ে ফিল্মে অ্যাকটিং শুরু করল।'

'উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে পিয়ারিলালের মত ছিল?'

'সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি পিয়ারিলাল। তবে জানি উনি ছেলেকে খুব ভালবাসতেন।'

'পিয়ারিলাল মারা যাবার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন?'

'না। বোম্বাই ছিল। খবর পেয়ে এসে গেলো।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ফেলুবাবু যে একেবারে পুলিশের মতো জেরা করছ।'

বাবা বললেন, 'ও যে শখের ডিটেকটিভ। ওর ওদিকে বেশ ইয়ে আছে।'

শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ—ভেরি গুড, ভেরি গুড!'

কেবল ধীরুকাকাই যেন একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'খোদ ডিটেকটিভের বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল, এইটেই যা আপসোস।'

ফেলুদা এ সব কথাবার্তায় কোনও মন্তব্য না করে শ্রীবাস্তবকে আরেকটা প্রশ্ন করল, 'মহাবীরবাবুর ফিল্মে অ্যাকটিং করে ভাল রোজগার হচ্ছে কি ?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'সেটা ঠিক জানি না। মাত্র দুবছর তো হল ?'

'ওঁর এমনিতে টাকার কোনও অভাব আছে ?'

'নাঃ! কারণ, পিয়ারিলাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। সিনেমাটা ওর শখের ব্যাপার।'

'হুঁ'—বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল।

শ্রীবাস্তব হঠাৎ তাঁর রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পেশেন্টের কথাই ভুলে গেছি। আমি চলি!'

শ্রীবাস্তবকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর ধীরুকাকা বাইরে গেলে পর ফেলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই তুলে বলল, 'তোর চাঁদে যেতে ইচ্ছে করে, না মঙ্গল গ্রহে ?'

আমি বললাম, 'আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে করছে।'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'লাইফে চাঁদের সারফেসের ছবি দিয়েছে। দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না। মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতূহল হয়।'

আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, 'ফেলুদা আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমার ম্যানিব্যাগে যে কাগজটা আছে সেইটি দেখার জন্যে।'

'ওঃ—ওইটে!'

'ওটা দেখাবে না বুঝি ?'

'ওটা উর্দুতে লেখা।'

'তবু দেখি না!'

'এই দ্যাখ্।'

ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বার করে সেটা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে ক্যারামের গুটির মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। খুলে

দেখি সেটায় লেখা আছে—'খুব হুঁশিয়ার !'

আমি বললাম, 'তবে যে বললে উর্দু ?'

'বোকচন্দর—খুব আর হুঁশিয়ার—এই দুটো কথাই যে উর্দু সেটাও বুঝি তোর জানা নেই ?'

সত্যিই তো ! মনে পড়ল একবার বাবা বলেছিলেন—যে-কোনও বাংলা উপন্যাস নিয়ে তার যে-কোনও একটা পাতা খুলে পড়ে দেখো, দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উর্দু, নয় ফারসি, না হয় ইংরাজি—, না হয় পর্তুগিজ, না হয় অন্য কিছু। এ সব কথা বাংলায় এমন চলে গেছে যে, আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে বাংলা নয়।

আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাজ করেই ফেলুদা বলল, 'একটা সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন খয়ের মেশানো লাল রস চুঁইয়ে পড়ে দেখেছিস ? এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে লেখা।'

আমি লেখাটা নাকের কাছে আনতেই পানের গন্ধ পেলাম।

'কিন্তু কে লিখেছে বলো তো ?'

'জানি না।'

'লোকটা বাঙালি তো বটেই ?'

'জানি না।'

'কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে ? তুমি তো আর আংটি চুরি করোনি।'

ফেলুদা হো হো করে হেসে বলল, 'হুমকি জিনিসটা কি আর চোরকে দেয় রে বোকা ? ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে। অর্থাৎ ডিটেকটিভকে। তাই এ সব কাজে নামতে হলে ডিটেকটিভের একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয়।'

আমার বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করে উঠল, আর বুঝতে পারলাম যে গলাটা কেমন জানি শুকিয়ে আসছে। কোনও রকমে ঢোক গিলে বললাম, 'তা হলে এবার থেকে সত্যিই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত।'

'হুঁশিয়ার হইনি সে কথা তোকে কে বললে ?'—এই বলে ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের সামনে ধরল। দেখলাম বাক্সটার ঢাকনায় লেখা রয়েছে—'দশংসংস্কারচূর্ণ।'

ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন। তাই আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'দাঁতের মাজন দিয়ে কী করে হুঁশিয়ার হবে ফেলুদা ?'

'তোর যেমন বুদ্ধি !—দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন ?'

'তবে ওটায় কী আছে ?'

চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আর নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র !'

॥ ৫ ॥

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'তোপ্‌সে, কী মনে হচ্ছে বল তো ?'

আমি বললাম, 'কীসের কী মনে হচ্ছে ?'

'এই যে-সব ঘটনা ঘটছে-টটছে।'

'বারে বা, সে তো তুমি বলবে। আমি আবার কী করে বলব ? আমি কি ডিটেকটিভ নাকি ? আর সন্ন্যাসীটা কে, সেটা না জানা অবধি তো কিছুই বোঝা যাবে না।'

'কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে। যেমন, সন্ন্যাসীটা বাথরুমে ঢুকে আর বেরোল না। এটা তো খুব রিভিলিং।'

'রিভিলিং মানে ?'

'রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়।'

'এখানে কী বোঝা যাচ্ছে ?'

'তুই নিজে বুঝতে পারছিস না ?'

'আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েটিংরুমের দারোয়ানটা অন্যমনস্ক ছিল।'

'তোর মুণ্ডু।'

'তবে ?'

'সন্ন্যাসী বেরোলে নিশ্চয়ই দারোয়ানের চোখে পড়ত।'

'তা হলে ? সন্ন্যাসী বেরোয়নি ?'

'সন্ন্যাসীর হাতে কী ছিল মনে আছে ?'

'আমি তো আর...ও হ্যাঁ হ্যাঁ—অ্যাটাচি কেস।'

'সন্ন্যাসীর হাতে অ্যাটাচি কেস দেখেছিস কখনও ?'

'তা দেখিনি।'

'সেই তো বলছি। ওটা থেকেই সন্দেহ হয়।'

'কী সন্দেহ হয় ?'

'যে সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসী নন। উনি প্যান্ট শার্ট কি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা আমাদের মতো অ-সন্ন্যাসী, আর সেই পোশাক ছিল ওই অ্যাটাচি কেসে। গেরুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ। খুব সম্ভবত দাড়িগোঁফটাও।'

'বুঝেছি। গেরুয়াটা ও বাক্সে পুরে নিয়েছে, আর অন্য পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি।'

'গুড। এইবার মাথা খুলেছে।'

'কিন্তু আজ সকালে তা হলে কে তোমার গায়ে কাগজ ছুঁড়ে মারল ?'

'হয় ও নিজেই, না হয় ওর কোনও লোক। স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমি যে একে-তাকে সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞেস করছি, সেটা ও শুনেছিল—আর তাই হুমকি দিয়ে গেল।'

'বুঝেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও রহস্য আছে কি ?'

'বাবা, বলিস কী! রহস্যের কোনও শেষ আছে নাকি ? শ্রীবাস্তবকে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে কে ফলো করল ? সেও কি ওই সন্ন্যাসী, না অন্য কেউ ? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারমিনার আর পান খেতে খেতে কে ওয়াচ করছিল ? পিয়ারিলাল কোন 'স্পাই'-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন ? বনবিহারীবাবু হিংস্র জানোয়ার পোষেন কেন ? পিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারীবাবুকে আগে কোথায়

দেখেছে ? সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে ?'...

*   *   *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল। তারপরে সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোবার কিছুক্ষণ পরেই জোরে জোরে নিশ্বাস। বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম—হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল।

বনবিহারীবাবু যে হিংস্র জানোয়ার পোষেন, তাতে ফেলুদার আশ্চর্য হবার কী আছে ? সব সময় কি সব জিনিসের পিছনে লুকোনো কারণ থাকে ? অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত শখের কথা তো শুনতে পাওয়া যায়। বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানাও হয়তো সেই রকমই একটা অদ্ভুত শখের নমুনা।

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কখন যে আবার ঘুমটা ভেঙে গেছে তা জানি না। জাগতেই মনে হল চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। ঢাকের বাজনা থেমে গেছে, কুকুর শেয়াল কিছু ডাকছে না। খালি ফেলুদার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ, আর মাথার পিছনে টেবিলের উপর রাখা টাইম পিসটার টিক্ টিক্ শব্দ। আমার চোখটা পায়ের দিকের জানালায় চলে গেল।

জানালা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা দেখা যায়। আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা। একটা অন্ধকার মতো কী যেন জানালার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষ। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভিতর দেখছে।

যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক, তবু লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। আকাশে তারা অল্প অল্প থাকলেও ঘরের ভিতর আলো নেই, তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব। কিন্তু এটা

বুঝতে পারছিলাম যে তার মুখের নীচের দিকটা—মানে নাক থেকে থুতনি অবধি—একটা কালো কাপড়ে ঢাকা!

এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভিতর হাত ঢুকিয়েছে, তবে শুধু হাত নয়, হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মতো জিনিস রয়েছে!

একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এল। একে ভয়েতেই প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন হাত-পাও কী রকম যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল।

আমার মনে যত জোর আছে, সবটা এক সঙ্গে করে, শরীরটা প্রায় একদম না নাড়িয়ে, আমার বাঁ হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম।

আমার চোখ কিন্তু জানালার দিকে। লোকটা এখনও হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে, গন্ধটা বেড়ে চলেছে, আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল। আমি একটা ঠেলা দিলাম। ফেলুদা একটু নড়ে উঠল। নড়তেই ক্যাঁচ করে খাটের একটা শব্দ হল। আর সেই শব্দটা হতেই জানালার লোকটা হাওয়া!

ফেলুদা ঘুমো ঘুমো গলায় বলল, 'খোঁচা মারছিস কেন?'

আমি শুকনো গলায় কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'জানালায়।'

'কে জানালায়? ঈস্—গন্ধ কীসের?'—বলেই ফেলুদা একলাফে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল, 'কী দেখলি ঠিক করে বল তো!'

আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি। কোনওমতে বললাম, 'একটা লোক...হাতে ডান্ডা...ঘরের ভেতর—'

'হাত বাড়িয়ে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি। লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্ম ছিল। আমাদের অজ্ঞান করবার তালে ছিল।'

'কেন ?'

'বোধহয় আরেক আংটি-চোর। ভাবছে এখনও আংটি এখানেই আছে। যাক্‌গে—তুই এ ব্যাপারটা আর বাবা কাকাকে বলিস না। মিথ্যে নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে আমার কাজটাই ভেস্তে দেবে।'

* * *

পরদিন সকালে বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই বললেন যে আর বিশেষ কোনও গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আংটি উদ্ধারের ভার পুলিশের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্‌স্পেক্টর গর্‌গরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার উপর টেক্কা দেওয়া হবে, আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে, এই ভেবে আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম পুলিশ যেন কোনওমতেই আংটি খুঁজে না পায়। সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয়।

বাবা বললেন, 'আজ তোদের আরও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে আনব ভাবছি।'

ঠিক হল দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো হবে। কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু।

আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, এমন সময় বনবিহারীবাবু এসে হাজির। বললেন, 'আপনাদের বাড়ি দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে চলে এলাম। একটা ভাল দেখে হাউন্ড পুষলে এ-কেলেঙ্কারি হত না। সাধুবাবার উদ্দেশ্য সাধু না অসাধু, সেটা বুঝতে একটা ওয়েল-ট্রেনড জেতো হাউন্ডের লাগত ঠিক পাঁচ সেকেন্ড। যাক চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে বলুন।'

বনবিহারীবাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন। বললেন, 'লখ্‌নৌ শহরের বেস্ট পান। খেয়ে দেখুন। এক বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এ জিনিস।'

আমি মনে মনে ভাবছি, বনবিহারীবাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তা হলে আমাদের বাইরে যাওয়া ভেস্তে যাবে, এমন সময় উনি নিজেই বললেন, 'বাড়িতে থাকছেন, না বেরোচ্ছেন ?'

বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে

আনব। ইমামবড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনও।'

'রেসিডেন্স দেখোনি এখনও ?' প্রশ্নটা আমাকেই করলেন ভদ্রলোক। আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'চলো—আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে।'

তারপর ধীরুকাকার দিকে ফিরে বললেন—'আমার কেবল একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। আংটিটা কোত্থেকে গেল। সিন্দুকে রেখেছিলেন কি ?'

ধীরুকাকা বললেন, 'সিন্দুক আমার নেই। একটা গোদরেজের আলমারি খুলে নিয়ে গেছে। চাবি অবিশ্যি আমার পকেটেই ছিল। বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে।'

'শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! বাক্স দেরাজে ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'দেরাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন তো ?'

'তন্ন তন্ন করে।'

'কিন্তু একটা জিনিস তো করতে পারেন। আলমারির হাতলে, বাক্সটার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কি না সেটা তো...'

'থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমারই আঙুলের ছাপ। ওতে সুবিধে হবে না।'

বনবিহারীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'খাসা লোক ছিলেন বাবা পিয়ারিলাল। আংটিটা ইনসিওর পর্যন্ত করেননি। আর যাঁকে দিয়ে গেলেন তিনিও অবশ্যি তথৈবচ। যাক—হাড়ের ডাক্তারের এবার হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে।'

* * *

এবার আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হল না। বনবিহারীবাবুর গাড়িতেই সবাই উঠে পড়লাম। ফেলুদা আর আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম।

ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন বনবিহারীবাবু আমাদের

দুজনকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘তোমরা এখানে এসে এমন একটা রহস্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে ভেবেছিলে কি?’

আমি মাথা নেড়ে না বললাম। ফেলুদা খালি হিঃ হিঃ করে একটু হাসল।

বাবা বললেন, ‘ফেলুবাবুর অবিশ্যি পোয়া বারো, কারণ ওর এ সব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।’

‘বটে?’

বনবিহারীবাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। বললেন, ‘ব্রেনের ব্যায়ামের পক্ষে ওটা খুব ভাল জিনিস। তা, রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলুবাবু?’

ফেলুদা বলল, ‘এ তো সবে শুরু।’

‘অবিশ্যি তুমি কোন রহস্যের কথা ভাবছ জানি না। আমার কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক।’

ধীরুকাকা বললেন, ‘কী রকম?’

‘এই যেমন ধরুন—সন্ন্যাসী গোদরেজের আলমারির চাবি পেল কোত্থেকে। তারপর বাড়িতে চাকর-বাকর থাকতে সে-সন্ন্যাসীর এত সাহসই বা হবে কোত্থেকে যে সে একেবারে আপনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকবে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেকদিন থেকেই খটকা লেগে আছে।’

ধীরুকাকা বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

‘শ্রীবাস্তবকে সত্যিই পিয়ারিলাল আংটি দিয়েছিলেন, না শ্রীবাস্তব সেটা অন্য ভাবে—’

ধীরুকাকা বাধা দিয়ে বললেন, ‘সে কী মশাই, আপনি কি শ্রীবাস্তবকেও সন্দেহ করেন নাকি?’

‘সন্দেহ তো প্রত্যেককেই করতে হবে—এমন কী আমাকে আপনাকেও—তাই নয় কি ফেলুবাবু?’

ফেলুদা বলল, ‘নিশ্চয়ই। আর যেদিন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, সেদিন তো শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন—ওই বিকেলেই। তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে এলেন।’

'এগ্‌জ্যাক্টলি !' বনবিহারীবাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন, 'কিন্তু শ্রীবাস্তব যদি অসদুপায়ে আংটি পেয়ে থাকেন, তা হলে তিনি সেটা আমাদের কাছে রাখবেনই বা কেন, আর রেখে সেটা চুরিই বা করবেন কেন ?'

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝলেন না ? অত্যন্ত সহজ। শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যিই ডাকাত লেগেছিল। ভিতু মানুষ—তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে রেখেছিলেন। এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা, তাই তিনি নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাপ্পা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তবের মতো এত ভালমানুষ হাসিখুশি লোক, তিনি কখনও চোর হতে পারেন ? ফেলুদাও কি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে একমত, নাকি বনবিহারীবাবুর কথাতেই ওর প্রথম শ্রীবাস্তবের ওপর সন্দেহ পড়েছে ?

বনবিহারীবাবু বললেন, 'শ্রীবাস্তব অমায়িক লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন—লখ্‌নৌ-এর মতো জায়গা—এমন আর কী—সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র—ভাবতে একটু ইয়ে লাগে না কি ?'

ধীরুকাকা বললেন, 'ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট আপিসের সামান্য কেরানি।'

এই সময় ফেলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল—

'আপনার কোনও জানোয়ার কখনও আপনাকে কামড়েছে কি ?'

'নো নেভার।'

'তা হলে আপনার ডান হাতের কবজিতে ওই দাগটা কী ?'

'ও হো হো—বাঃ বাঃ, তুমি তো খুব ভাল লক্ষ করেছ—কারণ ও দাগটা সচরাচর আমার আস্তিনের ভেতরেই থাকে। ওটা

হয়েছিল ফেন্সিং করতে গিয়ে। ফেন্সিং বোঝো?'

ফেলুদা কেন—আমিও জানতাম ফেন্সিং কাকে বলে। রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে ফেন্সিং।

'ফেন্সিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই। এটা সেই খোঁচার দাগ।'

রেসিডেন্সিটা সত্যিই একটা দেখবার জিনিস। প্রথমত জায়গাটা খুব সুন্দর। চারিদিকে বড় বড় গাছপালা—তার মাঝখানে এখানে ওখানে এক একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। গাছগুলোর ডালে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর। লখ্নৌ শহরের বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি, এবার নিজের চোখে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম।

কতগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাগ করে ইঁট মারছিল—বনবিহারীবাবু তাদের কষে ধমক দিলেন। তারপর আমাদের বললেন, 'জন্তুজানোয়ারের ওপর দুর্ব্যবহারটার আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশেই এ-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।'

ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহের কথা পড়েছি, রেসিডেন্সি দেখার সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটা বড় বাড়ির ভিতর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি, আর বনবিহারীবাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছে—

'সেপাই মিউটিনির সময় লখ্নৌ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিলেন এই বাড়িটার ভেতরেই। স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি। বিদ্রোহ লাগল দেখে প্রাণের ভয়ে লখ্নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা হাসপাতালের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল। কদিন খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না। সেপাই-এর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে ব্রিটিশদের কী দশা হল সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না-এসে পড়তেন, তা হলে ব্রিটিশদের দফা রফা হয়ে যেত।...এ ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। দেয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখো।'

বাবা আর ধীরুকাকা আগেই রেসিডেন্সি দেখেছেন বলে মাঠে পায়চারি করছিলেন। আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম। আর দুশো বছরের পুরনো পাতলা অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখছিলাম, এমন সময় ঘরের দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কী একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান ঘেঁষে ধাঁই করে পিছনের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। চেয়ে দেখি সেটা একটা পাথরের টুকরো।

তার পরমুহূর্তেই বনবিহারীবাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে

তার দিকে টেনে নিলেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকটা পাথর এসে আবার ঘরের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। পাথরগুলো যে গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার বেশ বুঝতে পারলাম। উনি এক লাফে দেয়ালের একটা বড় গর্তের

ভেতর দিয়ে গিয়ে বাইরের ঘাসে পড়লেন। আমি আর ফেলুদাও অবিশ্যি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছলাম। আর গিয়েই দেখলাম যে-দিক দিয়ে পাথর এসেছে, সেই দিকে বেশ খানিক দূরে, একটা লাল ফেজটুপি আর কালো কোট পরা দাড়িওয়ালা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা লোকটার দিকে ছুটল। আমি ফেলুদার পিছনে পিছনে যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু বনবিহারীবাবু আমার জামার আস্তিনটা ধরে বললেন, 'তুমি এখনও স্কুলবয় তপেশ ; তোমার এ সব গোলমালের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।'

কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধরতে পারলে ?'

ফেলুদা বলল, 'নাঃ। অনেকটা ডিস্ট্যান্স। একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা।'

বনবিহারীবাবু চাপা গলায় বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল।' তারপর আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো—আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরুকাকার সঙ্গে দেখা হল। বাবা বললেন, 'ফেলু এত হাঁপাচ্ছ কেন ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওর বোধহয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না করাই ভাল। মনে হচ্ছে ওর পেছনে গুণ্ডা লেগেছে।'

বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

তখন বনবিহারীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমি রসিকতা করছিলাম। আসলে পাথরগুলো আমাকেই লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল। ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ।'

তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন, 'তবে তাও বলছি ফেলুবাবু, তোমারও বয়সটা কাঁচাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভাল হবে ? এবার থেকে

একটু খেয়াল করে চলো।'

কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল।

গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম—সেই সুযোগে ফেলুদাকে ফিস ফিস করে বললাম, 'পাথরটা তোমাকে মারছিল, না ওঁকে ?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওঁকে মারলে কি উনি চুপ করে থাকতেন নাকি ? হুলাটস্থূল করে রেসিডেন্সির বাকি ইঁট কটা খসিয়ে দিতেন না ?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তবে একটা জিনিস পেয়েছি। লোকটা পালানোর সময় ফেলে গিয়েছিল।'

'কী জিনিস ?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বার করে দেখাল। ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গোঁফ, আর তাতে এখনও শুকনো আঠা লেগে রয়েছে।

গোঁফটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা বলল, 'পাথরগুলো যে আমাকেই মারা হয়েছে, সেটা ভদ্রলোক খুব ভাল ভাবেই জানেন।'

'তা হলে বললেন না কেন ?'

'হয় আমাদের নার্ভাস করতে চান না, আর না হয়...'

'না হয় কী ?'

ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা তুড়ি মেরে বলল, 'কেসটা জমে আসছে রে তোপসে। তুই এখন থেকে আর আমাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না।'

বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় বাগানে পায়চারি করেছে, আর বাকি সময়টা ওর নীল নোটবইটাতে হিজিবিজি কী সব লিখেছে। ও যখন বাগানে ঘুরছিল, তখন আমি একবার লুকিয়ে লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি, কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

॥ ৬ ॥

টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল, 'হজরতগঞ্জ।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কোন জায়গা?'

'এখানকার চৌরঙ্গি। শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো শহরে দেখবার জিনিস আছে। আজ একটু দোকান-টোকান ঘুরে দেখব।'

গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারীবাবুর বাড়িতে কফি খেতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে ওঁর চিড়িয়াখানাটাও আরেকবার দেখে নিয়েছিলাম। সেই হাইনা, সেই র‍্যাট্‌ল্ স্নেক, সেই মাকড়সা, সেই বনবেড়াল, সেই কাঁকড়া বিছে।

বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে ফেলুদা একটা দরজার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম, আজও তালা।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—ওটা একটা একস্ট্রা ঘর। এসে অবধি তালা লাগিয়ে রেখেছি। খোলা রাখলেই ঝাড়পোঁছের হাঙ্গামা এসে যায়, বুঝলে না!'

ফেলুদা বলল, 'তা হলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে, কারণ এটায় তো মরচে ধরেনি।'

বনবিহারীবাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি-হাসি অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এর আগেরটায় এত বেশি মরচে ধরেছিল যে ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম।'

বাবা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম হরিদ্বার লছমনঝুলাটা এই ফাঁকে সেরে আসব।'

বনবিহারীবাবু পাইপ ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কবে যাবেন? পরশু যদি যান তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে। আমার এমনিতেই সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া দরকার। আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন, কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয়

সকলেরই মঙ্গল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তোমরা কজন ঘুরে এসো না। ফেলু তপেশ দুজনেরই লছমনঝুলা না-দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা সুবিধে হবে—আমার চেনা ধরমশালা আছে, এমন কী হরিদ্বার থেকে লছমনঝুলা যাবার গাড়ির ব্যবস্থাও আমি চেনাশুনার মধ্যে থেকে করে দিতে পারব। এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড করুন।'

ঠিক হল পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব। দুদিন আগে যদি বনবিহারীবাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন, তা হলে আমার খুব ভালই লাগত। কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে। তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই, তখন আমিও মনটাকে যাবার জন্য তৈরি করে নিলাম।

আজ সকালে উঠে ফেলুদা বলল, 'দাড়ি কামাবার ব্লেড ফুরিয়ে গেছে—ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব। চল ব্লেড কিনে আনিগে।'

তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি। হজরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায়।

কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছে না। আজ সকালে ও যখন স্নান করতে গিয়েছিল, তখন আমি আরেকবার ওর নোটবইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু পড়তে পারিনি। অক্ষরগুলোর এক একটা ইংরিজি মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা।

গাড়িতে যেতে যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

ও প্রথমে লুকিয়ে ওর খাতা দেখার জন্য দারুণ রেগে গেল। বলল, 'এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস। তোকে প্রায় ক্রিমিনাল বলা যেতে পারে।'

তারপর একটু নরম হয়ে বলল, 'তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ও অক্ষর তোর জানা নেই।'

'কী অক্ষর ওটা?'

'গ্রিক।'

'ভাষাটাও গ্রিক?'

'না।'

'তবে?'

'ইংরিজি।'

'তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কী করে?'

'সে অনেকদিনের শেখা। ফার্স্ট-ইয়ারে থাকতে। আল্‌ফা বিটা গামা ডেল্টা পাই মিউ এপসাইলন—এ সব তো অঙ্কতেই শিখেছি, আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে। ইংরিজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায়। এমনি লোকের কারুর সাধ্য নেই যে পড়ে।'

'লখনৌ বানান কী হবে গ্রিকে?'

'ল্যামডা উপসাইলন কাপা নিউ ওমিক্রন উপসাইলন! C আর Wটা গ্রিকে নেই, তাই বানানটা হচ্ছে L-U K-N O U।'

'আর ক্যালকাটা বানান?'

'কাপা আল্‌ফা ল্যামডা কাপা উপসাইলন টাউ টাউ আল্‌ফা'।

'বাস্‌রে বাস্! তিনটে বানান করতেই পিরিয়ড কাবার!'

চৌরঙ্গি বললে অবিশ্যি বাড়িয়ে বলা হবে—কিন্তু হজরতগঞ্জের দোকান-টোকানগুলো বেশ ভালই দেখতে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

'ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা—ওখানে নিশ্চয়ই ব্লেড পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়া, আগে একটা অন্য কাজ সেরে নিই।'

আরও কিছুদূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি

উঁচ উঁচু অক্ষরে লেখা আছে—

MALKANI & CO

ANTIQUE & CURIO DEALERS

কাচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা সব পুরনো আমলের জিনিসের দোকান। ঢুকে দেখি হরেক রকমের পুরনো জিনিসে দোকানটা গিজগিজ করছে—গয়নাগাটি কার্পেট ঘড়ি চেয়ার টেবিল ঝাড়লণ্ঠন বাঁধানো ছবি আর আরও কত কী।

পাকাচুলওয়ালা সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা বলল, 'বাদশাদের আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে আপনাদের এখানে ?'

'গয়না তো নেই। তবে মুগল আমলের ঢাল তলোয়ার জাজিম বর্ম, এই সব কিছু আছে। দেখাব ?'

ফেলুদা একটা কাচের আতরদান হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'পিয়ারিলালের কাছে কিছু মুগল আমলের গয়না দেখেছিলাম। তিনি তো আপনার খুব বড় খদ্দের ছিলেন, তাই না ?'

ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন।

'বড় খদ্দের ? কোন পিয়ারিলাল ?'

'কেন—পিয়ারিলাল শেঠ, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন।'

মালকানি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে কখনই কিছু কেনেননি তিনি, আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর নেই।'

'আই সি। তা হলে বোধহয় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিনেছিলেন।'

'তাই হবে।'

'এখানে বড় খদ্দের বলতে কাকে বলেন আপনি ?'

মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খদ্দের তার খুব বেশি নেই। বললেন, 'বিদেশি টুরিস্ট এসে মাঝে মাঝে ভাল জিনিস ভাল দামে

কিনে নিয়ে যায়। এখানের খদ্দের বলতে মিস্টার মেহ্‌তা আছেন, মাঝে মাঝে এটা সেটা নেন, আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেক দিনের খদ্দের—সেদিন তিন হাজার টাকায় একটা কার্পেট কিনে নিয়ে গেছেন—খাস ইরানের জিনিস।'

ফেলুদা হঠাৎ একটা হাতির দাঁতের তৈরি নৌকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা বাংলা দেশের জিনিস না?'

'হ্যাঁ, মুরশিদাবাদ।'

'দেখেছিস তোপ্‌সে—বজরাটা কেমন বানিয়েছে।'

সত্যি, এত সুন্দর হাতির দাঁতের কাজ করা নৌকো আমি কখনও দেখিনি। বজরার ছাতে সামিয়ানার তলায় নবাব বসে গড়গড়া টানছে, তার দুপাশে পাত্রমিত্র সভাসদ সব বসে আছে, আর সামনে নাচগান হচ্ছে। ষোলোজন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে, আর একটা লোক হাল ধরে বসে আছে। তা ছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সব কিছুই আছে, আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে যায়।

ফেলুদা বলল, 'এটা কোত্থেকে পেলেন?'

'ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার।'

'কোন মিস্টার সরকার?'

'মিস্টার বি. সরকার—যিনি বাদশানগরে থাকেন। উনি মাঝে মাঝে এটা সেটা কিনে নিয়ে যান। ভাল জিনিস আছে ওঁর কাছে।'

'আই সি। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আপনার দোকান ভারী ভাল লাগল। গুড ডে।'

'গুড ডে, স্যার।'

বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'বনবিহারী সরকারের তা হলে এ সব দোকানে যাতায়াত আছে। অবিশ্যি সে সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল।'

'কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এ সব ব্যাপারে ওঁর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

'ইন্টারেস্ট' না থাকলে পাথর দেখেই কেউ বলতে পারে সেটা

আসল কি নকল ?'

মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এম্পায়ার বুক স্টল বলে একটা বইয়ের দোকান। ফেলুদা বলল ওর হরিদ্বার লছমনঝুলা সম্বন্ধে একটা বই কেনা দরকার, তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম, আর ঢুকেই দেখি পিয়ারিলালের ছেলে মহাবীর।

ফেলুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ক্রিকেটের বই কিনছে। ভেরি গুড।'

মহাবীর আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই আমাদের দেখতে পায়নি।

ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নেভিল কার্ডাসের কোনও বই আছে আপনাদের ?'

বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল। আমি জানতাম নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল বই লিখেছে।

দোকানদার বলল, 'কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো ?'

'Centuries বইটা আছে ?'

'আজ্ঞে না—তবে অন্য বই দেখাতে পারি।'

মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট ?'

'হ্যাঁ। আপনারও দেখছি...'

মহাবীর তার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা আমার অর্ডার দেওয়া ছিল। ব্র্যাডম্যানের আত্মজীবনী।'

'ওহো—ওটা পড়েছি। দারুণ বই।'

'আপনার কী মনে হয়—রণজি বড় ছিলেন, না ব্র্যাডম্যান ?'

দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর মহাবীর বলল, 'কাছেই কোয়ালিটি আছে, আসুন না একটু বসে চা খাই।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। আমরা তিনজনে গিয়ে কোয়ালিটিতে ঢুকলাম। ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা-কোলা অর্ডার দিলাম। মহাবীর বলল, 'আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন ?'

ফেলুদা বলল, 'খেলতাম। স্লো স্পিন বল দিতাম। লখ্‌নৌয়ে

ক্রিকেট খেলে গেছি। ..আর আপনি ?'

'আমি ডুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলেছি। বাবাও স্কুলে থাকতে ভাল খেলতেন।'

পিয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল।

ফেলুদা চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আপনি আংটির ঘটনাটা জানেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি বললেন।'

'আপনার বাবার যে আংটি ছিল, আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো ?'

'বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে ভাল করে দেবার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি একটা কিছু দিতে চান। সেটা যে কী, সেটা অবিশ্যি আমি বাবা মারা যাবার পর শ্রীবাস্তবের কাছেই জেনেছি।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর বলল, 'কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট নিয়েছেন কেন ?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার।'

মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে আর কে থাকেন ?'

'আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন, আর চাকর-বাকর।'

'চাকর-বাকর কি পুরনো ?'

'সবাই আমার জন্মের আগে থেকে আছে। অর্থাৎ কলকাতায় থাকার সময় থেকে প্রীতম সিং বেয়ারা আছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আংটিটার মতো আর কোনও জিনিস আপনার বাবার কাছে ছিল ?'

'বাবার এ-শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা অনেক দিন আগের ব্যাপার। তখন আমি খুবই ছোট। এবার এসে এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম, তাতে বাদশাহী আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি। তবে আংটিটার মতো অত দামি বোধহয় আর কোনওটা নয়।'

আমি 'স্ট্র' দিয়ে আমার ঠাণ্ডা কোকা-কোলায় চুমুক দিলাম। মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে।'

ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। রেস্টুরেন্টের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মহাবীর বলল, 'বাবার যেদিন দ্বিতীয় বার হার্ট অ্যাটাক হল, সেদিন সকালে অ্যাটাকটা হবার কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।'

'বটে?'

'কিন্তু প্রীতম সিং তখন খুব বিচলিত হয়নি, কারণ বাবার মাঝে মাঝে কোমরে একটা ব্যথা হত, তখন চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর সাহায্য নিতেন না। প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার জন্যই উনি চিৎকার করছেন, কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল হতে পারে, কারণ চিৎকারটা ছিল বেশ জোরে।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না সে খবর আপনি জানেন? প্রীতম সিং-এর কিছু মনে আছে কি?'

'সে কথা আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ও ডেফিনিটলি কিছু বলতে পারছে না। সকালের দিকটায় মাঝে মাঝে বাবার কাছে লোকজন আসত—কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওঁর কাছে কেউ এসেছিল কি না সে কথা প্রীতম বলতে পারছে না। প্রীতম যখন বাবার ঘরে গিয়েছিল, তখন ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ, আর তখন ঘরে অন্য কোনও লোক ছিল না। তারপর প্রীতমই ফোন করে শ্রীবাস্তবকে আনায়। বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন—ডক্টর গ্রেহ্যাম—তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কন্‌ফারেন্সে।'

'আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

'স্পাই?'—মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'ও, তা হলে আপনি এটা জানেন না। আপনার বাবা শ্রীবাস্তবকে 'স্পাই' সম্বন্ধে কী যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে

পারেননি।'

মহাবীর মাথা নেড়ে বলল, 'এটা আমার কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর বাবার সঙ্গে গুপ্তচরের কী সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে পারছি না।'

আমি কোকো-কোলাটাকে শেষ করে সবে স্ট্র-টাকে দুমড়ে দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম একজন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদের কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে খেতে আমাদেরই দিকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন, আর ফেলুদার দিকে ঘাড়টা কাত করে বললেন, 'নমস্কার। চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ—কেন পারব না।'

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে গেল—ইনিই বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওঁর চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন। ভদ্রলোকের থুতনিতে একটা তুলোর উপর দুটো স্টিকিং প্লাস্টার ক্রসের মতো করে লাগানো রয়েছে। বোধহয় দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'বসুন। ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ—আর ইনি গণেশ গুহ।'

এবার লক্ষ করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আঁচড়ের দাগ রয়েছে—যদিও এ দাগটা পুরনো।

ফেলুদা বলল, 'আপনার থুতনিতে কী হল?'

গণেশবাবু তার নিজের টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এনে আমাদের টেবিলে রেখে বলল, 'আর বলবেন না—সমস্ত শরীরটাই যে অ্যাদ্দিন ছিঁড়ে ফুঁড়ে শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্যি। আমার চাকরিটা কী সে তো জানেনই।'

'জানি। তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়েই করেন আপনি।'

'পাগল! সব পেটের দায়ে। এক কালে বিজু সার্কাসের বাঘের ইন্‌-চার্জ ছিলুম—তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে

থাকত। বনবিহারীবাবুর এই সব জানোয়ারের কাছে তো সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সেদিন বেড়ালের আঁচড়, আর কাল এই থুতনিতে হাইনার চাপড়! আর পারলুম না। সকালে গিয়ে বলে এসেছি—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি ফিরে যাচ্ছি সার্কাস পার্টিতে। তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।'

ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সেকী, আপনি বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিলেন? কাল বিকেলেও তো আমরা ওঁর ওখানে ঘুরে এলাম।'

'জানি। শুধু আপনারা কেন, অনেকেই যাবেন। কিন্তু আমি আর ও তল্লাটেই নয়। এই এখন স্টেশনে যাব, গিয়ে হাওড়ার টিকিট কাটব। ব্যস্—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত। আর—' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, '—একটা কথা বলে যাই—উনি লোকটি খুব সুবিধের নন।'

'বনবিহারীবাবু?'

'আগে ঠিকই ছিলেন, ইদানীং হাতে একটি জিনিস পেয়ে মাথাটি গেছে বিগড়ে।'

'কী জিনিস?'

'সে আর না হয় নাই বললাম'—বলে গণেশ গুহ তার চায়ের পয়সা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ফেলুদা এবার মহাবীরের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি দেখেছেন বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানা?'

'ইচ্ছে ছিল যাওয়ার—কিন্তু হয়নি। বাবার আপত্তি ছিল। ওই ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না। একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে যেত! তবে এবার ভাবছি একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

মহাবীর তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল। ফেলুদা অবিশ্যি চায়ের দামটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে ফিল্মের অ্যাক্টরের অনেক টাকা, কাজেই মহাবীর

দিলে কোনও ক্ষতি নেই।

বিলটা দেবার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম প্যাকেটটা চারমিনারের।

'আপনি কদিন আছেন?' মহাবীর জিজ্ঞেস করল।

'পরশু দিন-দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে বাকি এ মাসটা আছি।'

'আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার?'

'ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না। আমরা তিনজন যাচ্ছি, আর বোধ হয় বনবিহারীবাবু। উনি লছমনঝুলায় একটা অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন।'

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম। মহাবীর বলল, 'আমার কিন্তু গাড়ি আছে—আমি লিফ্‌ট দিতে পারি।'

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'না, থাক। মোটর তো কলকাতায় হামেশাই চড়ি। এখানে টাঙ্গাটা বেড়ে লাগছে।'

এবার মহাবীর ফেলুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভাল লাগল। একটা কথা আপনাকে বলছি—যদি জানতে পারি যে বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী, তা হলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বার করে তার প্রতিশোধ আমি নেবই। আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি চার বছর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ছিলাম। রিভলভারের লাইসেন্স আছে, আমার মতো অব্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই।...গুড বাই।'

মহাবীর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে হুশ্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা খালি বলল, 'সাবাস্‌।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ সেটা খুব ভুল নয়।

টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্লেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধহয় ফেলুদার নেই।

॥ ৭ ॥

হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে। লখ্নৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে, আর হরিদ্বার পৌঁছায় সাড়ে চারটায়।

লখ্নৌ আসার আগে যখন হরিদ্বার যাবার কথা হয় তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। কারণ পুরী ছাড়া আমি কোনও তীর্থস্থান দেখিনি। কিন্তু লখ্নৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আর সে রহস্যের এখনও কোনও সমাধান না হওয়ায়, আমার এখন আর লখ্নৌ ছেড়ে যেতে খুব বেশি ইচ্ছা করছিল না।

কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনও অভাব নেই। ও বলল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ আর লছমনঝুলা—এই তিনটে জায়গা পর পর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে। কারণ তিন জায়গার গঙ্গা দেখবি তিন রকম। যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে। আর ফাইন্যালি লছমনঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে উত্তাল পাহাড়ে নদী। স্রোতের শব্দে প্রায় কথাই শোনা যায় না।'

আমি বললাম, 'তোমার এ সব দেখা আছে বুঝি?'

'সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লখ্নৌ এলাম, সেবারই দেখা সেরে গেছি।'

ধীরুকাকা অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তবে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে এলেন। কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ শ্রীবাস্তব। আমি ভাবলাম উনিও বুঝি ধীরুকাকার মতো 'সি-অফ্' করতে এসেছেন, কিন্তু তারপর দেখলাম কুলির মাথা থেকে স্যুটকেস নামাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই অবাক ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ধীরুবাবুকে বলিয়েছিলাম যেন আপনাদের না বোলেন। উনি জানতেন আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বোলেন তো!'

বাবা দেখলাম খুশি হয়েই বললেন, 'খুব ভালই হল। আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন, তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে বলতাম।'

শ্রীবাস্তব বেঞ্চির একটা কোণ ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন, ‘সত্যি জানেন কী—কদিন বড্ড ওয়ারিড আছি। আমাকে বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। পিয়ারিলালের দেওয়া জিনিসটা এইভাবে গেল—ভাবলে বড় খারাপ লাগে। শহর ছেড়ে দুদিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারলে খানিকটা শান্তি পাব।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বনবিহারীবাবুও এসে পড়লেন। তাঁর মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশিই মনে হল। ভদ্রলোক হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, ‘এইবার রগড় দেখবেন। পবিত্রানন্দস্বামী চলেছেন এ-গাড়িতে। তাঁর ভক্তরা তাঁকে বিদায় দিতে আসছেন। ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার।’

সত্যিই, কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন ফুলের মালাটালা নিয়ে একজন মোটামতো গেরুয়াপরা লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী এসে আমাদের পাশের ফার্স্টক্লাস গাড়িটায় উঠলেন। ওঁর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন গেরুয়াপরা লোক উঠল—আর কিছু গেরুয়াপরা, আর অনেক এমনি পোশাক পরা লোক কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল।

গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট দেরি, তাই আমরা সব উঠে পড়েছি, ধীরুকাকা কেবল জানালার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় একজন গেরুয়াপরা লোক হঠাৎ ধীরুকাকার দিকে হাসিহাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল।

‘ধীরেন না ? চিনতে পারছ ?’

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে, হঠাৎ—‘অম্বিকা নাকি ?’—বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। ‘বাপ্‌রে বাপ !—তোমার আবার এ-পোশাক কী হে ?’

‘কেন, এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল।’

ধীরুকাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘অম্বিকা হল আমার স্কুলের সহপাঠী। প্রায় পনেরো বছর পরে দেখা ওর সঙ্গে।’

গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে। ঘ্যাঁ—চ্ করে গাড়ি ছাড়ার শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অম্বিকাবাবু ধীরুকাকাকে বলছেন, 'আরে, সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধঘন্টা বসে রইলাম। তুমি ছিলে না। তোমার বেয়ারা তোমাকে সে কথা বলেনি ?'

ধীরুকাকা কী উত্তর দিলেন সেটা আর শোনা গেল না, কারণ গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা, আর তারপর বাবার দিকে চাইলাম। ফেলুদার কপালে দারুণ ভ্রূকুটি।

বাবা বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই ভদ্রলোককেই কি আপনারা আংটিচোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন ?'

বাবা বললেন, 'সে-প্রশ্ন অবিশ্যি আর ওঠে না। কিন্তু আংটিটা তা হলে গেল কোথায় ? কে নিল ?'

ট্রেনটা ঘটাং ঘটাং করে লখ্‌নৌ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরোল। স্টেশনের মাথার গম্বুজগুলো ভারী সুন্দর দেখতে, কিন্তু এখন আর ও সব যেন চোখেই পড়ছিল না। মাথার মধ্যে সব যেন কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছে। ও-তো সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ নিতে নিতে একেবারে লখ্‌নৌ স্টেশন অবধি পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু তা হলে স্টেশনের সেই অ্যাটাচি-কেসওয়ালা সন্ন্যাসী কে ? আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী নয়—একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী। সে কি তা হলে আরেকজন লোক ? আর সেও কি ধীরুকাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল ? আর সেটার কারণ কি ওই আংটি, না অন্য কিছু ? আর ফেলুদার গায়ে 'খুব হুঁশিয়ার' লেখা কাগজ কে ছুঁড়ে মেরেছিল—আর কেন ?

ফেলুদার মাথাতে কি এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে—না সে অন্য কিছু ভাবছে ?

ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখা

খাতাটা বার করে খুব মন দিয়ে পড়ছে—আর মাঝে মাঝে কলম দিয়ে আরও কী সব জানি লিখছে।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন : 'আচ্ছা, ডক্টর শ্রীবাস্তব—পিয়ারিলাল মারা যাবার আগে আপনিই বোধহয় শেষ তাঁকে দেখেছিলেন, তাই না ?'

শ্রীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলালেবু বার করে সকলকে একটা একটা করে দিতে দিতে বললেন, 'আমি ছিলাম, ওনার বিধবা বোন ছিলেন, ওনার বেয়ারা ছিল, আর অন্য একটি চাকরও ছিল।'

বনবিহারীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ।...ওঁর অ্যাটাকটা হবার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন ?'

'হাড়ের চিকিৎসা করলে হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় বনবিহারীবাবু ! আর ওঁর ডাক্তার গ্রেহ্যাম শহরে ছিলেন না, তাই আমাকে ডেকেছিলেন।'

'কে ডেকেছিল ?'

'ওঁর বেয়ারা।'

'বেয়ারা ?' বনবিহারীবাবু ভ্রূ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। প্রীতম সিং। অনেক দিনের লোক। খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, কাজের লোক।'

বনবিহারীবাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলালেবুর একটা কোয়া মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আপনি বলেছেন পিয়ারিলাল আংটিটা দিয়েছেন প্রথম অ্যাটাকের পর। আর দ্বিতীয় অ্যাটাকের পর আপনাকে ডাকা হয়, আর সেই অ্যাটাকেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আংটিটা দেবার সময় ঘরে কেউ ছিল কি ?'

'তা কী করে থাকবে বনবিহারীবাবু ? এ সব কাজ কি আর বাইরের লোকের সামনে কেউ করে ? বিশেষ করে পিয়ারিলাল কী রকম লোক ছিলেন তা তো আপনি জানেন। ঢাক বাজিয়ে নোব্‌ল কাজ করার লোক তিনি একেবারেই ছিলেন না। ওনার কত সিক্রেট

চ্যারিটি আছে তা জানেন ? লাখ লাখ টাকা হাসপাতালে অনাথাশ্রমে দান করেছেন, অথচ কোনও কাগজে তার বিষয়ে কখনও কিছু বেরোয়নি।'

'হুঁ।'

শ্রীবাস্তব বনবিহারীবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—এই আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল হল—অথচ কেউ জানতে পারল না।'

শ্রীবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললেন, 'বাঃ বনবিহারীবাবু, বাঃ। আমি পিয়ারিলালের আংটি চুরি করলাম, আমিই ধীরেনবাবুর কাছে সেটা রাখলাম, আবার আমিই সেটা ধীরেনবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম ? ওয়ান্ডারফুল !'

বনবিহারীবাবু তাঁর মুখের ভাব একটুও না বদলিয়ে বললেন, 'আপনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আমি হলেও তাই করতাম। কারণ আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন, তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। তারপর ধীরুবাবু আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কী বলো, ফেলু মাস্টার ? আমার গোয়েন্দাগিরিটা কি নেহাত উড়িয়ে দেবার মতো ?'

ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'ডাক্তার শ্রীবাস্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার কি কোনও সাক্ষীর অভাব আছে ?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'না তা হয়তো নেই।'

ফেলুদা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আংটির দাম যত লাখ টাকাই হোক না কেন, একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি নয়। শ্রীবাস্তব যদি আংটি চুরি করে থাকেন, তা হলে তাঁর অপরাধ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখন যারা ওঁর আংটির পিছনে

লেগেছে, তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি, কারণ তারা একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর।’

‘বুঝেছি।’ বনবিহারীবাবুর গলার স্বর গম্ভীর। ‘তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনও আংটিটা আছে।’

‘না। করি না। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।’

কামরার সকলেই চুপ। আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ‘কী প্রমাণ আছে তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?’

‘জিজ্ঞেস নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর এখন পাবেন না—তার সময় এখনও আসেনি।’

আমি ফেলুদাকে এরকম জোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে কখনও শুনিনি।

বনবিহারীবাবু আবার ঠাট্টার সুরে বললেন, ‘আমি বেঁচে থাকতে সে উত্তর পাব তো?’

ফেলুদা বলল, ‘আশা তো করছি। একটা স্পাই-এর রহস্য আছে—সেটা সমাধান হলেই পাবেন।’

‘স্পাই?’ বনবিহারীবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ‘কী স্পাই?’

শ্রীবাস্তব বললেন, ‘ফেলুবাবু বোধহয় পিয়ারিলালের লাস্ট ওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন। মারা যাবার আগে দুবার ‘স্পাই’ কথাটা বলেছিলেন।’

বনবিহারীবাবুর ভ্রূকুটি আরও বেড়ে গেল। বললেন, ‘আশ্চর্য। লখ্‌নৌ শহরে স্পাই?’

তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের দিকে চেয়ে বললেন ‘হতে পারে...হতে পারে...আমার একবার একটা সন্দেহ হয়েছিল বটে।’

‘কী সন্দেহ?’—শ্রীবাস্তব জিজ্ঞেস করলেন।

‘নাঃ। কিচ্ছু না।...আই মে বি রং।’

বুঝলাম বনবিহারীবাবু আর ও বিষয় কিছু বলতে চান না। আর এমনিতেই হরদোই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধই হয়ে গেল।

'একটু চা হলে মন্দ হয় না'—বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম, কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির ভিতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

আমরা নামতেই আরেকজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক কোখেকে জানি এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কামরা রিজার্ভড্—জায়গা নেই, জায়গা নেই।'

তাতে গেরুয়াধারী ইংরিজিতে বলল, 'বেরিলি পর্যন্ত যেতে দিন দয়া করে। তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব। রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করব না।'

অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'সন্ন্যাসীদের জ্বালায় দেখছি আর পারা গেল না। এই চা-ওয়ালা!'

চা-ওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এল।

'তুই খাবি?'

'কেন খাব না?'

অন্যদের জিজ্ঞেস করাতে ওঁরা বললেন যে খাবেন না।

গরম চায়ের ভাঁড় কোনও রকমে এ-হাত ও-হাত করতে করতে ফেলুদাকে বললাম, 'শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

ফেলুদা ওই সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ ওঁকে আমার বেশ ভাল লাগে—আর মনে হয় খুব ভালমানুষ।'

'বোকচন্দর—তুই যে ডিটেকটিভ বই পড়িসনি। পড়লে জানতে পারতিস যে যে-লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয়, সে-ই শেষ পর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয়।'

'এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বই-এর ঘটনা নয়।'

'তাতে কী হল? বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তো লেখকরা আইডিয়া পান।'

আমার ভারী রাগ হল। বললাম, 'তা হলে শ্রীবাস্তব যখন প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে

ওঁকে ওয়াচ করছিল, আর চারমিনার খাচ্ছিল ?'

'সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক।'

'তা হলে তুমি বলছ শ্রীবাস্তবও খারাপ লোক, আর ডাকাতরাও খারাপ লোক ? তা হলে তো সকলেই খারাপ লোক—কারণ গণেশ গুহ বলছিল বনবিহারীবাবুও লোক ভাল নয়।'

ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক দিতেই কোত্থেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাঁই করে এসে ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল।

এক ছোবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল। এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনও উপায় নেই।

কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দলা পাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল।

কাগজে লেখা ছিল 'খুব হুঁশিয়ার'—আর দেখে বুঝলাম এবারও পানের রস দিয়েই লেখা।

বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা মোটেই লখ্‌নৌ শহরে ছেড়ে আসিনি। সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলির দিকে।

কামরায় সবসুদ্ধ সাতজন লোক। আমি আর ফেলুদা একটা বেঞ্চিতে, একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব, আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু আর সেই সন্ন্যাসী। বাবাদের উপরের বাঙ্কে বনবিহারীবাবুর একটা কাঠের প্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে। আমাদের উপরের বাঙ্কে একটা লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লখ্‌নৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত

আর চাদরমুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি। তার পায়ের ডগাদুটো শুধু বেরিয়ে আছে, উপরের দিকে চাইলেই দেখা যায়।

বনবিহারীবাবু বেঞ্চির উপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ টানছেন, শ্রীবাস্তব 'গীতাঞ্জলি' পড়ছেন, আর বাবাকে দেখলেই মনে হয় ওঁর ঘুম পেয়েছে। মাঝে মাঝে চোখ রগড়িয়ে টান হয়ে বসছেন। সন্ন্যাসীর যেন আমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্টারেস্ট নেই। সে একমনে একটা হিন্দি খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। ফেলুদা জানালার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে তালে একটা গান ধরেছে। সেটা আবার হিন্দি গান। তার প্রথম দুলাইন হচ্ছে—

যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হাল আদম্‌ পর ক্যা গুজরী...

বাকিটা ফেলুদা হুঁ হুঁ করে গাইছে। বুঝলাম ওই দুলাইন ছাড়া আর কথা জানা নেই।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'ওয়াজিদ আলি শা-র গান তুমি জানলে কী করে?'

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন। খুব ভাল ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন।'

বনবিহারীবাবু পাইপে টান দিয়ে জানালার বাইরে সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি। গান গাইতেন পাখির মতো। গান রচনাও করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন—একেবারে বিলিতি ঢং-এ। কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও। শেষ বয়সটা কাটে কলকাতার মেটেবুরুজে—এখন যেখানে সব কলকাতার মুসলমান দরজিগুলো থাকে। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো? তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে একজোটে কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওয়াজিদ আলি শা।'

কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বাঙ্কে রাখা ট্রাঙ্কটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বার

করে বেঞ্চির উপরে রেখে বললেন, 'এবার আমার প্রিয় কিছু গান শোনাই। এটা হচ্ছে আমার টেপ রেকর্ডার। ব্যাটারিতে চলে।'

এই বলে বাক্সটার ঢাকনা খুলে হারমোনিয়ামের পর্দার মতো দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতেই পারলাম কী একটা জিনিস জানি চলতে আরম্ভ করল।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে হয় তা হলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে শোনো।'

আমি বাইরের দিকে চেয়ে আবছা আলোতে দেখলাম, বিরাট গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উলটো দিকে। সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বনবিড়ালের কর্কশ চিৎকার।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ভলুম ইচ্ছে করে বাড়াইনি—যাতে মনে হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে।'

তারপর শুনলাম হাইনার হাসি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি—আর সারা জঙ্গল থেকে হাইনার হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এর পরের শব্দটা আরেকটু কমানো উচিত, কারণ ওটা শোনা যায় খুব আস্তেই। তবে গাড়ির শব্দের জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি।'

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্ কিট্ কিট্...কির্‌র্‌র্‌ কিট্ কিট্ কিট্...'

আমার বুকের ভিতরটা যেন টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'র‍্যাট্‌ল স্নেক।...আওয়াজটা শুনলে যদিও ভয় করে, কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দেবার জন্যই শব্দটা করে—যাতে অন্য কোনও প্রাণী অজান্তে ওদের মাড়িয়ে না ফেলে।'

বাবা বললেন, 'তা হলে ওরা এমনিতে মানুষকে অ্যাটাক করে না?'

'জঙ্গলে-টঙ্গলে এমনিতে করে না। সে আমাদের দিশি বিষাক্ত সাপেরাই বা কটা অ্যাটাক করে বলুন। তবে কোণঠাসা হয়ে গেলে করে বইকী। যেমন ধরুন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে

যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায়—তা হলে কি আর করবে না ? নিশ্চয়ই করবে। আর এদের আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতা কী জানেন তো—ইনফ্রা রেড রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ, এরা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায়।'

তারপর রেকর্ডারি বন্ধ করে দিয়ে বনবিহারীবাবু বললেন, 'দুঃখের বিষয় আমার বাকি যে-কটি প্রাণী আছে—বিছে আর মাকড়সা—তারা দুটিই মৌন। এবার যদি অজগরটি পাই, তা হলে তার ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব।'

বাবা বললেন, 'ভয় ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু আমার কাছে এ-শব্দ সংগীতের চেয়েও মধুর! বাইরে যখন যাই, জানোয়ারগুলোকে তো তখন নিয়ে যেতে পারি না, তাই এই শব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে।'

বেরিলিতে আমাদের ডিনার দিল, আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ফেলুদা এক প্লেট খাবার পরেও আমার প্লেট থেকে মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে বলল, 'ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে, তখন মুরগি জিনিসটা খুব হেল্প করে।'

'আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না!'

'তোরটা কাজ নয়, খেলা।'

'তোমার এত কাজ করে কী ফলটা হচ্ছে শুনি।'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই এমনভাবে বলল, 'পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলেছিলেন সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি।'

এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল।

গাড়ি বেরিলি ছেড়েছে। বাবা বললেন, 'ভোর চারটায় উঠতে হবে। তোরা সব এবার শুয়ে পড়।'

বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে দিলাম। বনবিহারীবাবু বললেন উনি ঘুমোবেন না। 'তবে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি হরিদ্বার আসার ঠিক আগেই

আপনাদের তুলে দেব।'

বাবা আর শ্রীবাস্তব ওঁদের বেঞ্চিটায় ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়লেন। বনবিহারীবাবু দেখলাম বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে। শুধু তাই না, আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে। বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ, আর সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলেছে।

চাঁদ দেখতে দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে, হরিদ্বারে শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না—আরও কিছু ঘটবে সেখানে। কিংবা এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক। শুধু গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই যেন ওখানে যাওয়াটা সার্থক হবে না।

আচ্ছা, ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কী করে ঘুম এসে যায়? কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং ঘটাং শব্দ হত, আর আমার খাটটাকে ধরে কেউ যদি ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিত, তা হলে কি ঘুম আসত? ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, 'এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয়, তা হলে মানুষের কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়; তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না। আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে। খোকাদের দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিসনি? বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তা হলেই ঘুম ভেঙে যাবার চান্স থাকে। তুই লক্ষ করে দেখিস, অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায়।'

ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুজে এসেছে, তখন একবার মনে হল বাঙ্কের উপর যে লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে যেন উঠে বাঙ্ক থেকে নেমে একবার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করল। তারপর একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম—সেটা মানুষও হতে পারে, আবার হাইনাও হতে পারে। তারপর দেখলাম আমি ভুলভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, আর যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই দেখছি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রকাণ্ড

দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। একবার একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার একটা প্রকাণ্ড কালো লোমে ঢাকা পা আমার কাঁধের উপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন একসঙ্গে ভেঙে গেল, আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলছে—

'এই তোপ্‌সে ওঠ্‌! হরিদ্বার এসে গেছে।'

॥ ৯ ॥

'পাণ্ডা চাই, বাবু পাণ্ডা?'

'বাবুর নামটা কী? নিবাস কোথায়?'

'এই যে বাবু, এদিকে! কোন ধর্মশালায় উঠেছেন বাবু?'

'বাবা দক্ষেশ্বর দর্শন হবে তো বাবু?'

প্ল্যাটফর্মে নামতে না নামতে পাণ্ডারা যে এভাবে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি আগেই বলেছিল যে এরকম হয়; আর এই সব পাণ্ডাদের কাছে নাকি প্রকাণ্ড মোটা মোটা সব খাতা থাকে, তাতে নাকি আমাদের সব দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে—অবিশ্যি তাঁরা যদি কোনওদিন হরিদ্বার এসে থাকেন তা হলেই। বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নাকি অনেকদিন হরিদ্বারে ছিলেন। হয়তো এই সব খাতার মধ্যে তাঁর নাম, ঠিকানা আর হাতের লেখা পাওয়া যাবে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাণ্ডাটাণ্ডার কোনও দরকার নেই। এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতটাই বেশি। চলুন, আমার জানা শীতল দাসের ধরমশালায় নিয়ে যাই আপনাদের। একসঙ্গে থাকা যাবে, খাওয়াও মন্দ না। একদিনের তো মামলা। তারপর তো মোটরে করে হৃষীকেশ-লছমনঝুলা।'

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম।—একটায় ফেলুদা

আর আমি, একটায় বনবিহারীবাবু, আর একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব।

যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর। তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালই লাগবে।'

খট্ খট্ ঘড় ঘড় করতে করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলেছে। দোকান-টোকান এখনও একটাও খোলেনি। রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেরোসিনের বাতি দু একটা টিম্ টিম্ করে জ্বলছে এখানে সেখানে। কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেঁটে চলেছে। ফেলুদা বলল ওরা গঙ্গাস্নান যাত্রী। সূর্য যখন উঠবে তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে স্তব করবে। বাকি শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে।

আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন। একটা সাদা একতলা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল। আমাদের আর বাবাদের গাড়িও তার পিছনে থামল। বুঝলাম এটাই শীতলদাসের ধর্মশালা।

বাড়ির সামনের ফটকের ভিতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় খোলা জায়গা, আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের সারি।

ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল। আমরা তার ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় আরেকটা টাঙ্গা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তারপর দেখি, বেরিলি পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন। লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এই সেই ট্রেনের সন্ন্যাসী, ফেলুদা!'

ফেলুদা একবার আড় চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি নাকি?'

'কিন্তু বার বার—'

'চোপ্! চ' ভেতরে চ'।'

দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। একটাতে চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে, তার মধ্যে একটাতে একজন লোক ঘুমোচ্ছে, আর বাকি তিনটে আমি, বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক হল। পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হল। বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন।

মুখটুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে খেতে সূর্য উঠে গেল, আর ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারলাম কতরকম লোক সেখানে এসে রয়েছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্থানি মাড়োয়াড়ি গুজরাটি মারাঠি মিলে হইচই হট্টগোল ব্যাপার।

বাবা বললেন, 'তোরা কি বেরোবি নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'সেরকম তো ভাবছিলাম। একবার ঘাটের দিকটা ঘুরে এলে...'

'তা হলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি। আর একটা কাজ করো তো ফেলু—বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি এভারেডি টর্চ পাওয়া যায়। এ তো আর লখনৌ শহর না—ও জিনিস একটা হাতে রাখা ভাল।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল এত ছোট শহরে টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলুম হরিদ্বার শহরে সত্যিই বেশ ঠাণ্ডা। আর গঙ্গার পাশে বলেই বোধহয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল, 'যত না কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া।'

ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে ঘাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইহাসে আধা মিল যানেসেই ঘাট মিল যায়গা।'

ঘাটে পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই একটা গণ্ডগোল শুনতে পাচ্ছিলাম, শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক একসঙ্গে স্নান করার গণ্ডগোল। তার উপর ঘাটের পথের দুদিকে

ভিখিরি আর ফেরিওয়ালার সারি, তারাও কম চেঁচামেচি করছে না।

আমরা ভিড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। এরকম দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি। জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে। ঘাটের উপরেই একটা মন্দির, তার থেকে আরতির ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এক জায়গায় গলায় কণ্ঠী পরা, কপালে তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে। তাকে ঘিরে একদল বুড়োবুড়ি বসে আছে। মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর গোরুবাছুরও কিছু কম নেই।

ফেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো এই ঘাটের ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাক।'

লখ্‌নৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে, আমার মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় মুছেই যাচ্ছিল। ফেলুদারও কি তাই—না কি ও মনে মনে রহস্য সমাধানের কাজ চালিয়েই চলেছে? ওকে সে কথাটা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। ওর দিকে ফিরে দেখি, ও বেশ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বার করেছে। বাবাদের সামনে তো খেতে পারে না, তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে।

সিগারেটটা মুখে পুরে দেশলাই-এর বাক্সটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে কী যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'ওটা কী, ফেলুদা?'

ফেলুদা ততক্ষণে দেশলাই বার করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। সে অবাক হবার ভাব করে বলল, 'কোনটা?'

'ওই যে চক্ চক্ করে উঠল—দেশলাই-এর বাক্সে?'

ফেলুদা কায়দা করে দুহাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দেশলাইতে ফসফরাস থাকে জানিস তো? সেইটেই রোদে চক্‌চক্ করে উঠেছে আর কী।'

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিন্তু দেশলাই-এর উপর রোদ পড়ে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে, এ জিনিসটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

হরি-কা-চরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, দক্ষেশ্বরের মন্দির দেখে বাজারের মনিহারি দোকান থেকে যখন আমরা তিন-সেলের একটা টর্চ কিনছি, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। যতই ঘুরি না কেন, আর যা-ই দেখি না কেন, ফেলুদার দেশলাই-এর বাক্সর মধ্যে ওই চক্‌-চকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে ওই আওরঙ্গজেবের আংটির হিরের চক্‌চকানি। ফেলুদা যদি বলত ওটা একটা সিকি বা আধুলি—তা হলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্তু ফস্‌ফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল, সেটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

আর আংটিটা যদি সত্যিই ফেলুদার কাছে থেকে থাকে, আর সেটার পিছনে যদি সত্যিই ডাকাত লেগে থাকে, আর সে ডাকাত যদি জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছেই আংটিটা আছে—তা হলে ? সেটা সে জানে বলেই কি ফেলুদা ও সব হুমকি দেওয়া-দেওয়া কাগজ পাচ্ছে, আর ওর দিকে গুলতি দিয়ে ইট মারছে, আর লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্মের ন্যাকড়া বেঁধে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ?

ফেলুদা কিন্তু সারা রাস্তা গুনগুন করে গান গেয়েছে। একবার গান থামিয়ে আমায় বলল, 'খট্‌ বলে একটা রাগ আছে জানিস ? এটা সেই রাগ। সকালে গাইতে হয়।'

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে 'খট্‌মট্‌ জানি না, রাগ-রাগিণী জানি না—কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় ধাপ্পা দিলে কেন।' কিন্তু কথাটা আর বলা হল না, কারণ তখন আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে।

ধরমশালার বারান্দায় দেখি বাবা, বনবিহারীবাবু, শ্রীবাস্তব আর একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন।

বাবা আমাদের দেখেই বললেন, 'ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কাল ভোর ছটায় রওনা। বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় বেশ শস্তায় হয়ে গেল।'

বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন—নাম বিলাসবাবু। তিনি নাকি একজন নামকরা হাত-দেখিয়ে। আপাতত বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন। বনবিহারীবাবু বললেন, 'কোনও জানোয়ারের কামড়-টামড় খেয়ে মরব কি না সেটা একবার দেখুন তো।'

ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারীবাবুর হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কই, তা তো দেখছি না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে।'

হতে পারেন বিলাসবাবু হাত-দেখিয়ে, আমার কিন্তু তাঁর পা-টা দেখে ভারী অদ্ভুত লাগল। বুড়ো আঙুলটা তার পাশের আঙুলের চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড়। আর সেটা দেখে মনে হল খুব রিসেন্‌ট্‌লি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি। কিন্তু কোথায় বা কার পা সেটা মনে করতে পারলাম না।

বনবিহারীবাবু একটা হাঁফ-ছাড়ার শব্দ করে বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

'কেন মোশাই, আপনি কি শিকার করেন নাকি? বাঘ-ভালুক মারেন?'

বিলাসবাবুর বাংলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'নাঃ। তবু—এ সব জেনে-টেনে রাখা ভাল। আমার এক খুড়তুতো ভাই—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল। তাই আর কী...

'আপনি কি আগে কলকাতায় ছিলেন?' বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'ওটাও কি হাতের রেখায় পাওয়া যায় নাকি?'

'তাই তো দেখছি। আর...আপনার কি পুরনো আমলের শিল্পদ্রব্য বা অন্য দামি জিনিস জমানোর শখ আছে?'

'আমার? না না—আমার কেন? সে ছিল পিয়ারিলালের। আমার শখ জন্তু জানোয়ারের।'

'তাই কি ? তাই কামড় খাওয়ার কথা বলছিলেন ? কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?'

বনবিহারীবাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি সম্প্রতি কোনও উদ্বেগের কারণ ঘটেছে ?'

'সম্প্রতি মানে ?'

'এই ধরুন—গত মাসখানেকের মধ্যে ?'

বনবিহারীবাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, 'মশাই—আমার, যাকে বলে, নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়র্লড। কোনও উদ্বেগ নেই। তবে হ্যাঁ—একটা অ্যাংজাইটি আছে এই যে, কাল লছমনঝুলায় গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাব কি না পাব।'

বিলাসবাবুর বোধহয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বনবিহারীবাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—কিছু মনে করবেন না—এ সব পামিস্ট্রি-টামিস্ট্রিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমাদের হাতে বটে—কিন্তু সেটা হাতের রেখায় নয়। হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা, সামর্থ্য। সেইটের উপরেই সব নির্ভর করে।'

এই বলে বনবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে।

অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়োআঙুলওয়ালা পা।

॥ ১০ ॥

সারাদিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

রাত্রে বাবা যদিও বললেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে—' তবুও খাওয়া-দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে শুতে প্রায়

দশটা হয়ে গেল।

লেপের তলায় যখন ঢুকছি, তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম।

ফেলুদা বলল, 'বিলাসবাবু।'

আমি বললাম, 'কী করে জানলে?'

'কেন, কাল ট্রেনেও ডাকছিল—শুনিসনি?'

ট্রেনে? বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন? তাই তো! একটা রহস্যের হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল।

'ওই বুড়ো আঙুল!'

ফেলুদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড!'

ঠিক কথা। আমাদের উপরের বাঙ্কে উনিই সারা রাস্তা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়ে ছিল বাঙ্ক থেকে, আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আঙুল।

কিন্তু এবার যে আসল প্রশ্নটা করতে হবে ফেলুদাকে। বাবার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছিলাম উনি এখনও ঘুমোননি। বাবা না ঘুমোলে কথাটা বলা চলে না, তাই আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

ধরমশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে সমস্ত শহরটা। শীতকাল, তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমাদের ঘরের ভিতর অন্ধকার। বাইরে উঠনে বোধহয় একটা লাইট জ্বলছে আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাঠে এসে পড়েছে। একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুট করে একটা শব্দ এল। বোধহয় ইঁদুর-টিদুর কিছু হবে।

এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওঁর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ। বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ফেলুদার দিকে ফিরলাম। তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'ওটা আংটিই ছিল, তাই না?'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই মতো ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার

কাছেই রয়েছে, সেই প্রথম দিন থেকেই। তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ার পর, ধীরুকাকার ঘরে আলনায় ঝোলানো ওঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে আংটিটা বার করে নিই। বাক্সটা নিইনি যাতে ডেফিনিটলি বোঝা যায় আংটিটা গেছে।'

'কিন্তু কেন নিলে আংটিটা?'

'কারণ ওটা সরিয়ে রাখলে আসল ডাকাতকে উস্‌কে দিয়ে তাকে ধরার আরও সুবিধে হবে বলে।'

'তা হলে সেই সন্ন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন?'

'অম্বিকাবাবু নয়; আরেকজন সন্ন্যাসী, যে নকল। যার হাতে অ্যাটাচি কেস ছিল। সে-ই এসেছিল চুরি করতে, কিন্তু গেট থেকেই বৈঠকখানায় আরেকজন গেরুয়াধারীকে দেখে চম্পট দেয়। তারপর টাঙ্গা করে স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে নেয়।'

'সেই নকল সন্ন্যাসী কে?'

'একটা সন্দেহ আছে মনে, কিন্তু এখনও প্রমাণ পাইনি।'

'এতদিন ধরে তুমি ওই আংটি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ?'

'না।'

'তবে?'

'একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'ভুলভুলাইয়ার একটা খুপরির ভিতর।'

'বাপ্‌রে বাপ্‌। কী সাংঘাতিক বুদ্ধি! এতদিনে বুঝতে পারলাম ফেলুদার দ্বিতীয়বার ভুলভুলাইয়া যাবার এবং গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাবার কারণটা। কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল, তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি তো ভুলভুলাইয়ার প্ল্যান জানতে না।'

'প্রথম দিনই সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বড় সেটা জানিস তো? প্রথম দিনে হাঁটবার সময় ভুলভুলাইয়ার প্রত্যেকটি গলির মুখে দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়ে ঘষে ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। সাত নম্বর গলির খুপরির মধ্যে ছিল আংটিটা। আমি জানতাম ওর চেয়ে

নিরাপদ জায়গা আর নেই। এদিকে হরিদ্বার যাব, অথচ আংটিটা লখ্‌নৌয়ে থেকে যাবে, এটা ভাল লাগছিল না, তাই সেদিন গিয়ে বার করে নিয়ে আসি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার ঢিপ্ ঢিপ্ করতে আরম্ভ করেছে। বললাম—

'কিন্তু সে ডাকাত যদি সন্দেহ করে যে তোমার কাছে আংটিটা আছে ?'

'সন্দেহ করলেই বা। প্রমাণ তো নেই। আমার বিশ্বাস সন্দেহ করেনি, কারণ অত বুদ্ধি ওদের নেই।'

'কিন্তু তা হলে তোমার পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন ?'

'তার কারণ, আংটির লোভ ওরা ছাড়তে পারছে না। আর ওরা জানে যে আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন ওদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে।'

'কিন্তু—' আমার গলা শুকিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরোচ্ছিল না; কোনও রকমে ঢোক গিলে তবে কথাটা শেষ করতে পারলাম—'তার মানে তো তোমার সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।'

'বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো ফেলু মিত্তিরের ক্যারেক্‌টার।'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু না। এবার ঘুমো।'

ফেলুদা একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে পাশ বদল করল।

ধরমশালা এখন একেবারে চুপ। দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। পাশের ঘরে নাক ডাকার শব্দ একটানা চলেছে। ঘুম কি আসবে ? ফেলুদার টেক্কামার্কা দেশলাই-এর বাক্সে রোদের আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এই আংটির ব্যাপারে কী অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এটাও ঠিক যে, ও যদি না থাকত, তা হলে হয়তো আংটি চুরিও হয়ে যেত, আর চোর ধরাও পড়ত না।

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্ কিট্ কিট...কিররর কিট কিট কিট...কিরর কিট কিট্

কিট্ কিট্...'

পাশের ঘর থেকে—কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে—র‍্যাট্‌ল স্নেকের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম বনবিহারীবাবু তাঁর প্রিয় সংগীত শুনছেন।

আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমটা এসে গিয়েছিল।

বাবার ট্র্যাভলিং ক্লক-এ পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'লছমনঝুলায় একেবারে ব্রিজের মুখেই দোকানে চমৎকার পুরি-তরকারি পাবেন। খাবার নেবার দরকার নেই।'

সকলেই বেশ ভাল করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম। কারণ পথে তো ঠাণ্ডা হবেই, আর লছমনঝুলার হাইট বেশি বলে সেখানে এমনিতেই এখানের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা।

পৌনে ছটার সময় দুটো ট্যাক্সি পর পর এসে ধরমশালার গেটের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুও এসেছেন। শুনলাম উনিও লছমনঝুলা যাবেন বলে আমাদের দলে ঢুকে পড়েছেন। কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি, এমন সময় বনবিহারীবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'তিনজন তিনজন করে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই। জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, তপেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে আসতে পারো।'

আমি বললাম, 'শুধু আমি কেন, ফেলুদাও নিশ্চয় শুনতে চাইবে।'

ফেলুদা কোনও আপত্তি করল না। তাই শেষ পর্যন্ত আমি, ফেলুদা আর বনবিহারীবাবু একটা গাড়িতে, আর বাবা, শ্রীবাস্তব আর বিলাসবাবু অন্য গাড়িটায় উঠলাম। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বনবিহারীবাবু তাঁর কাঠের বাক্সটা রাখলেন। বললেন, 'এইটেতে আমার অজগর আসবে।' পিছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা, আর দুপাশে আমি আর বনবিহারীবাবু বসলাম।

ঠিক সোয়া ছটার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা দিল।

শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট লাগল। সামনে পাহাড়। ডান দিকে চেয়ে থাকলে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বনবিহারীবাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন, কারণ গুনগুন করে গান ধরেছেন। বোধহয় অজগরের আশাতেই ওঁর মনের এই ভাব।

ফেলুদাই কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে। কী ভাবছে ও? আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে? সেটা জানার কোনও উপায় নেই। কারণ ও বনবিহারীবাবুর সামনে সিগারেট খাবে না।

বাবাদের ট্যাক্সিটা আমাদের সামনেই চলেছে। ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কী সব যেন বোঝাচ্ছেন। হয়তো শ্রীবাস্তব এই ফাঁকতালে তাঁর হাতটা দেখিয়ে নিচ্ছেন।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'শিশির-ভেজা রাস্তা থেকে এখনও ধুলো উঠছে না, কিন্তু রোদের তেজ বাড়লে উঠবে। আমার মনে হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এই ড্রাইভার—একটু আস্তে চালাও তো দিকি।'

দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথা মতো গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল, আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্সি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। ধুলো হোক আর যাই হোক, আমি মনে মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে, কিন্তু বনবিহারীবাবুর আদেশের উপর কিছু বলতে সাহস হল না। ভদ্রলোক জানোয়ারের গল্প আরম্ভ করবেন কখন?

একটা গাড়ি যেন পিছন থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বার বার হর্ন্ দিচ্ছে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ তো জ্বালাল দেখছি! পাশ দাও হে ড্রাইভার, পাশ দাও—নইলে প্যাঁক্ প্যাঁক করে কান ঝালাপালা করে দেবে।'

ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁদিকে নিল, আর অমনি একটা পুরনো ধরনের শেভ্রোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলাম যে সে-গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বার করে আমাদের দিকে দেখে নিল।

এ আমাদের চেনা লোক—সেই বেরিলি পর্যন্ত যাওয়া গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

॥ ১১ ॥

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমনঝুলা যাব, তারপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার পথে হৃষীকেশটা দেখে আসব। সত্যি বলতে কী, হৃষীকেশটা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। সেও তো তীর্থস্থান—পাণ্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির, এই সব—কেবল গঙ্গাটা একটু অন্যরকম।

বনবিহারীবাবু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন—

'যব ছোড় চলে লখ্নৌ নগরী
তব হাল আদ্ পর ক্যা গুজরী।'...

গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন, 'এই গানের সুরে জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি—কত কাল রবে বল ভারত হে।'

'ঠিক বলেছ।'

'তারপর আমার দিকে ফিরে বনবিহারীবাবু বললেন, Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I Saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম—এটা

জানো ?'

এটা আমি জানতাম না ; শুনে খুব মজা লাগল, আর মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার জন্যই বোধহয় আমার গান বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে, আর বন্দুক বলতেই জিম করবেট। শিকারি করবেটের কথা জানো তো ?'

ফেলুদা বলল, 'জানি।'

'তিনি কিন্তু এই সব অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ মেরে গেছেন। আমার করবেটকে কেন এত ভাল লাগে জানো ? কারণ উনিও আমার মতো জানোয়ারদের স্বভাব বুঝতেন, ওদের ভালবাসতেন।'

এই বলে আবার গুনগুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু।

গাড়ি ছুটে চলেছে লছমনঝুলার দিকে। বাঁদিকে পাহাড়, সামনে পাহাড়, ডানদিকে মাঝে মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। আকাশে মেঘ জমছে। সূর্যটা এক একবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, আর তক্ষুনি বাতাসটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রথম দিকে কেবল লছমনঝুলার কথাই ভাবছিলাম, এখন আবার মাঝে মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস এ দুদিনে জানতে পেরেছি, কিন্তু আরও অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি আছে। মহাবীর কেন সন্দেহ করে যে পিয়ারিলাল স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি ? পিয়ারিলাল কীসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাবার আগে ? পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন ? সে স্পাই কি আমাদের চেনার মধ্যে কেউ, না চেনার বাইরে ?

এই সব ভাবতে ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির সামনে আয়নাটার দিকে চলে গেল। আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে। সে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে।

এবার আমি আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে তার সামনেই বসা ড্রাইভারের দিকে।

আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকেই ঘুরে ড্রাইভারের দিকে গেল, আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে

উঠল।

ড্রাইভারের পাগড়ির নীচে আর কোটের কলারের ঠিক উপরে ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ।

এ রকম দাগ আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দেখেছি।

সে হল গণেশ গুহ।

আবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে দেখছে। তাকে এমন গম্ভীর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে যাচ্ছে। আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে চলেছে লছমনঝুলা! হঠাৎ মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছেন। তা হলে কি... ?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় চলেছি এখন? লছমনঝুলা, না অন্য কোথাও? বনবিহারীবাবুর উদ্দেশ্যটা কী? অথচ তাঁকে দেখে তো তাঁর মনে কোনও রকম উত্তেজনা বা দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম।

'আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরব এবার। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিছুদূর গেলেই একটা বাড়ি পাব, সেখানেই আমার অজগরটা থাকার কথা। যাবার সময় একবার দেখে যাই, ফেরার পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব। কী বলেন ফেলুবাবু?'

আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল, 'বেশ তো।'

আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না—

'আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমনঝুলায় আছে?'

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এটা যে লছমনঝুলা নয় সেটা তোমাকে কে বলল তপেশবাবু? হাওড়া বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায়?

লছমনঝুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই। গঙ্গার ব্রিজ এখান থেকে মাইল দেড়েক।'

শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা, প্রায় দেখা যায় না, এমন একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরল। লক্ষ করলাম ড্রাইভারটা এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না—যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'কেমন লাগছে ফেলুবাবু ?'

বনবিহারীবাবুর গলায় একটা নতুন সুর। কথাগুলোর পিছনে যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে।

'দারুণ !'

কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরে আস্তে একটা চাপ দিল। বুঝতে পারলাম ও বলতে চাইছে—ভয় পাস না, আমি আছি।

'রুমাল এনেছিস, তোপ্‌সে ?'

ফেলুদার এই প্রশ্নটার জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না, তাই কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

'রু-রুমাল ?'

'রুমাল জানিস না ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু...ভুলে গেছি।'

বনবিহারী বললেন, 'ধুলোর জন্য বলছ ? এখানে কিন্তু ধুলোটা কম হবে।'

'না, ধুলো না'—বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার পকেটে গুঁজে দিল। কেন যে সে এটা করল তা বুঝতেই পারলাম না।

বনবিহারীবাবু তাঁর টেপ রেকর্ডারটা নিজের কোলের উপর নিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলেন। শালবনের ভিতর হাইনা হেসে উঠল।

বন এখন আরও গভীর। সূর্যের আলো আর আসছে না এখানে। এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাবাদের গাড়ি এখন কোথায় ? লছমনঝুলা পৌঁছে গেছে কি ? আমাদের যদি কিছু হয়, ওঁরা টেরও পাবেন না। সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওঁদের

গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন ?

মনে যত জোর আছে, সাহস আছে, সব একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করলাম। কেন জানি বুঝতে পারছিলাম না ফেলুদার উপর যতই ভরসা থাকুক না কেন, আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে তাতে ওর যত বুদ্ধি, যত সাহস আছে, সবটুকু দরকার হবে।

গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন। বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না। এখন কেবল ঝিঁঝির ডাক আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর গাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। এরকম জায়গায় এত গভীর বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল ? হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনের কোথায় যেন ফরেস্ট অফিসার। তারও এরকম একটা বাড়ি আছে শুনেছি—আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে। এও হয়তো সেই ধরনের একটা বাড়ি।

আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা কাঠের তৈরি, আর সেটা বহু পুরনো। শুধু তাই না, বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর তৈরি। একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয়। বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না সেখানে কোনও লোক থাকে।

আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে থামল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাঁড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না। তবে এসেইছি যখন, তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাঠ সংগ্রহ করতে বোধ হয়। একা মানুষ তো, সব নিজেই করেন। আর ওঁর অত জানোয়ারের ভয় নেই। আমারই মতো। এসো ফেলুচন্দ্র তপেশচন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক। মেকি সন্ন্যাসী তো অনেক দেখলে। এবার একজন সত্যিকারের সাধুপুরুষ কী ভাবে থাকেন দেখবে চলো।'

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা না থাকলে আমার মনের অবস্থা যে কী হত জানি না। এখনও যে সাহস পাচ্ছি

তার একমাত্র কারণ হল ফেলুদার নির্বিকার ভাব। এক এক সময় তাই মনে হয় বিপদটা হয়তো আসলে আমার কল্পনা। আসলে ড্রাইভার সত্যিকারের শিখ ড্রাইভার, আর বনবিহারীবাবু খুব ভাল লোক, আর এই বাড়িটায় সত্যিকারের পাঁড়েজি বলে একজন সাধুপুরুষ থাকেন যাঁর কাছে একটা বারো ফুট লম্বা অজগর সাপ আছে, আর সেটা দেখার জন্যই বনবিহারীবাবু এখানে আসছেন।

আগাছা আর শুকনো শালপাতার উপর দিয়ে হেঁটে কাঠের

সিঁড়িটা দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার চেয়ে খুব বেশি বড় নয়। ঢোকার দরজা ছাড়াও আরেকটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়—কিন্তু মনে হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। দুটো দরজার উলটো দিকে দুটো ছোট্ট জানালাও রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা যাচ্ছে। মাচাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয়।

বনবিহারীবাবু কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকর্ডার মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন, 'পাঁড়েজির কেমন সরল জীবনযাত্রা, দেখেই বুঝতে পারছ।'

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি, আর একটা টিনের চেয়ার। ফেলুদা বেঞ্চিটার উপর বসল দেখে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম।

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, দেশলাইটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, টিনের চেয়ারটা মজবুত কি না হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে, মুখ দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে সেটার উপর বসলেন। তারপর পাইপটাতে একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে, চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—

'তারপর, ফেলুবাবু—আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই!'

॥ ১২ ॥

'আপনার আংটি?'

বনবিহারীবাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা বুঝতে পারলাম।

বনবিহারীবাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অল্প হাসি নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। বাইরে ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে। ফেলুদা বলল—

'আর সে আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কী করে

জানলেন ?'

বনবিহারীবাবু এবার কথা বললেন।

'অনুমান অনেক দিন থেকেই করছিলাম। বাইরের একটা লোক এসে ধীরুবাবুর শোবার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বার করে নিয়ে যাবে, এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও, এতদিন প্রমাণ পাইনি। এখন পেয়েছি।'

'কী প্রমাণ ?'

বনবিহারীবাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপ রেকর্ডারটা কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন। যা শুনলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। চাকা ঘুরছে, আর যন্ত্রটা থেকে আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে—

'ওটা আংটিই ছিল—তাই না ?'

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস্, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে—সেই প্রথম দিন থেকেই—'

বনবিহারীবাবু খট করে রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, 'কাল রাত্রে তোমরা শোবার আগেই মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়ার তলায় রেখে এসেছিলাম। অবিশ্যি তোমরা যে ঠিক এই বিষয়েই কথাবার্তা বলবে সেটা আমার জানা ছিল না, কিন্তু যখন বলেইছ, তখন কি আর এ সুযোগ ছাড়া যায় ? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কি দরকার আছে তোমার—অ্যাঁ, ফেলুবাবু ?'

'কিন্তু আংটিটা আপনার, সে কথা আপনি বলছেন কী করে ?'

বনবিহারীবাবু রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, '১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো বছর আগে, কলকাতার নৌলাখা কোম্পানি থেকে দুলাখ টাকা দিয়ে আমি ও আংটিটা কিনি। পিয়ারিলালের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার কিছু পরেই। তাঁর যে এ সব জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আংটিটা

আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। দেখে তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা যা হয়েছিল, তাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। তার দুদিন পরেই আংটিটা আমার বাড়ি থেকে লোপ পেয়ে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তারপর লখ্নৌ এসে কবছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন। পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি প্রথম অ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন। তাই মানে মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম, তিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন, তা হলে শ্রীবাস্তবকে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন। শ্রীবাস্তবকে তার দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো? পিয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন! বললেন, আমার কাছে ওরকম আংটি উনি কোনওদিন দেখেননি। অথচ সে আংটির রসিদ পর্যন্ত এখনও আমার কাছে।'

এবার ফেলুদা কথা বলল, আর তার গলার স্বরে ভয়ের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

'কিন্তু বনবিহারীবাবু, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আগে বলো সে-আংটি এখনও তোমার কাছেই রয়েছে, না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছ। নিজের জিনিস আমি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই।'

এবার ফেলুদার গলায় বিদ্রূপের ইঙ্গিত—

'কিন্তু এত দিন তো অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার ব্যাপারে, এবং আমার পিছনে লাগার ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কোনও অভাব দেখিনি। আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি—যিনি আজ দাড়ি-পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন, তিনিই তো বোধ হয় সেই নকল সন্ন্যাসী, তাই না? শ্রীবাস্তবের বাড়ির ডাকাতও তো বোধ হয় তিনিই, আর প্রথম দিন শ্রীবাস্তবকে ধাওয়া

করার ভারও তো তার উপরেই ছিল। অবিশ্যি পরে শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে আমার পিছনে লাগানো হয় তাকে। রেসিডেন্সিতে গুলতি মারা, ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা, হুমকি-কাগজ ছুঁড়ে মারা—এ সবই তো তার কাজ, তাই না ?'

বনবিহারীবাবু একটু হেসে বললেন, 'সব কাজ তো আর নিজে করা যায় না ফেলুরাম ! এমন কিছু কিছু কাজ সব সময়েই থাকে যার ভার অন্যের উপর দিতে হয়। আর বুঝতেই তো পারো—গণেশের স্বাস্থ্যটা তো ভাল, কারণ সে এককালে সার্কাসে বাঘ সিংহ হ্যান্ডল করেছে—সুতরাং ডানপিটেমোর কাজগুলো সে ভালই করে। আর এটা আমি অবশ্যই বলব যে, আমার হুকুমে এ সব কাজগুলো করে সে যে-অপরাধ করেছে, তোমার অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তুমি যে-আংটি তোমার কাছে ধরে রেখেছ, তাতে তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার জিনিস, আমার প্রপার্টি। এবং সেটা আমার ফেরত চাই—আজই, এখনই।'

শেষ কথাগুলো বনবিহারীবাবু বললেন প্রায় চিৎকার করে। মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাত-পা কীরকম যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

ফেলুদার উত্তরটা এল ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে—

'খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে পর ও-আংটি কি আপনার কোনও কাজে আসবে ?'

বনবিহারীবাবু প্রায় কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা ! যাকে তাকে ফস্ করে খুনি বলে দিচ্ছ।'

'যাকে তাকে বলতে যাব কেন। আমার বিশ্বাস খুনিকেই খুনি বলছি। আপনি পিয়ারিলালের স্পাই-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি ? পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ভেরি

সিম্পল্। খুলে বলার কিছু নেই। আমি আংটিটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার জন্য ওঁর পেছনে কিছু লোক লাগিয়েছিলাম। পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

'আমি যদি বলি পিয়ারিলালের স্পাই-এর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও সম্পর্ক নেই?'

'তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় অ্যাটাকের দিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি গেলেই তাঁর অ্যাটাক হবে? তাঁর বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি।'

'তখন তো খালি হাতে গেছেন।'

'খালি হাতে মানে?'

'কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি। আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী—আপনার বিশাল, বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা—ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, তাই না? পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই'।'

বনবিহারীবাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু...তাঁকে আমি মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কী?'

ফেলুদা বলল, 'পিয়ারিলালের আরশুলা দেখে হৃৎকম্প হয় সেটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না। আপনি হয়তো মাকড়সাটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গেল একেবারে হার্ট অ্যাটাক, এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু। এ মৃত্যুর জন্য আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন? আর আপনি বলছেন আংটি আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন। আমি যদি বলি, আংটি পিয়ারিলাল কিনে কলকাতায় আঠারো বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন। আর সেই থেকে আপনার ও আংটির উপর লোভ—আর আপনার বাড়ির ওই তালা-দেওয়া বন্ধ

ঘরে এরকম আরও অনেক পুরনো জিনিস আপনার আছে, আর ওই সব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই আপনার ওই চিড়িয়াখানা ?'

বনবিহারীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আর কী বিশ্বাস করো সেটা শুনতে পারি কি ?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'নিশ্চয় পারেন। আমার বিশ্বাস পিয়ারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনওদিন চোখেও দেখতে পাবেন না, আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি।'

'গণেশ !'

বনবিহারীবাবুর গুরুগম্ভীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গম্‌গম্ করে উঠল।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'মুখে রুমাল চাপা দে !'

কেন এ কথা বলল জানি না—কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ফেলুদার দেওয়া রুমালটা বার করে মুখের উপর চাপা দিলাম।

গণেশ গুহ ঘরের ভিতর এসে ঢুকল—হাতে সেই কাঠের বাক্স।

বনবিহারীবাবু দেখি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করল, আর তার সঙ্গে সেই মাজনের কৌটোটা—যাতে লেখা 'দশংসংস্কারচূর্ণ'।

গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে ফেলুদা কৌটোটার ঢাকনা খুলে তার ভিতর থেকে এক খাবলা কী জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর বনবিহারীবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল।

আমার রুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এল তাতে বুঝলাম সেটা গোলমরিচ।

সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দুজনের চোখে নাকে ঢুকে ওদের যে কী অবস্থা হল তা বলে বোঝাতে পারব না। প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের মুখ একেবারে বেঁকে গেল, তারপরে একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হল

হাঁচি আর আর্তনাদ। বনবিহারীবাবু টলতে টলতে দরজার বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লেন। গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা। তবু সে যাবার সময় কোনওরকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে গেল।

এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভিতর থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সেই হাড়কাঁপানো শব্দ—

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌—কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি করছে, বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিল, আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

খুব বেশি ভয় পেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। যার থেকে ভয়, তার দিকেই যেন চোখটা চলে যায়। কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা হিপ্‌নোটাইজ করার ক্ষমতা আছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখলাম র‍্যাট্‌ল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে ঝুমঝুমির শব্দ করতে করতে এদিক ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরাল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কাঠের মেঝের উপর দিয়ে দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদেরই বেঞ্চির দিকে প্রায় যেন আমাকে লক্ষ্য করেই এগোতে লাগল।

বুঝলাম আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে তিন হাত দূরে, তখন হঠাৎ মনে হল যেন একটা বাজ পড়ল, আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর। একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা কানফাটা আওয়াজ, আর তার পরেই বারুদের গন্ধ।

আর সাপ?

সাপের মাথা দেখলাম ধড় থেকে আলগা হয়ে পড়ে আছে। ঝুমঝুমিটা দু-একবার নড়ে থেমে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যেই একটা শতরঞ্চির উপর শুয়ে আছি। কপাল আর মাথাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে—বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে। শ্রীবাস্তবের মুখটা প্রথম চোখে পড়ল—আর তার পরেই বাবা।

'কেমন আছেন তপেশবাবু—'

গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি—মহাবীর। কিন্তু গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন?

মহাবীর বলল, 'ট্রেনে বেরিলি পর্যন্ত একসঙ্গে এলাম, আর চিনতে পারলে না?'

দারুণ মেক-আপ করে তো লোকটা। দাড়িওয়ালা অবস্থায় সত্যিই চিনতে পারিনি। আর তা ছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা

বলার ঢংও বদলে ফেলেছিল।

মহাবীর বলল, 'আমার রিভলবারের টিপ দেখলে তো ? আসলে যেদিন ভুলভুলাইয়ায় দেখা হল, আর উনি বললেন আমাকে চেনেন না—সেদিন থেকেই বনবিহারীবাবুর উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন, আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। একদিন বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল—ওই আংটিটা নিয়েই। সেটাও আমার কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে।'

বাবা বললেন, 'তোদের দেরি দেখে লছমনঝুলা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের দাগ দেখে বনের রাস্তাটা ধরে ভিতরে ঢুকেছি। মহাবীরবাবুই অবিশ্যি গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম বলেন।'

'আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন ?'

'গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে। ফেলুর ব্রহ্মাস্ত্রের তুলনা নেই। ওরা এখন পুলিশের জিম্মায় আছে।'

'পুলিশ কোত্থেকে এল ?'

'সঙ্গেই তো ছিল ! বিলাসবাবু তো আসলে ইন্‌স্পেক্টর গরগরি।'

কী আশ্চর্য ! ওই হাত-দেখিয়ে ভদ্রলোকই ইন্‌স্পেক্টর গরগরি ! এমন অদ্ভুত ভাবে যে আংটির ঘটনাটা শেষ হবে তা ভাবতেই পারিনি।

কিন্তু ফেলুদা ? ফেলুদা কোথায় ?

ওর কথা মনে পড়তেই আমার চোখে একটা ঝিলিক-মারা আলো এসে পড়ল। যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা আঙুলে আংটিটা পরে কিছুদূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের উপর ফেলে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমার চোখে ফেলছে।

আমি মনে বললাম—এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই।

পাহাড়ে ফেলুদা

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

১

কিছুক্ষণ আগে অবধি জানালা দিয়ে বাইরে নীচের দিকে তাকালেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিল্কের সুতোর মতো এঁকে-বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাঝে খুদে-খুদে গ্রামের খুদে-খুদে ঘর-বাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে যেন মেঘ এসে পড়াতে সে-সব আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনের যাত্রীদের দিকে দেখছি।

আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা, তার হাতে একটা মহাকাশ-ভ্রমণ সম্বন্ধে বই। ফেলুদা অনেক বই পড়ে, তবে আজ পর্যন্ত কখনও ওকে একই বিষয় নিয়ে পর পর দুটো বই পড়তে দেখিনি। কালই রাত্রে কলকাতায় দেখেছি, ও তাকলামাকান মরুভূমির উপর একটা বই পড়ছে। তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল—সকালে একটা, রাত্রে একটা। একটা গল্পের বই, অন্যটা পৃথিবীর নানান্ দেশের রান্না সম্পর্কে। ও বলে, একজন গোয়েন্দার পক্ষে জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি ; কখন যে কোন্ জ্ঞানটা কাজে লেগে যায়, তা বলা যায় না।

আমাদের লাইনে প্যাসেজের উল্টো দিকে পাশাপাশি দুটো সিটে দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি দূরে বসে, তাঁর শুধু ডান হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। হাতের আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর উপর তাল ঠুকছেন। বোধ হয় আপন মনে গান গাইছেন। যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি বেশ আঁটোসাঁটো চক্চকে ভদ্রলোক। হাতের কবজিটা দেখে বেশ জোয়ান মনে হলেও, জুলপির কাছে পাকা চুল থাকাতে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। একটা স্টেটস্ম্যান

খুলে ভারি মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন তিনি। ফেলুদা হলে শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারত। আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না।

'ও রকম হাঁ করে কী দেখছিস ?'

চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ-প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল। কথাটা বলে ও একবার আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও।'

এটা বলতে মনে পড়ল, সত্যিই ভদ্রলোক এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'বার চেয়ে চা খেয়েছেন, আর তার সঙ্গে গোটা তিনেক করে বিস্কুটও। বললাম, 'আর কী বুঝলে ?'

'ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে।'

'কী করে জানলে ?'

'একটু আগেই প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধড়াস্ করে বাম্প করেছিল—মনে আছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরে বাবা—আমার তো পেটের ভিতরটা কি রকম করে উঠেছিল।'

শুধু তুই কেন, আশেপাশের সকলেই নড়ে চড়ে উঠেছিল, একমাত্র উনিই দেখলাম কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।'

'আর কী বুঝলে ?'

'লোকটার মাথার সামনের দিকে চুল বেশ পরিপাটি রয়েছে, কিন্তু পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগের ঝুঁটি হয়ে গেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'অথচ প্লেনে লোকটা সিটে মাথা ঠেকিয়ে শোয়নি একবারও, একটানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে, আর না হয় চা-বিস্কুট খেয়েছে। তার মানে দমদমে ওয়েটিং রুমে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি—তার মানে ও প্লেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই দমদম পৌঁছেছিল, আর তাই—'

'ভেরি গুড। হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে

মাথা চিতিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে। তাই পিছনের চুলের ওই দশা।'

ফেলুদার এই ক্ষমতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। আরও আশ্চর্য এই যে, এগুলো বুঝে ফেলার জন্য ওকে আমার মতো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের দিকে। দু'-এক বার আড়চোখে দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়।

'লোকটা কোন দেশি বল তো।' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এটার জবাব দেওয়া ভারি কঠিন। বললাম, 'লোকটা পরে আছে সুট, হাতে আবার ইংরেজি কাগজ—কী করে বুঝব? বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, পঞ্জাবি—এনিথিং হতে পারে।'

ফেলুদা ছিক্ করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, 'কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না। লোকটার ডান হাতে কী রয়েছে?'

'খবরের—না না, একটা আংটি!'

'আংটিতে কী আছে?'

চোখ কুঁচকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম সোনার আংটির মাঝখানে লেখা রয়েছে 'মা'।

অন্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লাউডস্পিকারে বলে উঠল বাগডোগরা পৌঁছাতে আর বেশি সময় নেই—'প্লিজ ফাস্‌ন ইয়োর সিট বেল্টস অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য নো-স্মোকিং সাইন।'

বাগডোগরা বলতে অনেকেই মনে করবে, আমরা হয়তো দার্জিলিং কিম্বা কালিম্পং যাচ্ছি। আসলে তা নয়। আমরা যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'বার দার্জিলিং গেছি; এবারও প্রথমে দার্জিলিং-এর কথাই হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল। বাবার হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না। বললেন, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস, ফেলুরও ছুটি পাওনা হয়েছে—দিন পনেরোর জন্য ঘুরে আয়। কলকাতায় বসে ভ্যাপসা গরমে পচার কোনও মানে হয় না।'

ফেলুদা গ্যাংটক বলল– তার কারণ বোধ হয় এই যে, ইদানীং ও তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করেছে। (সেই ফাঁকে আমিও একটা স্বেন হেদিনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি)। সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে ; সিকিমের রাজা তিব্বতি, সিকিমের গুম্ফাগুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায়, সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রেফিউজিরা এসে রয়েছে। তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ-পরা নাচ—এ সবই নাকি সিকিমে রয়েছে। আমিও তাই আর গ্যাংটক নিয়ে আপত্তি করিনি। সত্যি বলতে কি, আমার এই খুড়তুতো দাদাটির সঙ্গে যদি উলুবেড়েতেও ছুটি কাটাতে হয়, তাতেও আমি রাজি। অবিশ্যি তার সঙ্গে যদি সে জায়গায় কোনও রহস্যের সন্ধান মেলে, তা হলে তো পোয়াবারো। গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদার জুড়ি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামল ঠিক সাড়ে সাতটায়। কলকাতা থেকেই বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে আমাদের জন্য এখানে একটা জিপ মজুত থাকে। আমরা সটান জিপে না উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টোরান্টে গিয়ে বেশ ভাল করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম ; কারণ এখান থেকে গ্যাংটক যেতে লাগবে প্রায় ছ'-সাত ঘণ্টা। রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে ভরসা এই যে আজ সবে চোদ্দই এপ্রিল ; মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।

অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা ধরেছি, এমন সময় দেখি প্লেনের সেই ভদ্রলোকটি একটা কোনার টেবিল থেকে উঠে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আমাদেরই দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

'আপনারা কি ড্যাং, না ক্যাং, না গ্যাং ?'

আমি তো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই গেলাম। এ আবার কী হেঁয়ালিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক ? কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে উত্তর দিল 'গ্যাং।'

গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'জিপের ব্যবস্থা আছে ? মানে, সোজা কথা—আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি ?'

ফেলুদা বলল, 'স্বচ্ছন্দে', আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং হচ্ছে দার্জিলিং, ক্যাং কালিম্পং আর গ্যাং গ্যাংটক।

ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস'।

'কী ব্যাপার?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। 'হলিডে?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও?'

'আজ্ঞে না।'

'কোথায় উঠছেন?'

ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে ভদ্রলোককে একটি চারমিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে বলল, 'একটা হোটেলে ঘর বুক করা আছে। নাম বোধ হয় স্নো-ভিউ।'

শশধরবাবু বললেন, 'গ্যাংটকের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন—সারা সিকিম চষে বেড়িয়েছি। লাচেন, লাচুং, নামচে, নাথুলা—কিছুই বাদ নেই। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য, তেমনই শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়, অর্কিড চান অর্কিড—রোদ চান, মেঘ চান, বৃষ্টি চান, মিস্ট চান—সব পাবেন। তিস্তা, রঙ্গিত—নদীগুলোর কোনও তুলনা নেই। তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে—রোড্স্—বুঝেছেন। আসলে এ দিকের পাহাড়গুলো, যাকে বলে গ্রোইং মাউনটেনস। এখনও বাড়ছে। তাই একটু অস্থির, বুঝেছেন—আর কাঁচা। ইয়াং বয়সে যা হয় আর কি—হে হে!'

'তার ফলেই বুঝি ল্যান্ডস্লাইড হয়?'

'ইয়েস, আর সে বড় বেয়াড়া ব্যাপার। যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনে রাস্তা বন্ধ—ধ্বস গেছে। তার মানে ব্লাস্টিং, পাথর ভাঙো, দেয়াল তোলো, মাটি ফেলো—সে অনেক ঝক্কি। তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে, চটপট সরিয়ে নেয়। তবে এখনও বৃষ্টিটা তেমন নামেনি, তাই খুব একটা গোলমাল হবে বলে মনে হয় না। যাক্—আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল। একা একা এতখানি পথ যেতে হবে ভাবতে বিশ্রী লাগছিল। কোম্পানি পেলে গপ্পোটপ্পো করে সময়টা কেটে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন ?'

'আরে না মশাই !' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আমি যাচ্ছি কাজে। তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ। অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস জানেন ?'

'আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা ?'

'ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্ম। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা। সিকিমে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় গাছ আছে সেটা জানি। সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া। আমার পার্টনার আগেই গেছে—দিন সাতেক হল। গাছপালা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান—বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমারও ওর সঙ্গে যাবার কথা ছিল—শেষটায় এক ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।'

বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মালপত্র তুলে নিয়ে জিপের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের কোম্পানিটা কোথায় ?'

শশধরবাবু বললেন, 'বম্বে। কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে চলল। আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এস. এস. কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার—ওর নামেই নাম।'

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড। সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে রাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ করে। তার পর মাঝে মাঝে নীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মতো সামনে চড়াই ওঠে না। রঙপো-তে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু।

তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয়। তিস্তা বাজারে আমাদের জিপ থামানো হল। রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল, তাই শশধরবাবু বললেন, 'কোকা-কোলা খাবেন ?' এ জায়গাটা নাকি দু' বছর আগে তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল। দোকানপাট ঘরবাড়ি যা

দেখছি, সবই নাকি নতুন তৈরি হয়েছে। দেখেও তাই মনে হয়। ব্রিজটাও নতুন; আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শশধরবাবু দেখলাম পর পর দু' বোতল কোকা-কোলা সাবাড় করে দিলেন। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমাদেরও খাওয়ালেন। মনে মনে ভাবলাম—গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না। পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন, নিশ্চয়ই এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে।

'কোক' খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি, তখন লক্ষ করলাম কিছু দূরেই একটা জিপের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক (তার মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে) হাত-টাত নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে। জিপটা উল্টো দিক থেকে এসেছে—বোধ হয় শিলিগুড়িই যাবে। 'অ্যাক্সিডেন্ট' কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমরা তিনজনেই জিপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে যা শুনলাম, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ও দিকে বৃষ্টি না হলেও, গ্যাংটকে নাকি দিন-সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে একটা জিপের উপর পড়ে একজন লোক নাকি মারা গেছে। জিপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে মরেছে, তার নাম-ধাম এরা কেউ বলতে পারল না, কারণ এরা কেউ গ্যাংটক থেকে আসছে না।

ফেলুদা খবরটা শুনে বলল, 'একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাতই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাত্র খসা পাথর এসে পড়া—এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।'

শশধরবাবু বললেন, 'ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।' তার পর জিপে উঠতে উঠতে বললেন, 'যাবার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন, আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।'

তিস্তা ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকের দৃশ্য এমন অদ্ভুত

সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল যে, অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা মন থেকে মুছে গেল। রংপো পেরিয়ে কিছু দূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল, তার উপরে তিন হাজার ফুট হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরম্ভ হল, তখন রীতিমতো ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি, তখন এক জায়গায় জিপ থামিয়ে সুটকেস খুলে কোট আর মাফলারটা বার করে পরে নিলাম। শশধরবাবুও দেখলাম এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা তাঁর ঠাণ্ডা কোটের তলায় চাপিয়ে নিলেন।

ক্রমে কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা আবছা চোখে পড়ল, পাহাড়ের গায়ে নীল রঙের চিনা প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘরবাড়ি। শশধরবাবু বললেন, 'পাঁচ ঘণ্টাও লাগল না। উই আর ভেরি লাকি।'

ক্রমে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, ফুলের টব সাজানো কাঠের বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকান-বাড়ির সারি পেরিয়ে, লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা-নেওয়া মেয়ে, আর বাহারের টুপি আর রঙবেরঙের জামা পরা সিকিমি নেপালি ভুটিয়া তিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জিপ গিয়ে পৌঁছাল স্নো-ভিউ হোটেলের সামনে। শশধরবাবু ডাকবাংলোয় যাবেন বলে আমাদের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলেন। যাবার সময় বললেন, 'এ সব জায়গায়, জানেন তো, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।'

ফেলুদা বলল, 'আপাতত আপনি ছাড়া আর কাউকেই চিনি না এখানে। বিকেলে একবার ডাকবাংলোর দিকটায় ঢুঁ মেরে আসব।'

'বহুৎ আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে জিপের সঙ্গে ভদ্রলোকও কুয়াশায় মিলিয়ে গেলেন।

আমাদের হোটেলের নাম যদিও স্নো-ভিউ, আর যদিও সত্যি করেই নাকি পিছনের ঘরগুলোর জানালা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, এসে অবধি এখনও পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বলে আমাদের স্নো-ভিউ করা হয়নি। হোটেলের মালিক একজন পঞ্জাবি ভদ্রলোক নাম মিস্টার বির্‌রা। আর যে-সব লোক হোটেলে রয়েছে, তার মধ্যে মনে হল মাত্র এক জনই বাঙালি। এখনও আলাপ হয়নি। বাঙালি বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিট্‌কে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট শুনলামই তিনি বলে উঠলেন, 'ধুত্তেরি।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু' মিনিটের মধ্যে ফেলুদা একটা পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে মিঠে পান কিনল। বলল, 'এ জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি।' ও দুপুরে আর রাত্রে রোজ খাবার পরে একটা করে মিঠে পান খায়—তবে খয়ের ছাড়া, কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটা ও একেবারেই পছন্দ করে না।

গ্যাংটকের এ রাস্তাটা দেখলাম রীতিমতো চওড়া। রাস্তার মাঝখানে জিপ লরি স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি নানা রকম গাড়ি লাইন বেঁধে পার্ক করা রয়েছে, আর রাস্তার দু' দিকেই দোকান। দোকানের নাম দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে। পঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, গুজরাটি, সিন্ধি—সব রকম লোক সিকিমে এসে দোকান করেছে। বাঙালি প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে। কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অবধি দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, দার্জিলিং-এর সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাৎ রয়েছে। সবচেয়ে বড় তফাৎ এই যে, এখানে লোকজনের ভিড়টা কম, তাই গোলমালটা কম, আর তাই নোংরোটাও কম।

খাওয়া-দাওয়া হল, মিঠে পানও হল, সবে ভাবছি এবার জায়গাটা

একটু ঘুরে দেখলে হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখি, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শশধরবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন ব্যস্তভাবে এই হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক আরও জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী ব্যাপার?'

'সকালে তিস্তায় যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনলেন, সেটা কার জানেন?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খোঁচা দিয়ে উঠেছিল, ভদ্রলোকের কথায় সেটা সত্যি হয়ে গেল।

'এস্ এস্। আমার পার্টনার।'

'বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?'

'মা গঙ্গাই জানেন। টেরিবল্ ব্যাপার!'

'তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন?'

'ঘণ্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল! মারা যাবার আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল। আমার নাম করে। 'বোস' 'বোস' করে দু-এক বার বলে। তার পরই শেষ।'

'খবরটা পাওয়া যায় কী করে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমারা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। একতলার ডাইনিং রুম এখন খালি। তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম। শশধরবাবু একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক-পকেট থেকে বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'সেও এক ব্যাপার। ড্রাইভারটা মরেনি। পাথরটা গাড়িটায় এসে লেগেছে, আর ড্রাইভারও স্টিয়ারিং-এর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে। এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় ছিল না, কিন্তু স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কাত হয়ে খাদে পড়েছে। ড্রাইভার ছিল খাদের উল্টো দিকে—যেই না গাড়ি কাত হয়েছে, ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায়। মাইনর ইনজুরি—বাঁ চোখের পাশটায় সামান্য একটু ছড়েছে—দ্যাট্‌স

অল। জিপ এদিকে শেলভাঙ্কার সমেত একেবারে পাঁচশো ফুট নীচে। নর্থ সিকিম হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট। ড্রাইভারটা সেখান থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে খবরটা দেবে বলে। পথে কিছু নেপালী মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এস্ এস্-এর বডি উদ্ধার করে। তারাই বয়ে আনছিল, এমন সময় একটা আর্মি জিপ এসে পড়ে। তার পর হাসপাতাল। তার পর...ওয়েল...'

যে লোকটাকে দু' ঘণ্টা আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল, তাকে এ রকম ভেঙে পড়তে দেখে অদ্ভুত লাগছিল।

'ডেডবডি কী হল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বম্বেতে ওর ভাইকে কনট্যাক্ট করেছিল—ব্যারিস্টার ভাই। এস্ এস-এর স্ত্রী নেই। দু'বার বিয়ে করেছিল, দুই স্ত্রী মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল—সে বছর-চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে অনেক ব্যাপার। এস্ এস্ ছেলেকে ভীষণ ভালবাসত, তার অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তার আর কোনও পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তাই ভাইকেই ইনফর্ম করেছিল। ভাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি, তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এখানে বলে রাখি—পোস্টমর্টেম কথাটার মানে আমি ফেলুদার কাছেই জেনেছিলাম। কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে মারা যায়, তাহলে পুলিশের তদন্ত হয়, আর তখন পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়—কখন মরেছে, কোথায় চোট পেয়ে মরেছে, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা—এই সব আর কি। একেই বলে পোস্টমর্টেম।

ফেলুদা বলল, 'কবে ঘটেছে ব্যাপারটা ?'

শশধরবাবু বললেন, 'ইলেভন্‌থ সকালে। সাত তারিখে এখানে এসে পৌঁছেছিল।' তার পর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি তো এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না!...কার কপালে যে কখন কী ঘটে। তবে আমি থাকলে বোধ হয় এ দুর্ঘটনা

ঘটত না।'

'আপনার প্ল্যান কী?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কী আবার? আর তো এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি এখন যাচ্ছি—কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে। চেনাশোনা আছে, হয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

শশধরবাবু উঠে পড়লেন।

'চলি। যাবার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। আপনারা আর এ নিয়ে ভাববেন না। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ করে ভুরু কুঁচকিয়ে বসে থেকে সকালে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে শশধরবাবু যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই ফিস্ ফিস্ করে দু'বার বলল—'ওয়ান চান্স ইন মিলিয়ন।' তার পর বলল, 'অবিশ্যি মাথায় বাজ পড়েও তো লোক মরে। সেটাও কম আশ্চর্য নয়।'

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, আমাদের কাছেই আর একটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালি ভদ্রলোকটি হাতে 'আনন্দবাজার' খুলে বসে আছেন। শশধরবাবু চলে যেতেই তিনি কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফেলুদাকে নমস্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'সিকিমের রাস্তাঘাটে কখন যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে পাথর পড়ে মানুষ মরাটা কিছুই আশ্চর্য না। আপনারা তো আজই এলেন?'

ফেলুদা একটা গম্ভীর হুঁ-এর মতো শব্দ করল। ভদ্রলোক একটা স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাচওয়ালা চশমা পেরেছিলেন। বয়স বোধ হয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোনা গোঁফ আছে, যেটাকে বোধ হয় 'বাটারফ্লাই' বলা হয়। আজকাল এ রকম গোঁফ খুব বেশি দেখা যায় না।

'বেশ অমায়িক লোক ছিলেন মিস্টার শেলভাঙ্কার।'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'যেটুকু হয়েছিল, তাতেই বুঝেছি। সমঝদার লোক—যাকে বলে রসিক আর কি। আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। আমার কাছে একটা

তিব্বতি মূর্তি ছিল, সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দু' দিন আগে।'

'উনি ও সব জিনিস কালেক্ট করতেন?'

'কালেক্ট-ফালেক্ট জানি না—আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে আলাপ, দেখি এটা-সেটা ঘেঁটেঘুঁটে দেখছেন। বললুম, আমার কাছে একটা পুরনো তিব্বতি মূর্তি আছে, তুমি দেখবে? তা বললে, ডাকবাংলোয় নিয়ে এসো। গেলুম নিয়ে, দেখালুম। ভদ্রলোক অন দ্য স্পট কিনে নিলেন। অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন। ন'টা মাথা, চৌত্রিশটা হাত।'

'আই সি।'

ফেলুদা গম্ভীর ভাব দেখালেও, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল, বিশেষ করে ওর হাসিটা, যেটা ওর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুটাও যেন ওর কাছে একটা হাসির ব্যাপার।

'আমার নাম নিশিকান্ত সরকার।'

ফেলুদা নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্ট নমস্কার করল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি থাকি দার্জিলিঙে। তিন পুরুষ ধরে আছি আমরা। তবে গায়ের রঙটা দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল, তাই না?'

ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রতা অ্যাভয়েড করল।

'ও দিকটা, আর কালিম্পং টা থুরোলি ঘুরে দেখা আছে। সিকিমটা আসা হয়নি। অবিশ্যি সেটা আমার নেগ্—মানে নেগ্লিজেন্স। এসে বুঝছি কী মিস করছিলুম! কাছে-পিঠে সব অদ্ভুত জায়গা আছে, জানেন তো? নাকি আপনার সব দেখা?

ফেলুদা বলল যে সেও নতুন, আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে পদার্পণ।

'বাঃ!' ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল। 'ক' দিন আছেন তো? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে।'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'পেমিয়াংচিটা শুনিচি দারুণ জায়গা।'

'যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে?'

'শুধু রাজধানী কেন? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্ফা আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে—আর কত চাই?'

'সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাব।' বলে ফেলুদা উঠে পড়ল।

'উঠছেন?'

ফেলুদা বলল, 'যাই, একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানে কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করে যেতে হয় নাকি?

'তা, হোটেলের ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ভাল। তবে চুরি-চামারি এখানে নেই বললেই চলে। সারা সিকিমে মাত্র একটি জেলখানা, আর সেটা গ্যাংটকেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন—চারটির বেশি কয়েদি নেই সেখানে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা কাটেনি। ফেলুদা ওদিক-ওদিক দেখে বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেল—দু' জনেরই এক জোড়া করে হান্টিং বুট কিনে আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি, এখানে বাদলা হবে। তার মানেই রাস্তাঘাট পেছল। আর জুতোয় গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'এখানে পাওয়া যাবে না?'

'তা যেতে পারে। বাটার দোকান তো সর্বত্রই আছে। সন্ধে নাগাত ফিরে এসে কিনে নেব। আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক।'

বাজার থেকে শহরের দিকে যেতে হলে চড়াই উঠতে হয়। কিছু দূর গিয়েই বুঝলাম, এ দিকটায় লোকের ভিড় আর বাড়ির ভিড় আরও অনেকটা কম। অল্প যে সব লোক চলাচল করছে, তার মধ্যে কিছু স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ছেলে মেয়েও দেখলাম। দার্জিলিং-এর মতো ঘোড়া দেখলাম না এখানে, তবে জিপ চলে ওখানের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা বোধ হয় মিলিটারিরা থাকার

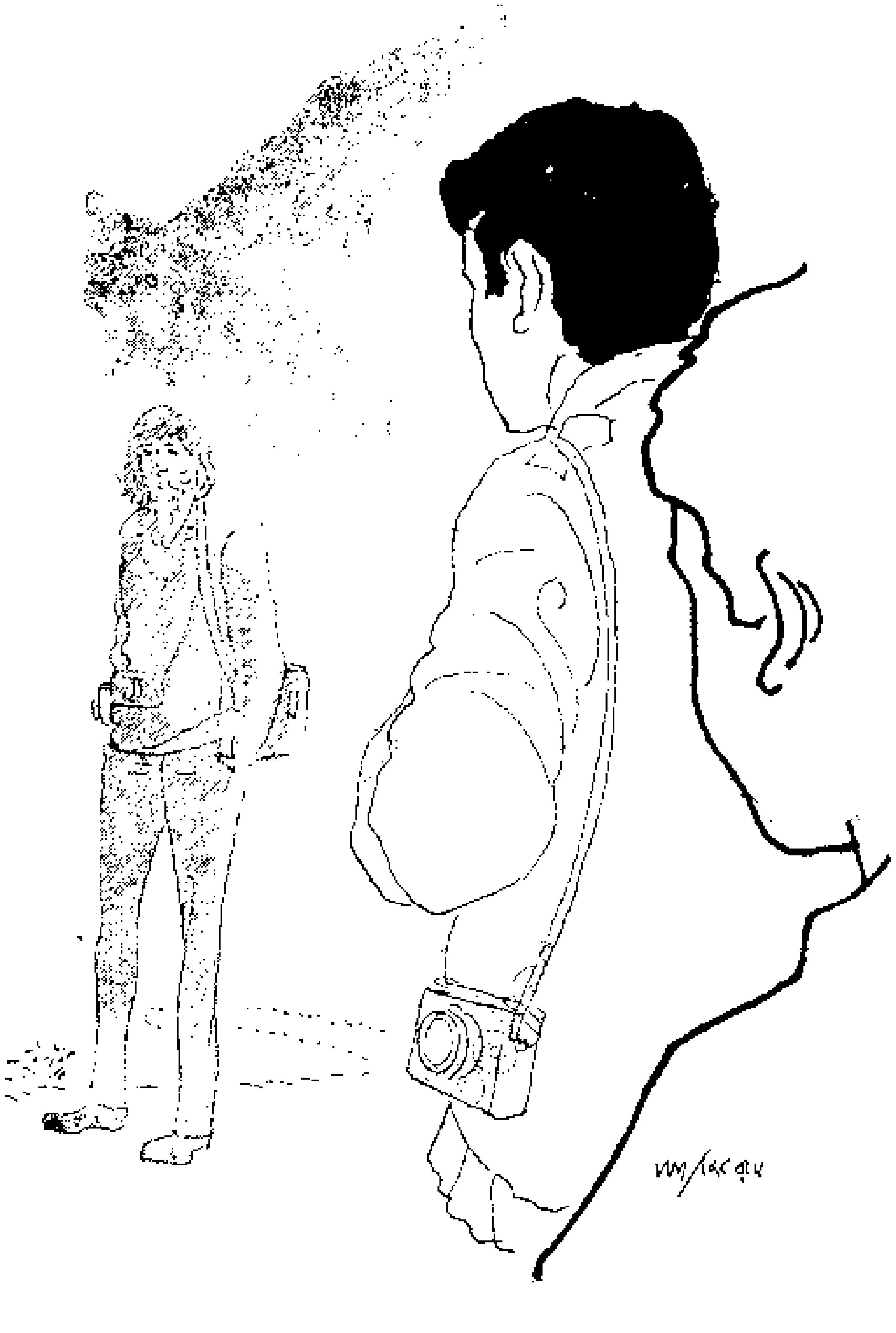

বরুন। গ্যাংটক থেকে ষোল মাইল দূরে ১৪,০০০ ফুট হাইটে নাথুলা। নাথুলাতে চিন আর ভারতের মাঝের সীমারেখা। এ দিকে ভারতীয় সৈন্য, আর ও দিকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চিনা সৈন্য।

আরও কিছু দূর হেঁটে যাবার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে কুয়াশার মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল। একটু এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই না—একটা লোক, ভারি বাহারের পোশাক পরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা থেকে মাথা অবধি রঙের বাহার। পায়ে হলদে জুতো, প্যান্টটা হল নীল রঙের জিনস, সোয়েটারটা টকটকে লাল, আর তার গলার ফাঁক দিয়ে ভিতরে সবুজ শার্টের কলার দুটো বেরিয়ে আছে। শার্টের ঠিক উপরেই, থুতনির নীচে, একটা সাদার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ। লোকটার মুখের রং হাল্কা হলদে আর ফ্যাকাশে গোলাপি মেশানো, আর চুল—শুধু চুল নয়, গোঁফদাড়িও—বাদামি রঙের। দেখেই বোঝা যায়, ইনি একজন বিদেশি হিপি। দাড়ি থাকার ফলে বয়স বোঝা মুশকিল, তবে মুখের চামড়া একটুও কুঁচকোয়নি। মনে হয় ফেলুদারই বয়সী—মানে ত্রিশের একটু নীচেই।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরে বললেন, 'হ্যালো।'

ফেলুদাও উত্তরে 'হ্যালো' বলল। এবার লক্ষ করলাম, হিপির কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে, আর তার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ। তাতেও হয়তো ক্যামেরারই জিনিসপত্র রয়েছে। একটা ক্যামেরার নাম 'ক্যানন', দেখে বুঝলাম সেটা জাপানি। ফেলুদার সঙ্গেও তার জাপানি ক্যামেরাটা ছিল, আর সেটা দেখেই বোধ হয় হিপি বললেন, 'নাইস ডে ফর কালার।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'তোমাকে কিছু দূর থেকে কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে পড়ছিল, তবে দুঃখের বিষয় ভাল কালার ফিল্ম এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য।'

হিপি বলল, 'সেটা জানি। আমার কাছে কালারের স্টক আছে,

প্রয়োজন হলে আমাকে ব'লো ।'

হিপি যদিও ইংরেজিতে কথা বলছিল, উচ্চারণ শুনে তার জাতটা বুঝতে পারলাম না। ফরাসি অথবা আমেরিকান হলে চন্দ্রবিন্দুটা একটু বেশি ব্যবহার করত, আর ইংরেজ হলে তো বোঝাই যেত ইনি কিন্তু ওই তিনটি জাতের একটিও নন।

ফেলুদা বলল, 'তুমি কি বেড়াতে এসেছ ?'

হিপি বলল, 'আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে। আমি একজন প্রোফেসনাল ফটোগ্রাফার

'কত দিন আছ এখানে ?'

'এসেছি নাইনথ। পাঁচ দিন হল। তিন দিনের ভিসা ছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরও দিন-সাতেক থাকার ইচ্ছে।'

'কোথায় উঠেছ ?'

'ডাকবাংলো। এই যে রাস্তাটা ডান দিকে উঠে গেছে—এইটে দিয়ে একটু উঠে গিয়েই ডাকবাংলো।'

ডাকবাংলো শুনেই আমার কানটা খাড়া হয়ে উঠল। শেলভাঙ্কারও তো বোধ হয় ডাকবাংলোতেই ছিলেন।

'তা হলে যে-ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল ?' ফেলুদা জিগেস করল।

হিপি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি স্যাড। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যান্ড— ।'

এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল। দেখে মনে হল, সে হঠাৎ কেন যেন চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রায় আপন মনেই বলল, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

'কী ব্যাপার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। হি পেড ওয়ান থাউজ্যান্ড রুপিজ ফর ইট।'

'এক হাজার !' ফেলুদা অবাক হয়ে বলল।

'হাঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটান ইনস্টিটিউটে

সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচু দরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু—' ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, 'আমার খটকা লাগছে এই ভেবে যে, মূর্তিটা গেল কোথায় ?'

'তার মানে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'তার ডেড বডি তো শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার জিনিসপত্র নিশ্চয়ই সেই সঙ্গেই গেছে—তাই নয় কি ?'

হিপি মাথা নাড়ল। 'অন্য সব জিনিস ফেরত গেছে সেটা ঠিকই, কিন্তু মিস্টার শেলভঙ্কার মূর্তিটা সব সময়ে তাঁর কোটের বুক-পকেটে রাখতেন। বলতেন, এটা আমার ম্যাসকট—আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সে দিন যখন বেরোন, তখনও সেটা ওঁর পকেটেই ছিল। এটা আমি জানি। অ্যাক্সিডেন্টের পর ওঁকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন আমি সেখানে ছিলাম। ওঁর জামাকাপড় খুলে ওঁর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা হয়। একটা নোটবুক বেরোয়, মানিব্যাগ বেরোয়, খাপের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় ওঁর চশমাটা বেরোয়, কিন্তু মূর্তি বেরোয়নি। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ; হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর না-হয় যারা তাকে তুলে আনে, তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।'

'কিন্তু এখানের লোকেরা তো শুনেছি খুব অনেস্ট।'

'সেইজন্যেই তো গোলমাল লাগছে।' হিপি থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল। ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার সে দিন কোথায় যাচ্ছিলেন, সেটা জানেন ?'

'সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা আছে, সেখানে আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে দিন সকালে উঠে দিনটা ভাল দেখে আমি ওঁর অনেক আগেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি। উনি বলেছিলেন—পথে যদি তোমাকে দেখি, তা হলে তুলে নেব।'

'হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন ?'

'সেটা ঠিক জানি না। বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী।'

'ডক্টর বৈদ্য?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। নামটা এই প্রথম শুনছি।

হিপি হেসে বলল, 'এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় কি? চলো, ডাকবাংলোয় চলো—কফি খাবে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। বুঝলাম ও শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সব জেনে নিতে চাইছে।

ডান দিকের চড়াই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে হিপি বলল, 'তা ছাড়া আমার পা-টারও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। সে দিন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে স্লিপ করে একটু মচকেছে। বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।'

কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। চার দিকে যে এত গাছপালা ছিল, তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। হালকা হয়ে আসা কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এখন পাইন গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

খানিক দূর হেঁটেই আমরা ডাকবাংলো পৌঁছে গেলাম। বেশ সুন্দর একতলা বাড়ি; বেশি দিনের পুরনো বলেও মনে হল না।

হিপি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারের উপর থেকে কাগজপত্র সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আমার পরিচয়টাই এখনও দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেলমুট উঙ্গার।'

'জার্মান নাম কি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ঠিকই ধরেছ।' হেলমুট তার খাটেই বসল। ঘরের চারি দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, আলনায় আরও রঙচঙে পোশাক, বাক্সগুলো আধখোলা, তার মধ্যে কাপড়ের চেয়ে কাগজপত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদিই বেশি। কিছু ফোটো রাখা রয়েছে টেবিলের উপর, দেয়ালের গায়ে ঠেস দাঁড় করানো অবস্থায়। বেশির ভাগই বিদেশের ছবি, কিছু এ দেশে তোলা। আমি খুব বেশি বুঝি না, তবে দেখে মনে হল ছবিগুলো বেশ ভাল।

ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল, যদিও সে যে শখের ডিটেকটিভ, সে কথা বলল না। তার পর হেলমুট 'এক্সকিউজ মি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে আবার

খাটে বসে বলল, 'ডক্টর বৈদ্য ভারি ইন্টারেস্টিং লোক, তবে কথাটা একটু বেশি বলেন। ডাকবাংলোতেই এসেছিলেন কয়েক দিন। ভাগ্য গণনা জানেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, যে লোক মরে গেছে, তার আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারেন।'

'প্লানচেট জাতীয় ব্যাপার ?'

'কতকটা তাই। মিস্টার শেলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারি আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হল অনেক পড়াশুনা আছে।'

'তিনি এখন কোথায় ?'

'কালিম্পং যাবার কথা ছিল। সেখানে নাকি কোনও এক তিব্বতি সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বলেছেন তো আবার আসবেন।'

'মিস্টার শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিলেন তিনি ? আপনি শুনেছেন সে-সব কথা ?'

'আমার সামনেই কথাবার্তা হয়। তাঁর ব্যবসার কথা বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বললেন, ছেলের কথা বললেন। এমন কি, তিনি যে কিছুদিন থেকে মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন, সে কথাও বললেন।'

'সেটা কী কারণে ?'

'তা জানি না।'

'আপনাকে কিছু বলেননি ?'

'না। তবে বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ওঁর একটা টেলিগ্রাম আসে। উনি সেটা পড়ে রীতিমতো আপসেট হয়ে পড়েন।'

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার যে আকস্মিকভাবে মারা যাবেন, এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্য কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ?'

'ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী না করলেও, একটা সপ্তাহ একটু সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর সময় ভাল যাচ্ছে না।'

কফি এল। আমরা তিনজনেই চুপচাপ বসে খেলাম। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কিনা জানা না

গেলেও, আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। আমার বিশ্বাস, ফেলুদারও আমার মতোই মনের অবস্থা। কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে যখন একটা সন্দেহ জাগে, তখন ও চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল মটকায়। এখনও সে আঙুল মটকাচ্ছে।

কফি শেষ করে ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি যখন আরও দিন-সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ডক্টর বৈদ্য যদি আসেন, তা হলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে আছি।'

হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এল। গুডবাই করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল: 'মূর্তিটা কোথায় গেল সেটা জানতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগত।'

৬

কুয়াশা কাটলে কী হবে, আকাশে মেঘ এখনও কাটেনি। অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছিল, তবে এ রকম বৃষ্টি ভালই লাগে। ছাতার দরকার হয় না, গা ভিজল কি না ভিজল বোঝাই যায় না, অথচ শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বাটার দোকানটা দেখলাম আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দু'জনের জন্য হান্টিং বুট কেনা হলে পর ফেলুদা বলল, 'রাস্তাঘাট যখন জানা নেই, তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট। দুর্দান্ত সব থাঙ্কা, পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।'

'তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে?' উত্তর পাব কি না জানি না, তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'কিসের সন্দেহ?'

'...যে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিক মরেননি।'

'এখনও সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি।'

'তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে কী হল ? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে, পকেট থেকে মূর্তি গড়িয়ে পড়েছে, যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে পেয়ে ট্যাঁকস্থ করেছে—ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। খুন করা এমনিতেই সহজ না, তার উপর মাত্র এক হাজার টাকার একটা মূর্তির জন্যে খুন—এ তো ভাবাই যায় না।'

আমি আর কিছু বললাম না। খালি মনে মনে বললাম—একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল।

সারি সারি দাঁড়ানো জিপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নেপালি ড্রাইভারকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া যায়গা ?'

লোকটা বলল, 'কাঁহা যায়গা ?'

'টিবেটান ইনস্টিটিউট মালুম হ্যায় ?'

'হ্যাঁ। বৈঠ যাইয়ে।'

'আমরা দু'জনেই সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম। ড্রাইভারটা গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ চাপিয়ে জিপটা ঘুরিয়ে যে-পথে আমরা শহরে এসে ঢুকেছিলাম, সেই পথে উল্টোমুখে চলতে লাগল।

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাতচিৎ আরম্ভ করে দিল। কথা অবিশ্যি হিন্দিতেই হল ; আমি সেটা বাংলায় লিখছি।

'এখানে সে দিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সেটার কথা তুমি জানো ?'

'সবাই জানে।'

'সে ড্রাইভার তো বেঁচে আছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ—ওর খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেও পাথর পড়ে—তাতে ড্রাইভারটা মরেছিল, আর যাত্রী বেঁচে গিয়েছিল।'

'তুমি এ ড্রাইভারকে চেনো ?'

'চিনব না ? এখানে সবাই সবাইকে চেনে।'

'সে কী করছে এখন ?'

'আবার অন্য একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে—SKM 463। নতুন

ট্যাক্সি।'

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ?'

'হাঁ, ও তো নর্থ সিকিম হাইওয়েতে। এখান থেকে দশ কিলোমিটার।'

কাল একবার নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন পারব না?'

'তা হলে এক কাজ করো। আটটা নাগাত বেরোব—সকালে। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে থাকি—তুমি চলে এসো।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খাড়াই পথ ধরে উঠে গিয়ে টিবেটোন ইনস্টিটিউট। ড্রাইভার বলল, জঙ্গলে নাকি খুব ভাল অর্কিড আছে—কিন্তু সে সব দেখবার সময় এখন নয়। গাড়ি একেবারে সোজা ইনস্টিটিউটের দরজার সামনে গিয়ে থামল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, তার গায়ে বোধ হয় তিব্বতি ধাঁচেরই সব নকশা করা। চারদিক এত নির্জন আর নিস্তব্ধ যে, একবার মনে হল ইনস্টিটিউট হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, দরজা খোলা।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হলঘরে এসে পড়েছি, তার দেওয়ালে লম্বা লম্বা ছবি ঝুলছে (এগুলোকেই বলে থাঙ্কা,) আর মেঝেতে রয়েছে নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিসপত্রে বোঝাই সারি সারি কাঁচের আলমারি আর শো-কেস।

কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না, এমন সময় একজন ঢোলা সিকিমি পোশাক আর চশমা-পরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা তাকে ভীষণ ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর গুপ্ত আছেন কি?'

ভদ্রলোক ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'দুঃখের বিষয় কিউরেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

ফেলুদা বলল, 'না, মানে, একটা বিশেষ ধরনের তিব্বতি মূর্তি

সম্বন্ধে আমি একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম। নামটা জানি না, তবে কোনও এক দেবতার মূর্তি। তার ন'টা মাথা আর চৌত্রিশটা হাত।'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'ইয়েস ইয়েস—যমন্তক, যমন্তক। টিবেট ইজ ফুল অফ স্ট্রেঞ্জ গডস। আমাদের কাছে একটা যমন্তকের মূর্তি আছে, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু ওর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছু দিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন। আনফরচুনেটলি হি ইজ ডেড নাউ।'

'আই সি।' প্রয়োজনে ফেলুদার অ্যাকটিং দেখবার মতো।

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলাম। যে মূর্তিটা ভদ্রলোক বার করে আমাদের সামনে ধরলেন, সেটার চেহারা ভয়ঙ্কর। ন'টা মুখের প্রত্যেকটাতেই একটা হিংস্র ভাব—প্রায় রাক্ষসের মতো।

এবার ভদ্রলোক মূর্তিটাকে চিত করে দেখালেন তার তলায় একটা ফুটো। এই ফুটোর ভিতরে নাকি মন্ত্র লেখা কাগজ পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হয়, আর তাকে বলে নাকি 'সেক্রেড ইনটেস্টাইন'।

মূর্তিটাকে আলমারিতে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য! সোনার মূর্তি, আর তাতে নানা রকম পাথর বসানো। চোখ দুটো ছিল রুবি পাথরের। আমরা এত সুন্দর মূর্তি আগে কখনও দেখিনি।'

ফেলুদা বলল, 'কি রকম দাম হতে পারে সে মূর্তির?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হি পেড এ থাউজ্যান্ড রুপিজ। আমার মতে জলের দরে পেয়েছিলেন। ওর দাম দশ হাজার টাকা হলেও বেশি হত না। আমাদের কিউরেটার নিজে তিব্বত গেছেন, দালাইলামার সঙ্গে বসে মড়ার মাথার খুলিতে চা খেয়েছেন, কিন্তু তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি।'

ভদ্রলোক এর পরে আমাদের আরও অনেক জিনিস দেখিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন। ফেলুদা সে সব মন দিয়ে শুনলেও, আমার কোনও কথাই কানে ঢুকল না। আমি শুধু

ভাবছি—শেলভাঙ্কারের মূর্তির দাম ছিল দশ হাজার টাকা। এক হাজার নয়, দশ হাজার! দশ হাজার টাকার মূর্তির লোভে কি একজন আর একজনকে খুন করতে পারে না? অবিশ্যি তার পরেই আবার মনে পড়ল যে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে তার জিপে প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলেই শেলভাঙ্কার মারা গিয়েছিল। তাই যদি হয়, তা হলে তো খুনের কথাটা আসেই না।

টিবেটান ইনস্টিটিউট থেকে বেরোবার সময় আমাদের গাইড ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'যমন্তক সম্বন্ধে হঠাৎ লোকের এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না। এর মধ্যেই তোমরা ছাড়া আর একজন জিগ্যেস করে গেছে।'

'যিনি মারা গেছেন, তিনি কি?'

'না না। তাঁর কথা বলছি না। আর একজন।'

'কে, মনে পড়ছে না?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ—শুধু প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না। আসলে সে দিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিলেন, আমাদের চোগিয়ালের অতিথি—তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম...'

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যখন জিপে উঠছি, তখন দেখি চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট। দিনের আলো এত শিগগিরই যাবার কথা নয়। জঙ্গল থেকে জিপ খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র বুঝতে পারলাম, পশ্চিমে ঘন কালো মেঘই এই অন্ধকারের কারণ। ড্রাইভার বলল, 'দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়ই ভাল যায়, যত দুর্যোগ রাত্তিরে।' আজ আর ঘোরাঘুরির কোনও মানে হয় না, তাই আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

গাড়িতে ফেলুদা কোনও কথা বলল না। ও যে কী ভাবছে তা বোঝার উপায় নেই, তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চলন্ত গাড়ির জানালার বাইরের সব কিছুর দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি। কোনও নতুন জায়গায় এলেই, আগেও দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়। আর

এক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর পর সব দোকানের নামই মুখস্থ হয়ে যাবে। আমি যে কবে ফেলুদার চোখ আর মেমরি পাব, তা জানি না! অবিশ্যি আমার বয়স এখন মাত্র পনের, আর ওর আঠাশ।

হোটেলে পৌঁছে যখন জিপের ভাড়া দিচ্ছি, তখন আবার শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা। এখনও সেই ব্যস্ত অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিক থেকে ফিরছেন। প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি, তার পর ফেলুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপারে একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতি মূর্তি কিনেছিলেন। একটা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন। সেই মূর্তিটা তাঁর জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেরত গেছে কিনা।'

শশধরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু আপনি ব্যাপারটা জানলেন কী করে?'

ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকান্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে, সেটা বলল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু বললেন, 'বুক পকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। হি হ্যাড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস।'

তার পর হঠাৎ মুখের ভাব একদম বদলে ফেলুদার দিকে চেয়ে একটা অবাক হাসি হেসে বললেন, 'ভাল কথা—আপনি যে ডিটেকটিভ, সেটা তো আমাকে বলেননি!'

আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। ফেলুদারও দেখি মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কী করে জানলেন?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমি জানি, সেটা ফেলুদারই কার্ড; তাতে লেখা আছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator.

'আপনি যখন জিপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন, তখনই বোধ হয়

আপনার কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের সিটে পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। বাংলোয় যখন নামছি, তখন ড্রাইভারটা আমায় কার্ডটা দেয়। ভাল করে পড়ে দেখিনি, কারণ চশমাটা ছিল না হাতের কাছে। তার পর থেকে যা গণ্ডগোল এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি—আর এই নিন আমার কার্ড। যদি কোনও গোলমাল দেখেন, আর মনে করেন আমার আসা দরকার—একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন—আর্লিয়েস্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে চলে আসব।'

'কখন যাচ্ছেন আপনি ?'

'কাল ভোরে। হয়তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আসি। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক হাত তুলে 'গুড বাই' করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

ঘরে এসে ফেলুদা বুট-মোজা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে বলল—উফ্‌ফ্‌!

সত্যিই, আজ এই প্রথম দিনে এত রকম ঘটনা ঘটল যে, উফ্‌ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

'ভেবে দ্যাখ', ফেলুদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ক্রিমিন্যালের যদি ন'টা মাথা হত তা হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে খপ করে ধরার আর কোনও উপায় থাকত না।'

'আর চৌত্রিশটা হাত ?'

'সেও সাংঘাতিক। চৌত্রিশ জোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না।'

বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম।

ফেলুদা তার হাতবাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল খাতাটা বের করল। তার পর শোওয়া অবস্থাতেই খাতাটা খুলে বুকের উপর রেখে পকেট থেকে কলমটা বার করে লেখার জন্য

তৈরি হল। শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন, ফেলুদা যে অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

'বল তো, এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ হল?'

প্রশ্নটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না, তাই প্রথমটা কি রকম হকচকিয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'একেবারে বাগডোগরা থেকে শুরু করতে হবে নাকি?'

'দূর গর্দভ। এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে, তার মধ্যে বল।'

'এক—শশধরবাবু।'

'পদবি?'

'দত্ত।'

'তোর মুণ্ডু।'

'সরি—বোস'।

'কেন এসেছেন এখানে?'

'ওই যে বললেন কী সুগন্ধি গাছের ব্যাপার।'

'অত দায়সারাভাবে বললে চলবে না।'

'দাঁড়াও...ভদ্রলোকের পার্টনার মিস্টার শেলভাঙ্কারকে মিট করতে! ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে, যার অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল—'

'ও. কে.—ও. কে.! নেক্সট?'

'হিপি।'

'নাম?'

'হেলমেট—'

'মুট। মেট নয়। হেলমুট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'পদবি?'

'উঙ্গার।'

'আসার উদ্দেশ্য?'

'প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই

করতে চায়। তিন দিনের ভিসা পেয়েছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে।

'নেক্সট?'

'নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিং-এ থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা তিব্বতী মূর্তি ছিল, শেলভাঙ্কারকে—'

দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন!' ফেলুদা ভীষণ সাহেবি কায়দায় বলে উঠল।

'ডিসটার্ব করছি না তো?' নিশিকান্ত সরকারের প্রবেশ। 'একটা খবর দিতে এলুম।'

ফেলুদা সোজা হয়ে বসে ভদ্রলোককে খাটের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। নিশিকান্তবাবু তার সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'কাল লামা ডান্স হচ্ছে।'

'কোথায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'রুমটেক। এখান থেকে মাত্র দশ মাইল। দারুণ ব্যাপার। ভুটান কালিম্পং থেকে সব লোক আসছে। রুমটেকের ইনি লামা—তাঁর পোজিশন খুব হাই। ডালাই লামা, পাঞ্চেন, তার পরেই ইনি। ইনি তিব্বতেই থাকতেন। ইদানীং এসেছেন। মঠটাও নতুন। একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'সকালে হবে না।' ফেলুদা ভদ্রলোককে একটা চারমিনার অফার করল। 'দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়া যেতে পারে।'

'আর পরশু যদি যান, তা হলে হিজ হোলিনেস-এর দর্শনও পেতে পারেন। বলেন তো তিনটে সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি।'

আমি বললাম, 'স্কার্ফ কেন?'

নিশিকান্ত হেসে বললেন, 'ওইটেই এখানকার রীতি। ধরো কোন তিব্বতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্কার্ফ নিয়ে যেতে হয়। তুমি গিয়ে তাঁকে স্কার্ফটা দিলে, তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন—ব্যস, ফরম্যালিটি কমপ্লিট।'

ফেলুদা বলল, 'লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই

দেখা যাবে।'

'আমারও তাই মত। আর গেলে কালই যাওয়া ভাল। যা দিন পড়েছে, এর পরে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে বলা যায় না।'

'ভালো কথা—আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলভাঙ্কার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন?'

নিশিকান্তবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না: 'ঘুণাক্ষরেও না। নট এ সোল। কেন বলুন তো?'

'না—এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম, তবে তারও প্রয়োজন হয়নি। দোকানেই শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়, তার পর সোজা ডাকবাংলোয় গিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি। অবিশ্যি উনি এক দিন রেখে তার পর দামটা দিয়েছিলেন।'

'নগদ টাকা?'

'না না। সেটা হলে আমার সুবিধেই হত, কিন্তু ক্যাশ ছিল না ওঁর কাছে। চেক দিয়েছিলেন। দাঁড়ান—'

নিশিকান্তবাবু তাঁর ওয়ালেট থেকে একটা ভাঁজ করা চেক বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমিও ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলাম। ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চেক—তলায় দারুণ পাকা সই—এস. শেলভাঙ্কার।

ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিল।

'কোথাও কোনও সাস—মানে, সাসপিশাস কিছু দেখলেন নাকি?' মুখে সেই হাসি নিয়ে নিশিকান্তবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নাঃ।' ফেলুদা হাই তুলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বাইরে একটা চোখ-ঝলসানো নীল বিদ্যুতের পর একটা প্রচণ্ড বাজের শব্দে ঘরের কাঁচের জানলা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। নিশিকান্তবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

'বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না, হেঁ হেঁ। আসি...'

যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি, যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি,

যখন ঘুমোচ্ছি তখনও এক-এক বার বাজের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে—আর বৃষ্টির শব্দ পেয়েছি। একবার ঘুম ভেঙে জানালার দিকে চোখ পড়াতে মনে হল, কে যেন জানালার বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কে আর বাইরে বেরোবে? নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল। কিংবা হয়তো ঘুমই ভাঙেনি। পাহাড়ের দিকের জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখা লাল পোশাক পরা লোকটা হয়তো আসলে আমার স্বপ্নে দেখা।

৪

কোন্ ভোরে বৃষ্টি থেমেছে জানি না। সাড়ে ছ'টায় উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, চারিদিক রোদ ঝলমল, আর আমার ঠিক সামনের পাহাড়ের সারির পিছন দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং-এর চেয়ে অন্য রকম দেখতে, হয়তো অত সুন্দরও না, কিন্তু তা হলেও চেনা যায়, তা হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ফেলুদা আমার আগেই উঠে যোগব্যায়াম সেরে স্নানে ঢুকেছিল, এই মাত্র বেরিয়ে এসে বলল, 'চটপট সেরে নে—অনেক কাজ।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট খেতে যখন নীচে নেমেছি, সবে সাতটা বেজেছে। একটু অবাক লাগল দেখে যে, নিশিকান্তবাবু আমাদের আগেই ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি তো খুব আর্লি রাইজার মশাই?'

কাছে গিয়ে বুঝলাম, মুখে সেই হাসিটা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে কেমন যেন একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাদের, ইয়ে, মানে ভাল ঘুমটুম হয়েছিল?'

বুঝলাম আসলে ওঁর অন্য কিছু বলার দরকার, আগে একটু পাঁয়তাড়া কষছেন। ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শোনাল।

'মন্দ কী?' ফেলুদা বলল। 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে নিয়ে তাঁর কোটের বুক পকেট থেকে একটা হলদেটে কাগজ বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'এটা কী ব্যাপার বলুন তো?'

দেখি, কাগজটার উপর কালো কালি দিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে।

ফেলুদা বলল, 'এ তো তিব্বতি লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?'

'কাল রাত্রে—মানে মাঝরাত্রে—অ্যাট, মানে অ্যাট ডেড অফ নাইট—কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।'

'বলেন কী!'

আমার কিন্তু কথাটা শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। নিশিকান্তবাবুর ঘর হল আমাদের পাশের ঘর। ওটাও হোটেলের পিছন দিকে। আমাদের আর ওঁর ঘরের জানালার বাইরে দিয়ে একই বারান্দা গেছে, আর সেই বারান্দায় ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে হোটেলের পিছন দিকে।

'এটা রাখতে পারি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'স্বচ্ছ—মানে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কী লিখেছে, সেটার একটা হিল্লে না করা অবধি...'

'সেটা আর এমন কী কঠিন। তিব্বতি ভাষা জানা লোকের তো অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক—টিবেটান ইনস্টিটিউট তো আছে।'

'হ্যাঁ। সেই আর কি।'

'তবে আর কি। আপনি চিন্তা করছেন কেন? এটা হুমকি বা শাসানি গোছের একটা কিছু, সেটা ভাবার তো কোনও কারণ নেই। নাকি আছে?'

নিশিকান্তবাবু চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, 'সার্টেনলি নট!'

'এমনও তো হতে পারে যে, এটায় বলা হয়েছে—তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

'তা তো বটেই। অবিশ্যি...মানে হঠাৎ...কথা নেই বার্তা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন—হেঁ হেঁ।'

'হুমকিরও কোনও কারণ নেই বলছেন ?'

'না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট ইন ফাইভ।'

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আর ডিম-রুটি অর্ডার দিয়ে বলল, 'যাক গে—এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা তো পাশের ঘরেই রয়েছি। আপনার কোনও চিন্তা নেই।'

'বলছেন ?' আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো দাঁত এক সঙ্গে দেখা গেল।

'আলবাৎ। চা খেয়েছেন ?'

'এবার খাব আর কি।'

'পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে লামা-নাচ দেখার প্রোগ্রাম আছে। কুছ পরোয়া নেহি।'

'আপনাকে যে কী বলে থ্যা—'

'থ্যাঙ্কস দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন খোয়া না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখবেন।'

জিপ ঠিক সময়ই হাজির হল। আমরা উঠতে যাব, এমন সময় দেখি আর একটা জিপ বাংলোর দিক থেকে আসছে। নম্বরটা দেখে কেমন যেন চেনা মনে হল। SKM 463—ওহো, এই নম্বরের গাড়িই তো সেই নেপালি ড্রাইভার চালাচ্ছে, যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে পার পেয়েছিল। এবার নীল কোট পরা ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম, আর তার পাশেই বসে—ও মা, এ যে শশধরবাবু!

ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল। বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হয়নি বুঝি ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'নাঃ। অবিশ্যি নেহাৎ বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম ভায়া কালিম্পং চলে যাব।'

'ওই ড্রাইভারটি তো শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল—তাই না ?'

শশধরবাবু হেসে উঠলেন। 'আপনি তো তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি। ইয়েস—ইউ আর রাইট! আমি ওকে ডেলিবারেটলি বেছে নিয়েছি। প্রথমত, গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত—বাজ কখনও একই জায়গায় দু' বার পড়ে না, জানেন তো?'

শশধরবাবু দ্বিতীয়বার গুডবাই করে বাজারের রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে চলে গেলেন। আমরা আমাদের জিপেই উঠলাম। ড্রাইভারকে বলাই ছিল কোথায় যাব, তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে রওনা দিয়ে দিলাম।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কিনা। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কাল কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না, আর আজ আকাশে এক টুকরো মেঘও নেই। বাঁ দিকে শহর অনেক দূর পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। একটা বাড়ি দেখে ইস্কুল বলে মনে হল, কারণ তার সামনেই একটা চারকোনা খোলা জায়গা, আর তার দু' দিকে দুটো খুদে খুদে সাদা গোলপোস্ট। এখনও ইস্কুলের সময় হয়নি, না হলে ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলেদেরও দেখা যেত।

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা চৌমাথা পড়ল। ডান দিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান, মাঝখানে পুলিশ, বাঁ দিকে একটা রাস্তা পিছনে নীচের দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তাটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। একটার মুখে একটা গেট—তাতে লেখা ইন্ডিয়া হাউস—সেটা পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমরা নিলাম অন্য রাস্তাটা, যেটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

মিনিট খানেক চলার পরেই রাস্তার ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম—নর্থ সিকিম হাইওয়ে।

ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল, সেটা থামিয়ে ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল, 'ইয়ে রাস্তা কিতনা দূর তক গিয়া?'

ড্রাইভার বলল, রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে, যার একটা গেছে লাচেন, আর একটা লাচুং।

দুটো'রই নাম শুনেছি, দুটো'রই হাইট ন' হাজার ফুটের কাছাকাছি, আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

'রাস্তা ভাল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তা ভাল, তবে 'পানি হোনেসে কভি কভি বিগড় যাতা।'

'ল্যান্ডস্লাইড হয় ?'

'হাঁ বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা বিগড় যাতা।'

শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা আর্মি ক্যাম্প পেরোতেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম। এখন নিচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের খেত দেখা যাচ্ছে। এখন ভুট্টা হয়েছে, ধানের সময় ধান হয়। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে করা খেত—ভারি সুন্দর দেখতে।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট পড়ছে, তবে তাতে সব কিলোমিটারে লেখা। প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল, তার পর মনে মনে হিসেব (৫ মাইল = ৮ কিলোমিটার) করে নেওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।

দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে, জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি, সেটা এবার বুঝতে পারলাম।

জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম নির্জন নিস্তব্ধ।

রাস্তা থেকে অনেকখানি নীচে খাদের মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, তার একটা সর সর শব্দ আছে, আর আছে মাঝে মাঝে—কে জানে কদ্দূর থেকে ভেসে আসা নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখির শিস। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আমরা যে দিকে যাচ্ছিলাম, সে দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিক দিয়ে নেমেছে ঢাল, আর ডান দিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই উপরে উঠে গেছে। এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এখন রাস্তার ধারে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোকে দেখে আর অ্যাক্সিডেন্টের

কথাটা ভেবে পেটের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল।

ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল, তার পর রাস্তার বাঁ পাশটায় গিয়ে নীচের দিকে দেখে কয়েকবার খালি হুঁ হুঁ বলল। তার পর ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই ঢাল দিয়ে হাঁচোড় বা প্যাঁচোড় করে কিছু দূর নেমে যাওয়া বোধ হয় খুব কঠিন হবে না। তুই এখানেই থাক। আমার মিনিট পনেরোর মামলা।'

আমি যে উত্তরে কিছু বলব, ওকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করব, তার আর সুযোগই হল না। ও চোখের নিমেষে এবড়ো-খেবড়ো পাথর আর গাছগাছড়া লতাপাতা খামচাতে খামচাতে তরতরিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। আমার কাছে কাজটা বেশ দুঃসাহসিক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ফেলুদা দেখি তারই মধ্যে শিস দিতে দিতে নেমে চলেছে।

ক্রমে ফেলুদার শিস মিলিয়ে গেল। আমি ভরসা করে নীচের দিকে চাইতে পারছিলাম না, কিন্তু এবার একবার না দেখলেই নয় মনে করে রাস্তার কিনারে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। যা দেখলাম, তাতে বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদা পুতুল হয়ে গেছে; না জানলে তাকে দেখে চিনতেই পারতাম না।

ড্রাইভার বলল, 'বাবু ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছেন। ওইখানেই গিয়ে পড়েছিল জিপটা।'

ফেলুদার আন্দাজ অব্যর্থ। ঠিক ষোলো মিনিট পরে হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ শুনে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখি, ফেলুদা যেভাবে নেমেছিল সেইভাবেই আবার এটা-ওটা খামচে ধরে উঠে আসছে। হাতটা বাড়িয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে রাস্তায় তুলেই জিজ্ঞেস করলাম—'কী পেলে?'

'গাড়ির কিছু ভাঙা পার্টস, নাট-বোল্ট, কিছু ভাঙা কাঁচ, একটা তেলচিটে ন্যাকড়া নো বস্তুক।'

মূর্তিটা যে পাবে না সেটা আমারও মনে হয়েছিল।

'আর কিচ্ছু না?'

ফেলুদা তার প্যান্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে

একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখাল। সেটা আর কিছুই না—একটা ঝিনুকের কিংবা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতাম—মনে হয় শার্টের। আমাকে দেখিয়েই বোতামটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা উল্টোদিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। 'পাথর...পাথর...পাথর' আপন মনে বিড়বিড় করে চলেছে সে। তার পর গলা চড়িয়ে বলল, 'আর একটু তেনজিঙ্গি না করলে চলছে না!'

এবারে আর ফেলুদাকে একা ছাড়লাম না, কারণ খাড়াই খুব বেশি না, আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা জায়গা আছে, যেখানে ইচ্ছে করলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফেলুদা আগেই বলে দিয়েছিল—তুই আগে ওঠ, তোর পিছনে আমি। তার মানে হচ্ছে, আমি যদি পা হড়কে পড়ি, তা হলে ও আমাকে ধরবে!

খানিক দূর ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন থেকে বলল—'থাম।'

একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে চারদিকটা একবার দেখলাম। ফেলুদা আবার গুনগুন করে গান ধরেছে, আর দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে পায়চারি করছে।

'হুঁ!'

শব্দটা এল প্রায় মিনিট খানেক পায়চারির পর। ফ্ল্যাট জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে, তারই একটা অংশের দিকে ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আশেপাশে ঘাস থাকলেও এই বিশেষ অংশটা ন্যাড়া। মাটি আর দু একটা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

'এখান থেকেই পাথর বাবাজী গড়িয়েছেন। লক্ষ করে দ্যাখ এইখান থেকে শুরু করে ঢাল বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নীচ অবধি। ও ঝোপড়াটা দ্যাখ—ওই ফার্নের গোছাটা দ্যাখ—কীভাবে থেঁতলেছে। এগুলো সব পরিষ্কার ইনডিকেশন।'

আমি বললাম, 'কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে?'

ফেলুদা বলল, 'নীচে তো টুকরোগুলো দেখলি। কত বড় আর

হবে ? আর এ হাইট থেকে গড়িয়ে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য একটা ছোটখাটো ধোপার পুঁটলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট।'

'তাই বুঝি ?'

'তা ছাড়া আর কী ? এ হল মোমেন্টামের ব্যাপার। মাস ইন্টু ভেলোসিটি। ধর, তুই যদি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আর মনুমেন্টের উপর থেকে কেউ যদি একটা পায়রার ডিমের সাইজের নুড়িপাথরও তোর মাথায় তাগ করে ফেলে, তা হলে তার চোটেই তোর মাথা ফুটি-ফাটা হয়ে যাবে। একটা ক্রিকেট বল যত বেশি হাইটে ছোঁড়া যায়, সেটাকে লুফতে তত বেশি চোট লাগে হাতে। লোফার সময় কায়দা করে হাতে টেনে নিতে না পারলে অনেক সময় তেলো ফেটে যায়। অথচ বল তো সেই একই থাকছে, বদলাচ্ছে কেবল হাইট, আর তার ফলে মোমেন্টাম।'

ফেলুদা এবার ন্যাড়া জায়গাটার পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল, 'পাথরটা কীভাবে পড়েছিল জানিস ?'

'কীভাবে ?' আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা ন্যাড়া অংশটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট্ট গর্ত রয়েছে। সাপের গর্ত নাকি ?'

'যদ্দূর মনে হয়', ফেলুদা বলে চলল, 'প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিওর হয়ে বলা চলে যে একটা লম্বা লোহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল তা না হলে এখানে এ রকম একটা গর্ত থাকার কোনও মানে হয় না। অর্থাৎ—'

অর্থাৎ যে 'কী' আমিও বুঝে নিয়েছিলাম। তবুও মুখে কিছু না বলে আমি ফেলুদাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম।

'অর্থাৎ মিস্টার শিবকুমার শেলভাঙ্কারের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি। অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর ও নৃশংস পদ্ধতিতে কে বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ—এক কথায়—গন্ডগোল, বিস্তর গণ্ডগোল...'

৫

খুনের জায়গা থেকে (এখন থেকে আর অ্যাক্সিডেন্ট বলব না) হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ আছে, একটু পরে ফিরবে। আমি জানি যে, যদি জিজ্ঞেস করি কী কাজ—তা হলে উত্তর পাব না।

আমরা ফেরার পথে চৌমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; তাকে রুমটেকের নাচের কথা বলতে সেও যেতে চাইল। আর যাবেন নিশিকান্তবাবু। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? আর তাঁর সেই হিজিবিজি তিব্বতি লেখার মানে করারই বা কী হল ?

একবার মনে হল ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় পায়চারি করে কাটিয়ে দিই। তার পর মনে হল—নাঃ, হোটেলেই যাই। সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি, ঘরে বসে সেটা পড়তে পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে।

হোটেলে ঢুকতেই দেখলাম, নিশিকান্তবাবু গোমড়া মুখ করে ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অবিশ্যি আমাকে দেখেই তাঁর সে পুরনো হাসি ফিরে এলো। বললেন, 'দাদা কই ?' বললাম, 'একটু কাজে বেরিয়েছেন ; আসবেন এক্ষুনি।'

'তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না ?'

এ আবার কি রকম প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক ? আমি কিছু বলার আগেই আবার বললেন, 'উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম ; তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং পালাতুম।'

'কেন ?' ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন। বুঝলাম, তাঁর নার্ভাসনেসটা আবার ফিরে এসেছে।

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করলেন।

'জানো ভাই—সাত জন্মে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি, অথচ এ রকম শাসানি শেষটায় আমাকে দিলে।'

'ওটার মানে বের করেছেন নাকি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'একটা অ্যাং—মানে অ্যাংজাইটি ছিল, তাই

সোজা চলে গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউটে। কাগজটা দেখালুম। কী বললে জানো? বললে, এ লেখাটার মানে হচ্ছে 'মৃত্যু'। গিয়াংফুং—না ওই জাতীয় একটা কী তিব্বতি কথা। মানে হচ্ছে ডেথ! থার্টি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে, তাও জানি...'

আমার একটু বিরক্ত লাগল। বললাম, 'শুধু তো বলেছে মৃত্যু। এমন তো বলেনি যে আপনাকেই মরতে হবে।'

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন।

'তাও বটে। মৃত্যু মানে তো এনিবডিজ ডেথ হতে পারে—তাই না?'

'কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে, তারই বা কী মানে আছে?'

কিন্তু তাও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না। আবার তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। তার পর ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল...ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল...তার মানে হাওয়া ছিল...বাইরের জিনিস হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে পড়তে পারে। এটা যদি এমনি উটকো কাগজের টুকরো হয়...হয়তো ছেঁড়া পুঁথিটুথির পাতা—কাছাকাছি তো ছোটখাটো গুম্ফাও রয়েছে...একটা তো শহরে ঢোকার মুখটাতেই...হুঁ...হুঁ...'

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে কী দেখেছি, আমি আর সেটা বললাম না। তা হলে যেটুকু ভরসা পাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাও আর পেতেন না। শেষে যেন আর ভাবতে না পেরেই ভদ্রলোক জোর করে তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যাক্‌গে! তোমার দাদাই তো রয়েছেন। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় ভদ্রলোককে দেখে। খেলোয়াড়-টেলোয়াড় ছিলেন নাকি? না, এক্সারসাইজ করেন?'

'এককালে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন যোগব্যায়াম করেন।'

'ঠিক ধরেছি। আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে অমন ফিট বডি চোখে পড়ে না। চা খাবে?'

পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, তাই বললাম

চায়ে আপত্তি নেই। ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু' কাপ চা অর্ডার দিলেন। চা এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ফেলুদা ফিরে এল। আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যে নিশিকান্তবাবু তাঁর 'মৃত্যু'-র কথাটা ফেলুদাকে বলে দিলেন।

ফেলুদা আর একবার কাগজটা দেখে বলল, 'আপনাকে এ তটা ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে কেন সেটা আঁচ করতে পারছেন ?'

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি স্যার আকাশ-পাতাল ভেবেও এর কূল-কিনারা করতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'আর ভাববেন না। কারণ না থাকলে কেউ কারুর মৃত্যু কামনা করে না। আমার বিশ্বাস ওটা যে-ই ফেলে থাকুক না কেন, ঝড়ের রাতে অন্ধকারে ভুল করে ভুল ঘরে ফেলেছে। তিব্বতি তিব্বতিকেই তিব্বতি ভাষায় শাসায়। আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন, তাতেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে তো শাসানি মাঠে মারা—তাই নয় কি ?'

'তা তো বটেই।'

'বাস্—নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আর গোলমাল হলে আপনি তো আছেনই।'

'আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে-মধ্যে একটু বেশিই হয়।'

'তাই বুঝি ?'

ভদ্রলোকের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা আর কোনও রকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। আমি জানি কাঁদুনে ভিতু লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না। নিশিকান্তবাবু যদি ওর সিমপ্যাথি পেতে চান, তা হলে ওঁকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে।

আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি, ফেলুদা আবার তার নীল খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আমি ঢুকতেই বলল, 'টেলিগ্রাফ অফিসগুলোতে বেশির ভাগ লোকই যে অশিক্ষিত, সেটা আগেই জানা ছিল—তবে এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি।

'হঠাৎ টেলিগ্রাফ আপিসে কেন ?'

'[illegible] একটা কেব্‌ল করে দিলাম। ও পৌঁছাবার আগেই

অবিশ্যি পৌঁছে যাবে—তাও দেরি করে কোনও লাভ নেই।'

'কী লিখলে?'

'হ্যাভ রিজন টু সাসপেক্ট শেলভাঙ্কারস্ ডেথ নট অ্যাক্সিডেন্টাল। অ্যাম ইনভেসটিগেটিং।'

'বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলে!'

'ও। সে অন্য ব্যাপার।'

ফেলুদা নাকি টেলিগ্রাফ আপিসে কেরানিদের ঘুষ দিয়ে গত ক' দিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছিল কিনা সেটা জেনে নিয়েছে। 'একটা ছিল শশধরবাবুর টেলিগ্রাম—আম অ্যারাইভিং কোর্টিন্থ।'

'আর অন্যটা?'

'পড়ে দ্যাখ্'—বলে ফেলুদা তার নীল খাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER...PRITEX.

পড়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। সিক্ মনস্টার? রুগণ্ রাক্ষস? সে আবার কী?

ফেলুদা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে যে কোনও গোলমাল করেছে; কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—কী গোলমাল। আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল।'

আমি বললাম, 'প্রাইটেক্স আবার কী?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। মনে হয়, ওটা কোনও গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন। TEX মানে যে ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না।'

'এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল?'

'কিছুই আশ্চর্য না।'

'আর তার মানে এই এজেন্সিটা শেলভাঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল?'

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু Sick Monster!—হরি হরি!'

আমি বললাম, 'কতগুলো রহস্য এক সঙ্গে সমাধান করবে বলো

তো।'

ফেলুদা বলল, 'সেইটেই তো ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই বেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত। বল তো দেখি একটা একটা করে।'

'এক—Sick Monster।

'তার পর?'

'পাথর কে ফেলল।'

'গুড।'

'তিন—মূর্তিটা কোথায় গেল।'

'ঠিক হ্যায়।'

'চার—নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।'

'আর, কেন ফেলল। বহুৎ আচ্ছা।'

'পাঁচ—খুনের জায়গায় কার বোতাম।'

'অবিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে পারে। যাই হোক—বলে চল।'

'ছয়—তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে, কে মূর্তির কথা জিগ্যেস করেছিল।'

'স্প্লেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যে তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি।'

ফেলুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারলাম যে, আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি।

'শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার। মনে হয় তিনি শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন।'

'কে লোকটা?'

'ডক্টর বৈদ্য। যিনি ভবিষ্যৎ বলেন, আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, আর অন্যান্য যাবতীয় ভেলকি প্রদর্শন করেন। মোটের উপর লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।'

৬

রুমটেক যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে, সে পথে খানিক দূর ফিরে গিয়ে তার পর ডান দিকে একটা মোড় নিয়ে নতুন পথে সটান সিধে রাস্তায় চলতে হয়। রুমটেকের হাইট গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি, কিন্তু যাবার রাস্তা প্রথমে উৎরাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠে। ছোট ছোট গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার খেতের পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে—চারিদিকের দৃশ্য দার্জিলিং-এর চেয়ে কোনও অংশে কম সুন্দর নয়।

সকালের রোদ এখন আর নেই। হোটেলে থাকতেই মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাতে অবিশ্যি এক হিসেবে ভালই, কারণ গরমের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছু দিন আগের দুর্ঘটনার জন্যেই বোধ হয়, আমাদের ড্রাইভার খুব সবধানে জিপ চালাচ্ছিল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর ফেলুদা। পিছনের দুটো সিটে মুখোমুখি বসে আছে হেলমুট উঙ্গার আর নিশিকান্ত সরকার। হেলমুটের পায়ের ব্যথাটা নাকি সেরে গেছে। ওর কাছে নাকি কী জার্মান মলম ছিল, তাতেই কাজ দিয়েছে। নিশিকান্তবাবুর ভয়ের ভাবটা বোধ হয় কেটে গেছে, কারণ এখন উনি গুনগুন করে হিন্দি ফিল্মের গানের সুর ভাঁজছেন। গ্যাংটক শহর এখন আমাদের উলটো দিকের পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে। মনে হয় শহরটাকে আর খুব বেশিক্ষণ দেখা যাবে না, কারণ নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

ফেলুদা এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। সেটা আশ্চর্য নয়। আমি জানি ওর মাথার ভিতর এখন সেই ছ'টা প্রশ্নের উত্তর বার করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। নেহাৎ কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল তাই, তা না হলে ও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি লিখত আর হিসেব করত।

বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন বেশ হাইটে উঠে গেছি। সামনে একটা মোড়। ড্রাইভার ভঁপে হর্ন দিতে দিতে সেটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে রাস্তার দু' ধারে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে বাঁশের এক খুঁটির সঙ্গে আর এক খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রঙ-বেরঙের চারকোণা নিশান। এই নিশানগুলো টাঙিয়ে দিয়ে তিব্বতিরা নাকি অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা দূরে সরিয়ে রাখে। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটা নিশানে নকশা করা আছে।

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল। এবার সেটা ক্রমশ জোর হতে আরম্ভ করল। ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গুরুগম্ভীর শিঙার শব্দ, আর তার সঙ্গে থেকে থেকে ঝম্ ঝম্ করে কাঁসা বা পিতলের ঝাঁঝের আওয়াজ, আর চড়া বেসুরো সানাইয়ের মতো আওয়াজ। এটাই বোধহয় তিব্বতি নাচের বাজনা।

রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে। তার পরে রয়েছে একটা বড় গ্যারাজ গোছের ঘর, যাতে কয়েকটা জিপ রয়েছে, আর বাঁ দিকে রয়েছে কিছু দোকান। রাস্তার দু' ধারেও কয়েকটা জিপ আর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ির দল।

আমাদের জিপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম এইটাই রুমটেক মঠের ফটক। নিশিকান্তবাবু বোধ হয় হেলমুটের খাতিরেই ইংরেজিতে বললেন, 'দ্য লামাজ আর ড্যা—মানে ড্যানসিং।' আমরা চারজনে গাড়ি থেকে নামলাম।

গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন। সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা। এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কখনও দেখিনি। চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে লোকেরা সব ভিড় করে বাবু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা করা পর্দার সামনে আট-দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর বীভৎস মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। বাজিয়ের

দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান দিকে। যে শিঙাগুলোতে সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ হাত লম্বা। আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট-দশ বছর বয়সের ছেলেরা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার। এমন জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিওনি বা শুনিওনি।

হেলমুট উঠোনে পৌঁছানো মাত্র পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। আজ তার কাঁধে তিনটে ক্যামেরা। ব্যাগটাও সঙ্গে রয়েছে; তার মধ্যে আরও ক্যামেরা আছে কিনা কে জানে!

নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বসবেন নাকি?'

'আপনি কী করছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আমার তো এ জিনিস দেখা; কালিমপঙে দেখেছি। আমি একটু পেছন দিকটায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসছি। শুনিচি, ভেতরে নাকি অদ্ভুত সব কারুকার্য রয়েছে।'

আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ফেলুদা বলল, 'এ সব দেখে শুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি, সে কথা ভুলে যেতে হয়। গত এক হাজার বছরে এ জিনিসের কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'গুম্ফা বলে কেন ফেলুদা?'

ফেলুদা বলল, 'এটা ঠিক গুম্ফা নয়। গুম্ফা হল গুহা। এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা চলতে পারে। এই যে উঠোনের দু' পাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিস—ওখানে সব লামারা থাকে। আর লক্ষ কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে। সব মাথা মুড়োনো, গায়ে তিব্বতি জোব্বা। এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বড় হলে সব লামাটামা হবে।'

'মঠ আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস?'

'হ্যাঁ, মঠ—'

এইটুকু বলেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখ দুটো কুঁচকে গেছে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হঠাৎ কী দেখে পড়ল ফেলুদার?

মিনিট খানেক চুপ করে মাথা নেড়ে নিজের ওপর একটা ধিক্কারের ভাব দেখিয়ে ফেলুদা বলল, 'পাহাড়ে এলে কি তা হলে আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায় ? এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনি এতক্ষণ ?'

'কী জিনিস ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'কোনটা বুঝতে পারোনি ?'

'Sick Monster! Sick হল সিকিম, আর Monster হল মনাস্টেরি। থ্যাঙ্ক ইউ, তোপ্‌সে।'

সত্যিই তো ! বুঝতে পারা উচিত ছিল। 'তা হলে পুরো টেলিগ্রামটার কী মানে দাঁড়াচ্ছে ?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে, সেই পাতাটা খুলে ফের পড়ল—

'YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER—গোড়ার দিকটায় কোনও গোলমাল নেই। Is-টাকে In করে নে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে—ইয়োর সান মে বি ইন এ সিকিম মনাস্টেরি। তোমার ছেলে হয়তো সিকিমের কোনও মঠে রয়েছে। ব্যস্—পরিষ্কার ব্যাপার।'

'তার মানে শেলভাঙ্কারের যে-ছেলে চোদ্দ না পনেরো বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে এখন এখানে রয়েছে ?'

'প্রাইটেক্স তো তাই বলছে। এখন, প্রাইটেক্সের কেরামতির দৌড় যে কতখানি, তা তো জানি না। তবে এটা ঠিক যে, শেলভাঙ্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা আঁচ করে থাকে, তা হলে তার মনে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে ছেলেকে ভালোবাসত, অনেক দিন ধরে তার খোঁজ করেছে।'

'ও যে সে-দিন কোন্ একটা গুম্ফায় যাচ্ছিল, সেটাও হয়তো টেলিগ্রামটা পাবার পরই ছেলের সন্ধানে।'

'কোয়াইট পসিব্‌ল। আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে এ তল্লাটে, তা হলে অবিশ্যি...'।

ফেলুদা আবার চুপ করে গেল। মনে পড়ল, শশধরবাবু বলেছিলেন শেলভাঙ্কারের ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে যায়। তার মানে সে তার বাপের শত্রু।

'উইল...উইল...উইল', ফেলুদা আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। 'শেলভাঙ্কার যদি উইলে তাঁর ছেলেকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে সে অনেক টাকা পাবে।'

ফেলুদা ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমিও। বেশ বুঝতে পারলাম, টেলিগ্রামের মানে করতে পেরে ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ দিকে ও দিকে দেখছে সে। ভিড়ের মধ্যে অ-তিব্বতি ভারতীয় চেহারা খুঁজছে কি?

আমরা দুজনেই ভিড়ের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। বাঁ-দিকের একতলা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে আমরা চললাম মঠের বাড়িটার দিকে—যে দিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকান্তবাবু গেছেন। পিছন দিকটায় ক্রমে ভিড় হালকা হয়ে এসেছে। দু-একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম মঠের দরজায় চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়ে চলেছে, তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকানো যে, দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই। এদের বেশির ভাগেরই গোঁফ-দাড়ি কামানো, কিন্তু এক-এক জনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও, ঠোঁটের দু পাশে সরু ঝোলা গোঁফ রয়েছে—যেমন কোনও কোনও চিনাদের থাকে।

প্যান্ডেলের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনাস্টেরির দালানের বারান্দায় পৌঁছলাম। দেয়ালে বোধ হয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই নানা রকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে। বারান্দার পিছনে অন্ধকার হলঘর রয়েছে, তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকতে হয়।

আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দু জনে চৌকাঠ পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম। স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে। কিন্তু অন্ধকার হলে কী হবে—তার মধ্যেই চারদিকের রঙিন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে—তিন-তলা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য

কাজ করা সব সিল্কের নিশান। ঘরের দু' দিকে রঙিন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে, প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মতো কয়েকটা জিনিস খুঁটিতে দাঁড় করানো রয়েছে। আর পিছন দিকের সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদিতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ না, সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারি মুশকিল।

কাছে গিয়ে দেখলাম, এই সব বড় বড় মূর্তির পায়ের কাছে আরও অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে, নানা রকম ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আর ছোট ছোট পেতলের পিদিমে আগুন জ্বলছে।

এই সব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ফেলুদা আমার পিঠে হাত দিল। ঘুরে দেখি, ও দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে। এটা সামনের মেন গেট নয়, পাশের একটা ছোট দরজা।

'বাইরে আয়।'

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি, ডান দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে।

'কোন্ দিকে গেল লোকটা জানি না ; তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

'কোন লোকটা ?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল। আমি চাইতেই সট্‌কাল।'

'মুখটা দেখোনি ?'

'আলো ছিল না।'

দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিশনের লামা থাকেন নাকি ? বাঁ-দিকে খোলা ছাত, এখানে-ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে—ভোঁ ভোঁ ভোঁ ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং। এদের নাচ নাকি এক বার শুরু হলে সাত-ঘণ্টার আগে থামে

না।

আমরা হাত দিয়ে হেঁটে উলটো দিকের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছনে পাহাড়ের দৃশ্য আবছা কুয়াশায় ক্রমে ঢেকে আসছে। ডান দিকের মঠের পিছন দিয়ে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে, তার উপর দিকটায় দেখলাম এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশের খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত-তাড়ানো নিশান আস্তে আস্তে কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে।

'শেলভাঙ্কারের ছেলে যদি এখানে—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা বিকট চিৎকারে আমরা দু-জনেই চমকে থ' মেরে গেলাম।

'ওরে বাবা—ওঃ! হেল্প! হেল্প!'

এ যে নিশিকান্তবাবুর গলা!

আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুদা দেখি দৌড় দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে মঠের পিছন দিকের দরজা খুঁজে বার করতে সময় লাগল এক মিনিটেরও কম। দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি, দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল, তাই উঠতে কোনও অসুবিধা হল না। কোন্ দিকে যেতে হবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, কারণ 'হেল্প, হেল্প' চিৎকারটা এখনও আমাদের হেল্প করছে।

খানিক দূর উঠে একটা ফ্ল্যাট জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছালাম, সেটা পাহাড়ের কিনারা। তার পরেই খাদ, তবে সে খাদ বেশি দূর নামেনি—বড় জোর একশো ফুট। আর তাও ধাপে ধাপে। এরই একটা ধাপে—বোধ হয় দু' হাতের বেশি চওড়া নয়—একটা গাছড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা চোখ উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন—মরে গেলুম। বাঁচান!

নিশিকান্তবাবুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তাঁকে জাপটে

ধরে টেনে তোলামাত্র ভদ্রলোক চোখ উলটে ভিরমি দিলেন। অবিশ্যি জিপে এনে চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল।

'কী ব্যাপার বলুন তো'—ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু কঁকিয়ে উঠে বললেন, 'আরে মশাই, কী আর বলব—এই এতখানি পথ—একটু হাল্কা হবার দরকার পড়েছিল—তা ধর্মস্থান—মানে মানস্—মানে যাকে বলে মনশান্তি—তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি—ঝোপঝাড়ের তো অভাব নেই—তা জায়গাও পেলুম সুটেব্‌ল—কিন্তু আমাকে যে আবার কেউ ফলো করছে, তা কী করে জানব বলুন!'

'পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল?'

'সেন্ট পারসেন্ট। কী সাং—মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! নেহাৎ হাতের কাছে একটা গাছ পেলুম বলে—নইলে তিব্বতি শাসানি তো, মানে, অক্ষরে অক্ষরে—'

'লোকটাকে দেখেছেন?'

'পেছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারলে আবার দেখা যায় নাকি—হে!'

এই দুর্ঘটনার পর রুমটেকে থাকার কোনও মানে হয় না—হয়তো নিরাপদও নয়—তাই আমরা আবার বাড়িমুখো রওনা দিলাম। হেলমুটের একটু আপসোস হল, কারণ ও বলল, ছবি তোলার এত ভাল সাবজেক্ট ও এসে অবধি আর পায়নি। তবে নাচ আগামীকালও হবে, তাই ইচ্ছে করলে আর একবার আসতে পারে।

ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল—বোধ হয় চিন্তা করছিল—কারণ ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে, ওর মতো পরিষ্কার মাথাও হয়তো গুলিয়ে আসছিল। এবার সে নিশিকান্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, 'মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা বোধ হয় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছেন।'

'দায়িত্ব?' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেন পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে

না।

'আপনি কার পিছনে লেগেছেন সেটা না বললে তো কে আপনার পিছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।'

নিশিকান্তবাবু ঢোক গিলে দু' হাত তুলে কান মলে বললেন, 'কী সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন—আমি বলছি—জ্ঞানত আমি কোনও লোকের কোনও অনিষ্ট করিনি, কারও পিছনে লাগিনি—এমন কি কারও বদনাম পর্যন্ত করিনি।'

'আপনার কোনও যমজ ভাই-টাই নেই তো?'

'আজ্ঞে না স্যার। আই অ্যাম ওন্‌লি অফ্‌স্প্রিং।'

'হুঁ...। মিথ্যে বললে অবিশ্যি আপনিই ঠকবেন। কাজেই ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু...'

ফেলুদা চুপ করে গেল। আর সেই যে চুপ করল, সে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত।

ডাকবাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জিপের ভাড়ার শেয়ার দিতে যাওয়াতে ফেলুদা বাধা দিল—'তোমাকে তো আমরাই ইনভাইট করেছি, আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি কাজেই তোমার পয়সা তো আমরা নেব না।'

'অল রাইট—হেলমুট হেসে বলল, 'তা হলে একটু বসে চা খেয়ে যাও।'

নিশিকান্তবাবুরও আপত্তি নেই দেখে আমরা তিনজনেই জিপটার পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে, বাংলোয় হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

তিনজনে চেয়ারে বসেছি। হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে চায়ের অর্ডার দিতে যাবে, এমন সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি, একজন অদ্ভুত চেহারার ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে 'হ্যালো' বললেন। ভদ্রলোকের মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে, গায়ের উপর দিকে একটা গলাবন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ সিল্কিম জ্যাকেট, আর তলার দিকে ঢিলে ফ্লানেলের পাতলুন। তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও

রয়েছে— যাকে বোধহয় বলে যষ্টি।

হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই—ইনিই ডক্টর বৈদ্য।'

৭

'আপনাদের দেখিয়ে বঙ্গালি মনে হতেছে।'

ডাক্তার বৈদ্য ঠিক আমার পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

ফেলুদা বলল, 'ঠিকই বলেছেন।... আপনার কথা আমরা আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি।'

'হেলমুট ইজ এ নাইস বয়।'

ভদ্রলোক ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিন রকম ভাষা মিশিয়ে কথা বলে গেলেন।

'তবে হেলমুটকে আমি বলেছি যে এদেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে যার যত বেশি ছবি তোলা হবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে। কারণ, এই যে আমি, এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনও বস্তুতেও থেকে থাকে, তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই অন্য বস্তুর মধ্যে রয়েছে। এবং সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে।'

'আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'করলেই বা কী?' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন। 'হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে? তবে কোনও জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না। এখনও অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে, অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক পরীক্ষা করতে হবে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু আপনি তো সে সব না করেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন।'

'সব সময় না।' বৈদ্য একটু মুচকি হাসলেন। 'পারিপার্শ্বিক

অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায়; যেমন—' বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর দিকে আঙুল দেখালেন '—ওই ভদ্রলোকটি কোনও কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।'

নিশিকান্তবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন; ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?'

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তার পর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এজেন্ট।'

'এজেন্ট?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন, আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।'

নিশিকান্তবাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ অল। আমি আর শুনতে চাই না।'

বৈদ্য হেসে বললেন, 'আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিগেস করলেন, তাই বললাম। স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। তবে একটা কথা বলতে চাই—বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কাইন্ডলি এক্সপ্লেন', বললেন নিশিকান্তবাবু।

'এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চা এসে গিয়েছিল। হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিগেস করে দুধ-চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের সঙ্গে তো মিস্টার শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল।'

বৈদ্য মাথা নেড়ে বলল, 'বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে তো কারও কোনও হাত নেই। দোরোম [illegible] হয়েইছে—

হেম্ লোরমোং দেরজি সিংচিয়াম্
ওম্ পিরিয়ান হেত্তোরিবিরিডিয়াং !'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চা খেলাম। হেলমুট এই ফাঁকে তার টেবিলটা গোছগাছ করে নিল। নিশিকান্তবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে করে বসে আছেন—বুঝতে পারছি তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—কিন্তু খাবার কথাটা তাঁর যেন মনেই আসছে না। এর মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদাকে। কিংবা তার মনে উদ্বেগ থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে না, দিব্যি একটার পর একটা বিস্কুট খেয়ে চলেছে।

বাইরে রোদ পড়ে আসছে। হেলমুট সুইচ টিপল, কিন্তু বাতি জ্বলল না। কী ব্যাপার ? নিশিকান্তবাবু বললেন, 'পাওয়ার গেছে। এটা প্রায়ই ঘটে।'

'বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি' বলে হেলমুট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার ফেলুদা ডক্টর বৈদ্যকে আর একটা প্রশ্ন করল।

মিস্টার শেলভাঙ্কারের মৃত্যু কি সত্যিই আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস ?'

ডক্টর বৈদ্য হাতের পেয়ালা সামনের বেতের টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে পেটের উপর জড়ো করে বললেন, 'এ কথার উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে।'

'কে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'যে মৃত—একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই। আমাদের জীবিতকালে অজস্র অবান্তর জিনিস আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। ওই যে জানালা খোলা রয়েছে—সে জানালা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আকাশ দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি, আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এ সব হল অবান্তর জিনিস—নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এ সব দৃশ্যবস্তু বাধাস্বরূপ। অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দিই, তা হলে কী দেখব ? ঘরে যদি আলো না থাকে, তা হলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কী

থাকে ? অন্ধকার ! জীবন হল আলো, আর জীবন হল ওই জানালা নিয়ে দেখা দৃশ্য, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানালার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।'

এত বড় বক্তৃতা একটানা শুনে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল যে ফেলুদা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে। ও বলল, 'তা হলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাঙ্কারই একমাত্র জানেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল ?'

'মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়তো জানত না, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।'

কেন বলতে পারি না—আমার একটু গা ছমছম করতে শুরু করেছিল। হয়তো অন্ধকার বেড়ে আসছে বলেই ; আর মৃত্যু টিত্যু নিয়ে এত কথাবার্তা, আর ডক্টর বৈদ্যর চশমার কাঁচে বেগুনি মেঘে ভরা আকাশের ছায়া, আর তাঁর অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গলার স্বর, এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও কেমন যেন থমথমে মনে হচ্ছিল।

বেয়ারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় টেবিলের উপর একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে চলে গেল। ফেলুদা সবাইকে চারমিনার অফার করল, আর সবাই রিফিউজ করল। তখন ও একাই একটা সিগারেট ধরিয়ে পর পর দুটো রিং ছেড়ে বলল—'মিস্টার শেলভাঙ্কারের মতামতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।'

ফেলুদা অবিশ্যি প্ল্যানচেট-ট্যানচেট নিয়ে বই পড়েছে। ও বলে যে-জিনিসে বিশ্বাস নেই—সেই নিয়ে বইও পড়া উচিত না—এ কথাটা আমি মানি না। কারণ, যে বইটা লিখেছে, তার মতামতটা জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা। ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তাদের মানুষ সম্বন্ধে জানতেই হবে, আর মানুষ বলতে সব রকম মানুষই বোঝায়, কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না।

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে হাত দুটো উপরে তুলে বললেন, 'দরজা এবং জানালা দুটো বন্ধ করো।'

কথাটা বললেন, হুকুম করার ভঙ্গিতেই, আর সে হুকুম পালন করলেন নিশিকান্তবাবু। মনে হল তিনি যেন হিপ্নোটাইজ্‌ড হয়ে প্রায় যন্ত্রের মানুষের মতো কাজটা করলেন।

জানালা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হল্‌দে আলো ছাড়া ঘরে আর কোনও আলোই রইল না।

আমরা সবাই বেতের টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম। আমার ডান পাশে বৈদ্য, বাঁ পাশে ফেলুদা। ফেলুদার অন্য পাশে নিশিকান্তবাবু। আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট। ডক্টর বৈদ্য এবার বললেন, 'তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের উপর রাখো। প্রত্যেকের হাত তার দু' পাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই।'

ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের 'আপ' আর 'আপনি' বলে বলছিলেন, এবার দেখলাম 'তুম' আর 'তুমি' আরম্ভ করলেন।

আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে টেবিলে রাখলাম। সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেলমুটের হাতের মাঝখানে তাঁর নিজের হাত দুটো গুঁজে দিলেন। পাঁচ দশে পঞ্চাশটা উপুড় করা হাতের আঙুল এখন ফুলের পাপড়ির মতো মোমবাতিটাকে গোল করে ঘিরে বেতের টেবিলের উপর রাখা হয়েছে।

'তোমরা সবাই একদৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো।'

ঘরে বাতাস ঢোকার কোনও রাস্তা নেই, তাই মোমবাতির শিখা একেবারে স্থিরভাবে জ্বলছে। অল্প অল্প করে মোম গ'লে বাতির গা বেয়ে গড়িয়ে বেতের বুনুনির ওপর জমা হচ্ছে। একটা ফড়িং জাতীয় পোকা ঘরের ভিতরে ছিল, সেটা বাতির শিখার চারিদিকে পাক খেতে আরম্ভ করল।

কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না। সত্যি

বলতে কী, দু'-এক বার যে আড়চোখে ডক্টর বৈদ্যর দিকে চেয়ে দেখিনি, তা নয়—কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি, কারণ তাঁর চোখ বন্ধ।

হঠাৎ—যেন অনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে—এইভাবে চিঁ চিঁ করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল—'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ?'

ফেলুদা বলল, 'শেলভাঙ্কার কি অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিল ?'

আবার সেই চিঁচিঁ গলায় উত্তর এল—'নো।'

'তা হলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি ?'

কিছুক্ষণ সব চুপ। এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথা পিছন দিকে হেলানো। হেলমুট দেখলাম তার নীল নিষ্পলক চোখে ডক্টর বৈদ্যকে দেখছে। নিশিকান্তবাবুর কুতকুতে চোখও তাঁরই দিকে।

ঘরে হঠাৎ এক ঝলক নীল আলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এবার আরও পরিষ্কার গলায় উত্তর এল---

'মার্ডার।'

'ম্যার্ডার !' এটা নিশিকান্তর গলা—শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে। কথাটা একটানা বলতে পারলেন না ভিনি। বললেন, 'মা-হা-হারা-ডার !'

'কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি ?' আবার ফেলুদাই প্রশ্ন করল।

আমার বুকের ভিতরে অসম্ভব ঢিপঢিপানি আরম্ভ হয়েছে। নিশিকান্তবাবুর মতো আমারও গলা শুকিয়ে এসেছে। নেহাৎ কথা বলতে হচ্ছে না বলে, না হলে আমিও ধরা পড়ে যেতাম।

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ। ফেলুদা দেখলাম একদৃষ্টে ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে। ভদ্রলোক কয়েকবার খুব জোরে জোরে—যেন বেশ কষ্ট করে—নিশ্বাস নিলেন। তার পর উত্তর এলো—'বীরেন্দ্র।'

বীরেন্দ্র ? সে আবার কে ?

ফেলুদাও নিশ্চয়ই এটা জানতে চাইত, কিন্তু ডক্টর বৈদ্য হঠাৎ

তাঁর হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চোখ খুলে বললেন, 'এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ।'

হেলমুট মোড়া থেকে উঠে গিয়ে তার টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে বৈদ্যকে দিল। ভদ্রলোকের জল খাওয়া শেষ হলে পর ফেলুদা বলল, 'বীরেন্দ্র যে কে, সেটা বোধ হয় জানার কোনও সম্ভাবনা নেই ?'

উত্তর এল হেলমুটের কাছ থেকে।

'বীরেন্দ্র মিস্টার শেলভাঙ্কারের ছেলের নাম ! আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয়—অনেকবার।'

জানালা খুলে দিতে গিয়ে দেখি, বাইরে ইলেকট্রিকের আলো দেখা যাচ্ছে ! হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল, কারণ ও সুইচ টিপে দিল, আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। আমরা সকলেই উঠে পড়লাম।

ডক্টর বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে।'

নিশিকান্তবাবু একটু হেঁ হেঁ করলেন।

'যাক্ গে' ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'মনে হয় আপনার ফাঁড়া কেটে গেছে।'

'ওঃ !' আহ্লাদে হাঁফ ছেড়ে নিশিকান্তবাবু তাঁর সব কটা দাঁত বার করে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ক' দিন আছেন ?'

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'কাল দিনটা ভাল থাকলে পেমিয়াংচি যাবার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।'

'আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করছেন ?'

প্রাচীন সভ্যতা বলতে তো ওই একটিই বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া—এ সব তো বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে কী আছে বলুন—সবই পাঁচমেশালি। যা ছিল তিব্বতেই ছিল—একেবারে খাঁটি অবস্থায়—এই সে দিন পর্যন্ত। এখন তো আর তিব্বতে যাবার কোনও মানে হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরানো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে।'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন।

'নুন?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই।'

৮

আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়—বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দু' বেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নলি-হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ডিসেন্ট লোক মশাই।'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কি রকম সব বলে-টলে দিলে।'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার তো ভাল লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে—আর কী চাই!'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায়, তা হলে হবে নিশ্চয়ই। এখনও তো সে স্টেজে পৌঁছায়নি। এমনিতে এ সব লোকের উপর চট্ করে

সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে।'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন।

'নুন?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই!'

৮

আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়—বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দু' বেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নল্লি-হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ড্রিসেন্ট লোক মশাই!'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কি রকম সব বলে-টলে দিলে।'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার তো ভাল লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে—আর কী চাই!'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায়, তা হলে হবে নিশ্চয়ই। এখনও তো সে স্টেজে পৌঁছয়নি। এমনিতে এ সব লোকের উপর চট্ করে

শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। এত বুজরুকের দল আছে এ লাইনে।'

কিন্তু সত্যিকার গুণী লোকও তো থাকতে পারে ; এঁর কথাবার্তার স্টাইলই আলাদা। শুনলেই ইমপ্রেস্‌ড হতে হয়। আর যদি ধরুন গিয়ে মার্ডার হয়েই থাকে...'

ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল ; কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না। হয়তো মনের মধ্যে কোনও খটকা রয়েছে। এত ভাল মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যেতে চাইছে না।

'মার্ডারের কথা যে বললেন উনি, সেটা আপনার বিশ্বাস হয় ?' নিশিকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'হয়।'

'হয় ?'

'হয়।'

'কেন বলুন তো।'

'কারণ আছে।'

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা।

খাবার পরে কালকের মতোই দুজনে পান কিনতে বেরোলাম। বৃষ্টি এখনও নামেনি, তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু-একজন নতুন লোককে হাঁটতে দেখলাম। তারা সবাই বিদেশী, বোধ হয় আমেরিকান। এ সব বিদেশী টুরিস্টরা সাধারণত এসে 'নরখিল' বলে একটা হোটেলে থাকে ; ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল।

ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ থেমে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন আছে, সেরে ফেলি গে। তুই বরং এক কাজ কর। কাছাকাছির মধ্যে একটু ঘুরে আয়। আমি আধঘন্টা আনডিস্টার্বড কাজ করতে চাই।'

ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল। ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে বা সাহস কোনওটাই আমার নেই—বিশেষ করে তদন্তের এই জট-পাকানো অবস্থায়।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই বেশি। হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ দোকানের সামনে কয়েকটা নেপালি গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে। মাঝে মাঝে ঘুঁটি নাড়ার শব্দ আর তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন। তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগ্‌গির আসবে। ধীরে ধীরে তোড়জোড় চলেছে, নামবে গিয়ে হয়তো সেই মাঝরাত্রে।

রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই, আর উপর দিক থেকে পড়ে বলে চেনা লোকের মুখ চিনতে সময় লাগে।

উল্টো দিক থেকে কে যেন আসছে। এখনও প্রায় বিশ-ত্রিশ গজ দূরে। এবার একটা আলোর তলায় এসে পড়াতে মাথার ব্রাউন চুলগুলো চক্‌চক্ করে উঠল।

পরের আলোটায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম হেলমুটকে। সে অন্যমনস্ক ভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে।

এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট। তার ভুরু কুঁচকানো, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল, অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না।

আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর ক্রমে-ছোট-হয়ে-যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম।

ঘরে এসে দেখি, ফেলুদা বুকের উপর খাতা খুলে হয়ে খাটে শুয়ে আছে। বললাম, 'আধঘন্টা হয়ে গেছে ফেলুদা।'

ফেলুদা বলল, 'সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।'

আমি বললাম, 'ধীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার যে সাসপেক্ট, সেটা তো আগেই জানতাম। শুধু নামটা জানা ছিল না। ডক্টর বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'লোকটা ভেলকি দেখিয়েছে

ভালই। অবিশ্যি, এমন ভেল্‌কি যে সম্ভব নয় তা বলছি না। আর আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে, বৈদ্যর শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলভাঙ্কার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল, সেটা না জানা অবধি এই বৈদ্যটি ভণ্ড-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য সেটা জানা যাবে না।'

'কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।'

'জলের মতো সোজা। নিশিকান্ত যে-রেটে নখ কামড়াচ্ছিল, তার নার্ভাসনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।'

'আর মার্ডার ?'

'মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এসেনশিয়ালি নাটুকে। অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় পছন্দ করে, লোককে চমকে দিতে ভালবাসে। এটা মানুষের অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা।'

'তা হলে সাস্‌পেক্ট কাকে কাকে বলতে হয় ?'

'যথারীতি সকলকেই।'

'ডক্টর বৈদ্যও ?'

'হোয়াই নট ? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।'

'আর হেলমুট ?' আমি হেলমুটের ঘটনাটা বললাম।

ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হল না। বলল, 'হেলমুটও যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি। ও বলছে প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার, সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে, অথচ রুমটেকে যে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই তো খট্‌কার কারণ রয়েছে।'

'তার মানে কী হতে পারে ?'

'তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও একটা কারণ রয়েছে, যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।'

ফেলুদা আরও কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল। আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না। আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু কোনওটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি। একবার মনে

হল ফেলুদার পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ও একা কেন সমস্ত ব্যাপারটা ঘাড়ে নিচ্ছে ? শেলভাঙ্কারকে যে-ই খুন করুক না কেন, সে যে একটা ডাকসাইটে ক্রিমিন্যাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে, আর ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে ? কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, পুলিস যদি ফেলুদার আগে খুনীকে ধরে ফেলে, তা হলে সেটা আমার মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একাই করুক। যদি ও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে, তা হলে ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যাবে।

পৌনে এগারটার সময় নিশিকান্তবাবু দরজায় টোকা মেরে 'গুড নাইট' করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম। জুল ভার্নের 'কার্পেথিয়ান কাস্‌ল'। জানি খুব ইন্টারেস্টিং বই, কিন্তু তাও মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে চোখ বুজলাম। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি, ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে।

মনে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক না কেন—রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি। সকালে যখন উঠেছি, তখন জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে। ফেলুদা ঘরে নেই—বোধ হয় স্নান করতে গেছে।

যেখানেই যাক—যাবার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা কাগজ অ্যাশ-ট্রে চাপা দিয়ে রেখে গেছে—বোধ হয় আমারই দেখার জন্য।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—আমাদের চেনা একটা তিব্বতি কথা—যার মানে হল মৃত্যু।

৯

আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি। ও খুব ভোর থাকতে উঠে নীচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে। বম্বেতে ট্রাঙ্ক-কল। আমি স্নান-টান সেরে নীচে গিয়ে দেখি, ফেলুদা

টেলিফোনে কথা বলছে। শেষ হলে পর জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?' ও বলল, 'শশধরবাবু বম্বেতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বোধ হয় এখানেই আসছেন। আমার আগের টেলিগ্রামটাতে হয়তো কাজ হয়েছে।'

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

এক্সপেরিমেন্টটা কী, সেটা আর আগে থেকে জিগ্যেস করতে সাহস হল না। কোথায় সেটা হবে জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। নিরিবিলি ঘর হলে হবে কিনা জিগ্যেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল, 'তোর মুণ্ডু! ঘর তো হোটেলেই রয়েছে। চাই একটা রাস্তা, যেখানে লোকজনের ভিড় নেই। কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে।'

সত্যি বলতে কি, এই দু' দিনে গ্যাংটকের একটামাত্র রাস্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি। তাই একটু হেঁটে বেড়াবার ছুতো পেয়ে ভালোই লাগছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রোদের বেশ ঝাঁঝ, তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পরেছেন। বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা ?'

ফেলুদা বলল, 'শহরটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাব—প্যালেসের ও দিকে।'

'আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে। আজ দিনটা ভাল আছে। এ গুড ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি। আপনারা না এলে কিন্তু একটা খুব ভাল জায়গা মিস্ করবেন।'

'যাবার তো ইচ্ছে আছে।'

'আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন। গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক ?'

ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুখোড় আছেন বাবাজী। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি, ও-ও তেমনই উল্টে আমাকে সন্দেহ করছে। হয়তো বুঝে ফেলেছে যে, আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'কিন্তু তোমাকে তো সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা। খাটের উপর কাগজটা দেখলাম যে।'

'এটা কি নতুন জিনিস হল?'

'তা অবিশ্যি নয়।'

'তবে! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, ওই একটা তিব্বতি কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব, তা হলে তুই ফেলু মিত্তিরকে এখনও চিনিসনি।'

মুখে সেটা না বললেও, মনে মনে বললাম যে, যদি কেউ ফেলু মিত্তিরকে চেনে তবে সেটা আমিই। বাদশাহী আংটির ব্যাপারে হুমকি সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেলুদা, সেটা তো আমি দেখেছি।

চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় দার্জিলিং-এর ম্যালের মতো—খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। সেটার মাঝখানে একটু নীচে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে। আবার সেটার মাঝখানে একটা হলদে কাঠের পোস্টে এদিকে-ওদিকে পয়েন্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে। ডান দিকে যে ফলকটা পয়েন্ট করা, তাতে লেখা রয়েছে 'প্যালেস'। ডান দিকে চেয়ে দেখলাম, দু ধারে গাছের সারিওয়ালা একটা সোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা বাহারের গেট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, ওটাই হল প্যালেসের গেট।

বাঁ দিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে 'নাথুলা রোড।' আশেপাশে কোনও লোকজন নেই। দূরে প্যালেসের রাস্তায় কালকের দেখা বিদেশী টুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে পায়চারি করছে।

ফেলুদা বলল, 'লক্ষণ ভালই। চ' বাঁদিকে চ'।'

যে নাথুলা রোড দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাওয়া যায়, সেটা দিয়ে আমি আর ফেলুদা এগিয়ে চললাম এক্সপেরিমেন্টের

উদ্দেশ্যে। রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে। ফেলুদা বাঁ দিকের খাড়াই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে। এ দিকটা শহরের পুব দিক। কাঞ্চনজঙ্ঘা হল পশ্চিম দিকে। এ দিকে বরফ দেখা যায় না, তবে নীচে বহু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখা যায়। আর-একটা জিনিস বেটা দেখা যায়, সেটা হল রোপ-ওয়ে। শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে ঝুলন্ত গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাড়ের এ মাথার এক স্টেশন থেকে ও-মাথার আর-এক স্টেশনে।

রোপ-ওয়ে দেখতে এত ভাল লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম ডাকটা শুনতেই পাইনি। তার পর শুনলাম, 'অ্যাই তোপ্‌সে—এদিকে আয়!'

পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে উঠে গেছে ফেলুদা, আর সেখান থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমিও উঠে গেলাম। ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে—সাইজে সেটা একটা পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মতো।

'এই পাথরের পাশে দাঁড়া।'

দাঁড়ালাম। এ রকম বাধ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনও গোয়েন্দা কখনও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না!

'আমি যাচ্ছি নীচে। ও দিক থেকে এ দিকে হেঁটে যাব। আমি যখন বলব, তখন তুই পাথরটা ঠেলে নীচের দিকে গড়িয়ে দিবি। যেভাবে রয়েছে পাথরটা, বুঝতেই পারছিস একটা ঠেলা দিলেই ওটা নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে। পারবি তো?'

'জলের মতো সোজা।'

ফেলুদা নীচে নেমে যে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিকটায় চলে গেল। তার পর শুনতে পেলাম ওর হাঁক—'রেডি?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম 'রেডি'—আর তার পরেই পেলাম ফেলুদার পায়ের আওয়াজ।

আমার লাইনে আসার আট-দশ পা আগেই ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল—'গো!' আমি পাথর ঠেলে দিলাম। ফেলুদা হাঁটা থামাল না। দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই ফেলুদা

তার অন্তত দশ-পা সামনে এগিয়ে চলে গেছে।

'দাঁড়া!'

ফেলুদা ফিরে এল, সঙ্গে পাথর।

'এবার তুই নীচে যা। তোকে হাঁটতে হবে। হাঁটা থামাবি না। আমি পাথর ফেলব। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাগ করে আসছে—হয়তো তোর গায়ে এসে লাগবে—তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি তো?'

'জলের মতো সোজা।'

এবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম—আড়চোখ পাহাড়ের দিকে। ফেলুদা খুব হিসেব করে জিভটিভ কামড়ে একটা বিশেষ টাইমে পাথরটাকে মারল ঠেলা। আমি থামলাম না। লাফিয়ে পাশ কাটানোরও দরকার হল না। পাথর আমি পৌঁছনোর আগেই রাস্তায় পড়ে দুটো পাক খেয়ে ডান দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে চলে গেল।

ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কী আর করি—আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'কী মূর্খ আমি! কী মূর্খ! এই সহজ—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত পাশে সরিয়ে আনলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাঁই এক সেকেন্ড আগে যেখানে ফেলুদা ছিল, সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তছনছ করে দিয়ে, রাস্তায় একবার মাত্র ঠোক্কর দিয়ে পিছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদা 'জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ নয়' বলে আমার হাত ধরে টেনে একেবারে রাস্তায়। তার পর দুজনে আর টুঁ শব্দটি না করে পা চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। একটা মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল। ফেলুদা খালি একবার মৃদুস্বরে বলল, 'থ্যাঙ্কস্, তোপ্‌সে।' তার দিকে চেয়ে দেখি, সে গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার মনের যে কী

অবস্থা, সে আর বলে কাজ নেই।

কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল। অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের মতো দেখতে। আমরা তার ভিতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে হাঁপ ছাড়লাম। ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল—

'কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?'

বললাম, 'না। অনেক উঁচু থেকে পাথরটা এসেছিল। আমি যখন দেখেছি, তখনই তার ভেলোসিটি অনেক।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে একটা টান দিয়ে বলল, 'আর ঢিলেঢালা ভাব চলবে না। একটা কুইক্ এস্পার-ওস্পার হওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু অনেক প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা।'

'কে বললে তোকে?' ফেলুদা খেঁকিয়ে উঠল। 'কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আড়াইটে। ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না। এক্সপেরিমেন্ট সাক্সেসফুল। যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু সেটাকে অ্যাক্সিডেন্টের চেহারা দেবার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল। মিস্টার শেলভাঙ্করকে অজ্ঞান করা হয়েছিল আগেই। তার পর তাকে জিপ সমেতো খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, তার পর সব-শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।'

'কিন্তু তা হলে...ড্রাইভারটা যে...'

'ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।'

'কিংবা ড্রাইভার তো নিজেই খুন করে থাকতে পারে?'

'না। কারণ, মোটিভ কী? তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 463।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় SKM 463-এর খোঁজ করে তাকে পাওয়া গেল না। সে গাড়ি কাল রাত্রেই নাকি শিলিগুড়ি চলে গেছে।

'আসলে কী জানিস, জিপটা নতুন বলে সকলেরই চোখ ওটার উপর। ওটা তাই আর বসে থাকে না।'

'তা হলে আমরা কী করব?'

'দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

জিপ-স্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম। ডাইনিং রুমে বসে বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। ফেলুদার চোখ লাল, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে বার বার ব্যর্থ ঘুঁষি মারছে।

'কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?' সে হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'চোদ্দই এপ্রিল।'

'চোদ্দই না পনেরই?'

'চোদ্দই। তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা—সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ—'

'ইয়েস ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?'

'এগারোই।'

'সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডক্টর বৈদ্য।'

'আর বীরেন্দ্র।'

'ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি প্রাইটেক্স ভুল করেনি। আচ্ছা...নিশিকান্তবাবুর জানালা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল?'

'যে দিন আমরা এসেছি, সে দিনই রাত্রে।'

'চোদ্দই রাত্রে। গুড। সে সময় কে কে ছিল শহরে?'

'হেলমুট, শশধর, ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র, আর...আর...'

'নিশিকান্ত।'

'নিশিকান্ত তো থাকবেই।'

'শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে, তা হলে নিজের উপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে, নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে

'হেল্‌প' বলে চিৎকার করতে পারে।'

'কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু ?'

'সেটা এখনও জানি না। খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে হয় না। লোকটা নেহাতই ভিতু, আর সেটা অভিনয় নয়।'

'তা হলে আর কেউ বাকি রইল কি ?'

'ডক্টর বৈদ্য! ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না! তিনি কবে কালিম্পঙ গেছেন, বা আদৌ গেছেন কি না—সেটা তো আমরা জানি না! ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি, তার গ্যারান্টি কী ?'

ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ করে বলল, 'একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই—কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জিপে গ্যাংটক এসেছেন, এবং পরদিন বম্বে ফিরে গেছেন। ফিরে যে গেছেন, সেটা তাঁর বাড়ির লোকেরা টেলিফোনে কনফার্ম করেছে। অবিশ্যি এখন তিনি বম্বেতে নেই। একটা চাপ আছে, হি ইজ অন হিজ ওয়ে হিয়ার। মনে হচ্ছে পেমিয়াংচিটা—'

ফেলুদা কথা থামাল। বাইরে থেকে একজন লোক এসে হোটেলের ভিতর ঢুকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা আমাদের জার্মান হিপি হেলমুট উঙ্গার! ম্যানেজারকে কী জিগ্যেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

'ওঃ—তোমরা এখানেই আছ ? আমি দেখতেই পাইনি'

আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেলমুটের যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলল, 'একটা জরুরী আলোচনা ছিল। তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কি ?'

১০

ঘরে এসে ঢোকার পর হেলমুট বলল, 'মে আই ক্লোজ দ্য ডোর ?' তার পর নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার বুকের ভিতরে টিপ টিপ। বিরাট লম্বা লোক—ফেলুদার

চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি। তার উপর জার্মান। এ ছাড়া শুনেছি হিপিরা নানা রকম নেশা করে। আর বিদেশীদের সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল গোছের জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। যদি কোনও বদ মতোলবে এসে থাকে লোকটা ?

ফেলুদা হেলমুটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

'কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা-কফি কিছু চলবে ?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

হেলমুট কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার উপর রেখে বগলদাবা করা আগ্‌ফা কোম্পানির একটা বড় লাল খামের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বলল, 'তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। এগুলো কালার নেগেটিভে তোলা। এখানে প্রিন্ট হয় না, তাই দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছিলাম। আজই সকালে এনলার্জমেন্টগুলো হয়ে এসেছে।'

হেলমুট একটা ছবি বার করল।

'এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা। অ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে হয়, সেখান থেকে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে উল্টোদিকের পাহাড়ে চলে গেছে। সরু ফিতের মতো রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায়। আমি ছবিটা তুলেছি ওই উল্টোদিকের রাস্তা থেকেই। গ্রাম, নদী আর দশ কিলোমিটার দূরে সিকিমের খানিকটা অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় ওখান থেকে। কথা ছিল শেলভাঙ্কার গুম্ফা যাবার পথে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছ অবধি পৌঁছায়নি। ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সে দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই, যেটা আমি আমার টেলি ফটো লেন্স দিয়ে তুলে রাখি।

আশ্চর্য ছবি। এত দূর থেকে তোলা সত্ত্বেও মোটামুটি সবই বেশ বোঝা যাচ্ছে। একটা জিপ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার কিছু উপরে রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে পড়ন্ত জিপটার দিকে দেখছে। এটা বোধ হয় ড্রাইভারটা। মুখ চেনার উপায় নেই, কিন্তু সে যে নীল রঙের জামা পরা রয়েছে, সেটা

বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও লোক ছবিটাতে নেই।

এবার হেলমুট আর-একটা ছবি বার করল। এটা আগেরটার কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা। এটা আরও অদ্ভুত ছবি। এটার তলার দিকে দেখা যাচ্ছে, জিপটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ডান পাশে কিছু উপরে একটা ঝোপের পিছনে একটা কালো স্যুটপরা লোকের খানিকটা অংশ মাটিতে শোওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবির উপর দিকে রাস্তায় ড্রাইভারটা। এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন করে মাথা উঁচু করে উপর দিকে দেখছে। ছবির একেবারে উপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আর-একজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে; তারও মুখ চেনার কোনও উপায় নেই, কিন্তু গায়ের জামার রঙ লালচে। সে একটা বড় পাথরের পিছনে উপুড় হয়ে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না; নীল জামা পরা লোকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে ছবি থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে গেছে; গাড়ি আর কালো স্যুট পরা লোকটা যেমন ছিল তেমনই আছে। আর পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা ছিল, সেটা পড়ে আছে রাস্তার উপর, একটা গাছের পাশে।

'রিমার্কেবল', ফেলুদা বলে উঠল, 'অদ্ভুত ছবি। এ রকম ছবি আমি কমই দেখেছি।'

'এ রকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়', হেলমুট বলল।

'তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে?'

'গ্যাংটকে ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম—হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছানোর আগেই শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে শুধু পাথর আর ভাঙা জিপ দেখেছি। গ্যাংটকে ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েছি, আর পেয়েই সোজা হাসপাতালে চলে গেছি। আমি যাবার পরেও শেলভাঙ্কার ঘন্টা দু'-এক বেঁচে ছিলেন।'

'তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলোনি?'

'বলে কী লাভ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে, ততক্ষণ

তো সেটাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে! অথচ আমি সেই মুহূর্ত থেকেই জানি ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, জানি যে জিনিসটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন। আরও কাছ থেকে তুললে অবিশ্যি খুনীর চেহারাটাও বোঝা যেত। কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেটা সম্ভব ছিল না।'

ফেলুদা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তা হলে বীরেন্দ্র?'

'ইম্পসিবল!' দৃঢ় গলায় বলে উঠল হেলমুট।

আমরা দুজনেই রীতিমতো অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম।

'মানে?' ফেলুদা বলল। 'তুমি অত শিওর হচ্ছ কী করে?'

'কারণ আমিই হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার।'

ফেলুদার চোখ ছানাবড়া হতে এই প্রথম দেখলাম।

'তুমি বীরেন্দ্র মানে? তোমার চুল কটা, তোমার চোখ নীল, তোমার ইংরিজিতে জার্মান টান...'

'ভেরি সিম্পল!' হেলমুট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'আমার বাবা দু' বার বিয়ে করেন। আমি প্রথম স্ত্রীর সন্তান। আমার মা ছিলেন জার্মান। বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখনই আলাপ, আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন। মা-র নাম ছিল হেল্গা। বিয়ের আগের পদবি ছিল উঙ্গার। আমি যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি গিয়ে সেট্ল করি, তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুট নামটা নিই, আর মা-র পদবিটা নিই।'

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সত্যিই তো—জার্মান স্ত্রী হলে ছেলের চেহারা সাহেবদের মতো হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

'বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'মা মারা যাবার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। বাবার উপরেও টান ছিল, কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা কেমন যেন বিগড়ে গেল। বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এল মনে। তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলাম। বহু কষ্ট করে, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপে পৌঁছাই।

গোড়ায় কয়েক বছর কুলিগিরি থেকে এমন কোনও কাজ নেই, যা করিনি। প্রায় সাত-আট বছর এইভাবে কষ্টে কাটে। তার পর ছবি তুলতে শিখি। ভাল ফটোগ্রাফার হিসাবে নামও হয়। অনেক পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশের ছবি ছাপা হয়। বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে ছবি তুলছিলাম, সেখানে হঠাৎ বাবার এক বন্ধুর সামনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে চিনে ফেলেন, আর তিনিই বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান। তার পর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য। সেই থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করি, আর আমার চোখের মণির রঙটাও বদলে ফেলি।'

'কনট্যাক্ট লেনস?' ফেলুদা বলে উঠল।

হেলমুট একটু হেসে তার দুই চোখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে পাতলা লেনস খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মতো কালো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই আবার লেনস দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল—

'বছর খানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে আসি। দেশের উপর থেকে টান আমার কোনও দিনও যায়নি। আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এই খোঁজার ব্যাপারে। কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে একটা মনাস্টেরিতে ছিলাম। যখন দেখলাম সেখানেও পিছনে টিকটিকি ঘুরছে, তখন সিকিমে চলে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হননি?'

'আমাকে চিনতেই পারেননি। আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি অনেক। তার উপরে আমার লম্বা চুল, আমার গোঁফ-দাড়ি, আমার চোখের নীল রং—এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি নিজের ছেলেকে চিনতেই পারলেন না। আমার কাছে বসে তিনি বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটা চলে গিয়েছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে। কিন্তু

যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না, তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো দিতাম, কিন্তু তার আর সুযোগ হল কই?'

'খুনী কে, এ-সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'ফ্র্যাঙ্কলি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মতে ডক্টর বৈদ্যকে কোনও মতেই পালাতে দেওয়া উচিত নয়।'

ফেলুদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমতো।'

হেলমুট (নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত?) বলল, 'ও তো জানে না আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটাই করে দিল। আর যে-মুহূর্তে নামটা করল, সেই মুহূর্তেই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমার মতে লোকটা এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান। ও ই খুন করেছে। এবং ও-ই মূর্তিটা নিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'সে দিন শেলভাঙ্কার যখন গুম্ফাটা দেখতে যান, উনি কি একাই যান?'

'সেটা বলতে পারি না। আমি তো অনেক সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অবিশ্যি ডক্টর বৈদ্য তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে গাড়িতে উঠে থাকতে পারেন। সন্দেহ-বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।'

ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পেমিয়াংচি যাবে?'

হেলমুট দৃঢ়স্বরে বলল, 'বাবাকে যে খুন করেছে, তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি।'

'এখান থেকে কত দূর জানো জায়গাটা?'

'একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি। হয়তো সামান্য বেশিও হতে পারে।'

'তার মানে ছ'-সাত ঘন্টার ধাক্কা।'

'রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেতে পারে। আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ফেলুদা বলল, 'আমারও তাই মতো। আমি একটা জিপের ব্যবস্থা দেখছি। জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি না নেওয়াই ভাল।'

'তুমি জিপ দেখো, আমি ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে---' হেলমুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরে বলল, 'লোকটা যে-পরিমাণে ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এ দিকে আমার কাছে তো ফ্লাশ-গান ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমাদের কাছে—'

হেলমুটের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে দিল।

'আর এই যে আমার কার্ড।'

ফেলুদা তার 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা ভিজিটিং কার্ডের একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন আর কোনও জিপ ভাড়া পাওয়া গেল না। যে ক'টা ছিল, সবগুলো আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারা দিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। আগামীকাল সকালের জন্য জিপের ব্যবস্থা করে বেশির ভাগ দিনটাই হেঁটে গ্যাংটক শহর দেখে কাটিয়ে দিলাম। দুপুরে বাজারের দিকটায় নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে পেমিয়াংচির কথা বলতে তিনি অবিশ্যি লাফিয়ে উঠলেন।

সন্ধের দিকে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে আমাদের দেখালেন। হাতখানেক লম্বা একটা লাঠি, তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট একটা কাপড়ের থলি।

'কী জিনিস বলুন তো এটা', একগাল হেসে জিগ্যেস করলেন নিশিকান্তবাবু। 'জানেন না তো? এই থলের ভিতর আছে নুন আর

তামাকপাতা। পায়ে যদি জোঁক ধরে, এই থলির একটা ঘষাতেই বাবাজী খসে পড়বেন।'

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'নাইলনের মোজা ভেদ করেও জোঁক ঢোকে নাকি ?'

'কিছুই বিশ্বাস নেই মশাই। গেঞ্জি, শার্ট আর ডবল পুলওভার ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁককে। আর মজা কী জানেন তো ? ধরুন, লাইন করে একদল লোক চলেছে জোঁকের জায়গা দিয়ে। এখন, জোঁকের তো চোখ নেই—জোঁক দেখতে পায় না—মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনও প্রাণী আসছে। লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে, তাকে জোঁক অ্যাটাক করবে না—কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে। দ্বিতীয় লোকের বেলা তারা মাথা উঁচিয়ে উঠবে, আর থার্ড যিনি রয়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নেই—তাঁকে ধরবেই।'

ঠিক হল আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক-ছাড়ানো লাঠি সঙ্গে নিয়ে নেব।

শুতে যাবার আগে ফেলুদা বলল, 'দু দিন বাদেই বুদ্ধ-পূর্ণিমা—এখানে উৎসব হবে।'

'সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব ?' আমি ধরা গলায় জিগ্যেস করলাম।

'জানি না। তবে তার চেয়েও অনেক বড় পুণ্য কাজ হবে, যদি আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে কব্জা করতে পারি।'

সারা রাত আকাশ পরিষ্কার ছিল, আর আমাদের জানালা দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি, ফেলুদা, হেলমুট আর নিশিকান্ত সরকার সামান্য জিনিসপত্র, চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলের তৈরি দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক-ছাড়ানো লাঠি নিয়ে 'দুগ্‌গা' বলে পেমিয়াংচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে—একটা কিউশিং হয়ে, আর-একটা নামচি দিয়ে নয়া বাজার হয়ে। কিউশিং-এর রাস্তা দিয়ে গেলে দূরত্ব কম হয়, কিন্তু গত ক' দিনের বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমাদের নয়াবাজার দিয়েই যেতে হবে। একশো সাতাশ মাইল পথ। এমনিতে হয়তো দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হত, কিন্তু আমরা হোটেল থেকে লুচি, আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে নিয়েছি। তা ছাড়া দুটো ফ্লাস্কে রয়েছে জল, আর দুটোতে গরম কফি ; কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না। সাবধানে গেলেও ঘন্টা আটেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। তাই মনে হয়, বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পৌঁছে যাব। হেলমুট দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি, আর নিশিকান্তবাবু দেখি কোত্থেকে একজোড়া চামড়ার গোলোস জুতো সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'ভেবে দেখলাম, জোঁক যদি পায়ের পিছন দিকে ধরে, তা হলে তো আর দেখতে পাব না ! নুনের থলি কোন্ কাজটা দেবে মশাই ? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল—সেন্ট পারসেন্ট সেফসাইড।'

'যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে জোঁক ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন। 'ম্যাক্—মানে ম্যাক্সিমাম জোঁকের টাইম এটা নয়। সেটা আরও পরে—জুলাই আগস্টে। এখন বাবাজীরা সব মাটিতেই থাকেন।'

নিশিকান্তবাবুকে বলা হয়নি যে, আমরা খুনীর সন্ধানে চলেছি। উনি জানেন, আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন। ওখানে গোলা-গুলি চললে যে ওঁর কী দশা হবে তা জানি না।

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা সিংথাম পৌঁছে গেলাম। এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল। বাজারের মধ্য দিয়ে রাস্তা গেছে। বেশ গিজগিজে ছোট শহর, তিস্তার পাশেই। আমরা

বাঁ দিকে ঘুরে তিস্তার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ে উঠলাম। এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে আমাদের কাছে নতুন।

আমাদের জিপটা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরনো নয়। স্পিডোমিটার, মাইলোমিটার, দুটোই এখনও কাজ করছে, সিটের চামড়া-টামড়াও বিশেষ ছেঁড়েনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার মতো। লোকটা বোধ হয় নেপালি নয়, কারণ নেপালিরা সাধারণত বেঁটে হয়—এ রীতিমতো লম্বা। কালো প্যান্ট, কালো চামড়ার জার্কিন, আর কালো শার্ট পরেছে। শার্টের বোতাম গলা অবধি লাগানো। মাথায় একটা ক্যাপ পরেছে, সেটার রঙও প্রায় কালোই। আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এ রকম চেহারার লোক দেখা যায়। ফেলুদা ওর নাম জিগ্যেস করাতে বলল, 'থোণ্ডুপ'। নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, 'তিব্বতি নাম'।

ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম, এ দিকের দৃশ্য একেবারে অন্য রকম। গাছপালা অনেক কম, আর মাটিটা লালচে আর শুকনো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিহারের কোনও পাহাড়ি জায়গা দিয়ে চলেছি। এক-এক জায়গায় রাস্তা খুবই খারাপ—আর তার মানেই সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে। নেপালি ছেলে-মেয়ের দল হয় পাথর সরাচ্ছে, নাহয় পাথর ভাঙছে, নাহয় মাটি ফেলছে। এই দু দিনে নেপালি মেয়েদের দেখে কী করে চিনতে হয়, সেটা ফেলুদার কাছে শিখে নিয়েছি। এদের কানে মাকড়ি, নাকে নথ আর গলায় মোটা হাঁসুলি। অবিশ্যি সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না বললেই চলে। অবিশ্যি পোশাকেও তফাত আছে।

গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষট্টি মাইল। আমি মাইল পোস্টের দিকে চোখ রাখছিলাম। বাইশ মাইল পেরোনোর কিছু পরেই কানে একটা শব্দ এল। পিছন থেকে একটা জিপ বার বার হর্ন দিচ্ছে। থোণ্ডুপ কিন্তু পাশ দেবার কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে কেবল আমাদের গাড়ির স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল। ফেলুদা বলল, 'ও

গাড়ির এত তাড়া কিসের ?'

থোণ্ডুপ বলল, 'হর্ন দিক ও। ওকে এগোতে দিলে আপনাদের ধুলো খেতে হবে।'

সে দিনের মতোই ফেলুদা আর আমি সামনে বসেছিলাম, আর পিছনে হেলমুট আর নিশিকান্ত। আমরা স্পিড বাড়ানো সত্ত্বেও পিছনের জিপটা বার বার এগিয়ে আসছে আর হর্ন দিচ্ছে, এমন সময় নিশিকান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,—'আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক!'

'কোন্ ভদ্রলোক?' বলে ফেলুদা পিছনে ফিরল, আর সেই সঙ্গে আমিও।

ও মা—এ যে শশধরবাবু! আমাদের পিছনে ফিরতে দেখে আবার গ্যাঁ গ্যাঁ করে হর্ন, আর শশধরবাবুর মরিয়া হয়ে হাত নাড়া।

ফেলুদা বলল, 'জারা রোক দিজিয়ে থোণ্ডুপজী—পিছনে চেনা লোক।'

আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনেরটাও থামল, আর শশধরবাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন।

'আপনারা তো আচ্ছা লোক মশাই—সিংথামে এত্ত চেঁচালুম, আর শুনতেই পেলেন না!'

ফেলুদা অপ্রস্তুত। বলল, 'আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি?'

'তা আপনি যে রকম টেলিগ্রাম করলেন, তাতে কি আর ওখানে বসে থাকা যায়? আমি সেই তখন থেকে ফলো করছি আপনাদের।'

পিছনে থাকলে যে কি রকম ধুলো খেতে হয়, সেটা শশধরবাবুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে ভদ্রলোক একেবারে ভস্মমাখা সাধুবাবা হয়ে যেতেন।

'কিন্তু ব্যাপার কী? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সে সব ছেড়েছুড়ে এখন এ দিকে কোথায় চলেছেন?'

ফেলুদা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে মালপত্তর কি অনেক?'

'মোটেই না। কেবল একটা সুটকেস।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে চলুক; ওতে বরং আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিই। আপনি আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন তো?'

'নিশ্চয়ই!'

জিপ চলতে চলতে ফেলুদা গত দু' দিনের ঘটনাগুলো শশধরবাবুকে বলল: এমন কি হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে দিল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাট হু ইজ দিস ডক্টর বৈদ্য? শুনেই তো ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনে এ সব বুজরুকির প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ওর হাবভাব দেখেই ওকে সোজাসুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল আপনাদের। সেটা না করে আপনারা ওকে পেমিয়াংচি পালাতে দিলেন? সত্যি, আপনাদের কাছ থেকে—'

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'হেলমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই তো ওর উপর সন্দেহটা গেল। আর আপনার দিক থেকেই খানিকটা গলতি হয়েছে শশধরবাবু। আপনি তো একবারও বলেননি, শেলভাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।'

শশধরবাবু বললেন, 'আরে সে কি আজকের কথা মশাই? তাও জার্মান বলে জানতুমই না। বিদেশী, এইটুকুই শুনেছি। শেলভাঙ্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে।... আই হোপ, বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি! না হলে এই এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে।'

নামচি পৌঁছালাম ন'টার কিছু পরে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে; তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে: এটা নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা। তা ছাড়া সুন্দরও বটে, আর আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও আমরা মিনিট দশেকের বেশি থামলাম না। যেটুকু থামা, সেটুকু শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠাণ্ডা জল, আর আমাদের পেটে একটু গরম কফি ঢালার জন্য। হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল।

লক্ষ করলাম, সে কথা-টথা বিশেষ বলছে না। ছবিটা তোলা যেন অভ্যাসের বশে। শশধরবাবুও চিন্তিত ও গম্ভীর। নিশিকান্তবাবু ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটে, তবে ভিতরে ভিতরে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা পেয়ে তিনি বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন। নামচির বাজার থেকে একটা কমলালেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'বিপদ যাই আসুক না কেন মশাই, এক দিকে প্রদোষবাবু আর এক দিকে জার্মান বীরেশবাবুকে নিয়ে ডরাবার কোনও কারণ দেখছি না।'

নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে পৌঁছে যায়। এই নদীর ধারেই নয়া বাজার। সেখান থেকে আবার একটা ব্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে ন' হাজার ফুটের উপর পেমিয়াংচি। এ নদী তিস্তা নয়। এর জল তিস্তার মতো ঘোলা নয়। এর জল স্বচ্ছ সবুজ। মাঝে মাঝে জলের স্রোত পাথরে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এ নদীর নাম রঙ্গিত। এত সুন্দর পাহাড়ি নদী এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে আমরা যে পাহাড়ের উপর উঠছি, তাতে গাছপালা অনেক বেশি। এখানে মাটি লাল নয়, আর শুকনো নয়। এ যে বিহারের কোনও পাহাড় নয়, এ যে হিমালয়, তাতে কোনও ভুল নেই। শশধরবাবু বলেছিলেন, ইয়াং মাউনটেনস—তাই ধস নামে। সেই ধসের যে কত চিহ্ন আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। সবুজ পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে ছাই-রঙের সব ক্ষতচিহ্ন—ঠিক মনে হয় পাহাড়ের গায়ে বুঝি শ্বেতি হয়েছে। অজস্র গাছপালা বনবাদাড় সমেত পাহাড়ের এক-একটা অংশ ধসে পড়েছে একেবারে নদীর কিনারে। এই সব ন্যাড়া অংশ নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশের সবুজের সঙ্গে মিশে যাবে, তা কে জানে।

একটা গুমফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, সেই ভূত-তাড়ানো নিশানের ঝাড়। সবগুলো নিশানই তকতকে নতুন

বলে মনে হচ্ছে। শশধরবাবু বললেন, 'সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা—তারই তোড়জোড় চলছে।'

ফেলুদা প্রথমে বোধ হয় কথাটা শোনেনি। প্রায় মিনিট খানেক পরে বলল, 'কত তারিখে পড়ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা ?'

শশধরবাবু বললেন, 'কালই বোধ হয় পূর্ণিমা। কাল হল ১৭ এপ্রিল।'

'সতেরই এপ্রিল...তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ...চৌঠা বৈশাখ...'

ফেলুদার বিড়বিড়ানি জিপের শব্দে আর কেউ বোধ হয় শোনেনি। তারিখ নিয়ে এত কী চিন্তা করছে ফেলুদা ? আর ও এত গম্ভীর কেন ? আর হাতের আঙুলই বা মটকাচ্ছে কেন ?

পেমিয়াংচির আগের শহরের নাম গেজিং। এখানেও দেখি নিশানের ছড়াছড়ি। এখান থেকে পেমিয়াংচি তিন মাইল। জিপ ক্রমশ উপরে উঠছে। রাস্তা রীতিমতো খাড়াই। এখানে গাছ কম, তবে উপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ রঙের ঘন বন। খানিকটা রাস্তা রীতিমতো খারাপ। জিপকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। মনে হল, এ দিকে বৃষ্টিটা গ্যাংটকের চেয়ে বেশি হয়েছে। জিপ ফোর-হুইলে অতি সন্তর্পণে একটা গোলমেলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরোল। ঝাঁকুনির চোটে নিশিকান্তবাবুর মাথাটা জিপের উপরের লোহার রডের সঙ্গে ঠকাং করে লাগায় ভদ্রলোক 'উরেশ্‌শা' বলে উঠলেন।

একটু পরেই ক্রমে আলো কমে এল। এটা শুধু মেঘের জন্যে নয়। আমাদের জিপের এক পাশে এখন গাঢ় সবুজ পাতা আর সাদা ডালপালাওয়ালা গাছের বন। হেলমুট বলল, 'ওগুলো বার্চ গাছ—বিলেতে খুব দেখা যায়।'

এখন আমাদের জিপ এই বনের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। আমাদের দু' পাশে বন। তার মধ্য দিয়ে আমরা চড়াই উঠছি সাপের মতো প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে।

এবার আরও গভীর বন, আরও বড় বড় গাছ। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। জিপের আওয়াজ ছাপিয়ে বনের ভিতর থেকে অচেনা পাখির তীক্ষ্ণ শিস। নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বেশ থ্রি—মানে থ্রিলিং

লাগছে।'

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল।

সামনে একটা সবুজ টিপি। উপরে মেঘলা আকাশ।

ক্রমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল। তার পর পুরো বাংলোটা। এই সেই ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত বাংলো। পিছন দিকে আকাশের নীচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া থরে থরে সাজানো পাহাড়।

জিপ থামল। আমরা নামলাম। চৌকিদার বেরিয়ে এল। আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে।

'আউর কোই হ্যায় ইঁহা?' শশধরবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নেহি সাব—বাংলো খালি হ্যায়।'

'আর কেউ নেই?' এবার ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'আর কেউ আসেনি?'

'এসেছিল। তিনি কাল রাত্রেই চলে গেছেন। দাড়িওয়ালা চশমাপরা বাবু।'

১২

চৌকিদারের কথা শুনে হেলমুটই সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। সে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল।

শশধরবাবু বললেন, 'যা বুঝছি—ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা বাজে। অন্তত ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।'

আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো। কাঠের ছাত, কাঠের মেঝে, সামনের দিকে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা তাতে পুরনো ধরনের বেতের টেবিল-চেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। এখন মেঘ করে আছে, তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে

কোনও আওয়াজ নেই। সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হল ডাইনিং রুমে। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে। এক পাশে আবার দুটো আরাম কেদারা। শশধরবাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালানোতে এখন আমি কনভিন্‌সড। এস. এস. তার এমন একটা দামি জিনিস যাকে-তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে।'

হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু বোধহয় বাথরুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। ফেলুদা বাংলোর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি আর কী করি—খাবার টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এত দূর আসা বৃথা হবে, শেলভাঙ্কারের আততায়ী অল্পের জন্য হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাবে, আমরা বোকার মতো দৃশ্য দেখে গ্যাংটকে ফিরে যাব—এ সব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

ডাইনিং রুমের পিছন দিকের দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডরুমে যাওয়া যায়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এলো, হাতে একটা লাঠি।

এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখছিলাম না?

'ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই', ফেলুদার গলার স্বর শুকনো আর ভারী, 'কারণ তিনি চিহ্নস্বরূপ তাঁর লাঠিটা ফেলে গেছেন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!'

নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। তার পর 'অদ্ভুত জায়গা' বলে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী শব্দ করে হাই তুললেন।

ফেলুদা বসল না। ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর বৈদ্যর লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় ঠক্ ঠক্ করে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগল।

শশধরবাবু বললেন, 'কই, মিস্টার সরকার—আপনাদের ওই খাবারের বাক্সগুলো খুলুন। মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?'

'খাওয়া পরে হবে।'

কথাটা বলল ফেলুদা। আর যেভাবে বলল, তাতে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু উঠতে গিয়ে প্রথমতো খেয়ে থপ্ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। শশধরবাবুও অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। কিন্তু ফেলুদা আবার যেই কে সেই।

সে চেয়ারে বসল। লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে পকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল, 'ঘাটশিলায় আমার এক পুরনো বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে তো ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন—তাই না, শশধরবাবু?'

শশধরবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না।

'হ্যাঁ—এক ভাগনের বিয়ে ছিল।'

'আপনি তো হিন্দু?'

হঠাৎ এ-প্রশ্ন করল কেন ফেলুদা?

'তার মানে?' শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফেলুদার দিকে।

'নাকি বৌদ্ধ—না খ্রিস্টান—না ব্রাহ্ম—না মুসলমান?'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'বলুন না।'

'হিন্দু—ন্যাচারেলি।'

'হুঁ!' ফেলুদা গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং ছাড়ল। তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু—' ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি, দৃষ্টি সোজা শশধরবাবুর দিকে, '—আপনি আর আমরা তো একই দিনে একই সঙ্গে প্লেনে এলাম! আপনি তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন, তাই না?'

'এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিত্তির? আপনার কথার কোনও মাথামুণ্ডু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঘাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে তো হিন্দুদের বিয়ে হয় না

শশধরবাবু! ওটা যে নিষিদ্ধ মাস! ও মাসে কোনও লগ্ন নেই—শাস্ত্রের বারণ! আপনি সেই চৈত্র মাসেই আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিলেন?'

শশধরবাবু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিংবা পারলেন না। তাঁর হাত দুটো কাঁপছে।

'আপনি কী ইমপ্লাই করছেন? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

ফেলুদা নিরুদ্বেগ। সে চেয়ে রয়েছে সোজা শশধরবাবুর দিকে, তার চোখের পাতা পড়ছে না।

প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইমপ্লাই করছি অনেক কিছু। এক নম্বর—আপনি মিথ্যেবাদী! আপনি ঘাটশিলায় যাননি। দু' নম্বর—আপনি বিশ্বাসঘাতক—'

'মানে?' শশধরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোন একটা কারণে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। সে কথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন---যদিও কারণ বলেননি। অনেক সময় খুব কাছের কোনও লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়। আমার বিশ্বাস সে-লোক হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর পার্টনার। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। তাঁর সন্দেহ-বাতিকটা ছিল না একেবারেই। সুতরাং তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলেন—এবং জানতে পেরে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর জানার ব্যাপারটা আপনি জানতে পারেন—আর জানার পর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বম্বেতে সেটার সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিমে এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না। আপনিও এলেন। হয়তো তিনি আসার পরের দিনই। আপনি মানে নট শশধর বোস, বাট ডক্টর বৈদ্য—অর্থাৎ ছদ্মবেশী শশধর বোস। বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল, গণৎকার সেজে তাঁর বিষয়ে জানা কথাগুলোই তাঁকে বলল, তাঁকে ইম্প্রেস্ করল। দুজনে একসঙ্গে গুমফায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে। আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। পথে পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে

তাঁকে অজ্ঞান করলেন। ড্রাইভারকে আগেই হাত করেছিলেন—পয়সায় কী না হয়! তার পর গাড়ি ফেলা! তার পর পাথর ফেলা—আপনার ওই লাঠির সাহায্যে! তখনও শেলভাঙ্কার মরেননি। হয়তো তিনি শেষ মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন, এবং সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করেন।'

'ননসেন্স!' শশধরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি! কী প্রমাণ আছে যে আমি ডক্টর বৈদ্য?'

ফেলুদা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল।

'আপনার আংটিটা কোথায় গেল শশধরবাবু?'

শশধরবাবু কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

'আমার...'

'হ্যাঁ, আপনার। আপনার "মা" লেখা সোনার আংটি। আঙুলে দাগ রয়েছে, অথচ আংটি নেই কেন?'

'ও—ওটা...' শশধরবাবু ঢোঁক গিললেন, 'ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল, তাই—' ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে আংটি বার করে দেখালেন।

'মেক-আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গেছিলেন—তাই না? ওই একই আঙুলের দাগ সেদিন মোমবাতির আলোয় দেখেছিলাম শশধরবাবু। তখনই একটা খটকা লেগেছিল, কিন্তু কেন তা বুঝতে পারিনি।'

শশধরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—ফেলুদা গর্জন করে উঠল—'বসুন! আরও আছে!'

শশধরবাবু বসলেন, ঘাম মুছলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'শেলভাঙ্কার খুন হল। ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন, কালিম্পঙ যাচ্ছেন লামার সঙ্গে দেখা করতে। আসলে কিন্তু তা নয়। আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন কলকাতায়। এ দিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন 'অ্যারাইভিং ফোর্টিন্থ'। সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও বিচলিত হন—কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনও কথা ছিল

না—এবং শেলভাঙ্কার আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই চাইছিলেন; যাই হোক—আপনি ফোটিন্‌থ এলেন—কারণ এই আসাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই। চোন্দই এসে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুতে আক্ষেপের ভাণ করে আপনি পনেরই বললেন বম্বে ফিরছেন। আসলে আপনি বম্বে যাননি, গ্যাংটকের আশেপাশেই কোথাও রয়ে গেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে। সে দিনই সন্ধ্যায় ডক্টর বৈদ্যর বেশে আপনিই আমাদের ভেলকি দেখালেন। আপনি জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ—তাই আপনিই পেমিয়াংচি রওনা হবার আগে পাথর গড়িয়ে আমাকে সাবাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং আপনিই রুমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে—'

ঘরের মধ্যে একজন বিকট হু হু হু শব্দ করে উঠল—কান্না আর ভয়ের মাঝামাঝি। ইনি নিশিকান্ত সরকার।

'বসুন নিশিকান্তবাবু।' ফেলুদা বলল, 'আর লুকিয়ে লাভ নেই। আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে?'

নিশিকান্তবাবু হাত দুটোকে 'হ্যান্ডস্ আপ' করার মতো মাথার উপর তুলে আবার সেই রকমই কঁকিয়ে উঠে বললেন, 'মশাই, জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভ্যা—মানে ভ্যালুয়েবল। তার পর যখন জানলুম—'

'টিবেটান ইনস্টিটিউটে আপনিই গেস্‌লেন?'

'হ্যাঁ স্যার—আমিই। চাইতেই অন দি স্পট হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। তাই সন্দেহ হল। তাই গেলাম—তা, বলে কিনা ইউ—মানে ইউনিক জিনিস। তাই মানে—'

'ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল!'

'সেই—মানে, সেই আর কি!'

'কিন্তু আপনি সে দিন খুনের জায়গায় কাউকে দেখেননি?'

'না স্যার!'

'আপনি না দেখলেও, সে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখেছিল—এবং ভেবেছিল, আপনি তাকে দেখে ফেলেছেন। নইলে আর আপনাকে

শাসাবে কেন ?'

'তা হবে !'

'মূর্তিটা কোথায় ?'

'মূর্তি ?' নিশিকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ফেলুদাও অবাক।

'সে কি !... আপনি তা হলে—'

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারি। শশধরবাবু তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়ানো হেলমুটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা একটাই, আর তার সামনে হেলমুটের গড়িয়ে পড়া শরীর—তাই ফেলুদার বেরোতে দশ সেকেন্ডের মতো দেরি হয়ে গেল।

সবাই যখন বাইরে পৌঁছেছি, তখন জিপের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে। এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয়ই হাত করা ছিল, আর সে সেই ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল। শশধরবাবুকে নিয়ে জিপ প্রচণ্ড বেগে ঢাল বেয়ে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে আমাদের জিপটাও গর্জিয়ে উঠেছে, কারণ থোণ্ডুপ বুঝেছে যে, আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব। কিন্তু তার আর দরকার হল না। গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো অব্যর্থ গুলি তার পিছনের দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল।

জিপটা রাস্তার এক দিকে কেতরে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। দেখলাম শশধরবাবু লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটলেন। ড্রাইভারটা উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে জিপের স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটল বনের দিকে—আমরা তিনজন তার পিছনে। ড্রাইভারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের থোণ্ডুপও তার জিপের হ্যান্ডেলটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমরা চারজন অন্ধকার বনের ভিতর ঢুকে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দশ মিনিট খোঁজার পর হেলমুটের একটা হাঁক শুনে তার

দিকে গিয়ে দেখি, শশধরবাবু একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অদ্ভুত ভাবে লাফাচ্ছেন আর ছটফট করছেন।

আরও কাছে যেতে বুঝলাম যে, তাঁকে জোঁকে ধরেছে—একটা নয়—অন্তত দুশো-তিনশো লকলকে জোঁক তাঁর দুই পায়ের হাঁটু অবধি, আর কাঁধে, ঘাড়ে আর কনুইয়ের কাছটায় কিলবিল করছে। হেলমুট বলল, 'ভদ্রলোক বোধ হয় এই আলগা শেকড়টায় হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন, তাতেই এই দশা।'

ফেলুদা শশধরবাবুর কোটের কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে বনের বার করল। তার পর আমাকে বলল, 'দৌড়ে গিয়ে জোঁক-ছাড়ানো লাঠিগুলো নিয়ে আয়।'

আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। হেলমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অর্কিডের ছবি তুলছে। থোণ্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে। মূর্তিটা শশধরবাবুর কাছেই পাওয়া গেছে। খুনের সময় মূর্তিটা নেবার কথা তাঁর খেয়াল হয়নি। পরের দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোভ সামলাতে না পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে খুঁজে বার করেন। উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে আসছেন, তখন নিশিকান্তবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন। নিশিকান্ত শশধরকে দেখেনি, কিন্তু শশধর নিশিকান্তকে দেখেছে, আর সেই থেকে তাকে শাসাতে শুরু করেছে।

আরও একটা ব্যাপার—বম্বেতে নাকি শশধরবাবুর একটি সাকরেদ ছিল—তার সঙ্গে গ্যাংটক থেকেই শশধরবাবুর টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। সেই সাকরেদই নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে, এবং ফেলুদার টেলিগ্রামের খবরটা সে-ই নাকি গ্যাংটকে শশধরবাবুকে জানায়।

ফেলুদা সঙ্গে পান এনেছিল ; চিবোতে চিবোতে নিশিকান্তবাবুকে বলল, 'আপনিও যে একটি ছোটখাটো ক্রিমিন্যাল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নেহাৎ আপনার ভাগ্য ভাল, তাই আপনি

যমকান্তটা ফিরে পাননি। পেলে আপনার জন্যেও একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হত।'

নিশিকান্তবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে বললেন, 'পানিশমেন্ট তো হয়েচেই স্যার! তিন-তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে আমার ডান পায়ের মোজার ভিতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ উইক বোধ করছি।'

'যাই হোক—ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও তিব্বতি জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার বোতাম।'

এই প্রথম লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের শার্টের গলার সবচেয়ে নীচের বোতামটা নেই।

নিশিকান্তবাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তাঁর চারকোণা গোঁফের নীচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন, 'থ্যা—মানে থ্যাঙ্কস!'

সোনার কেল্লা ১৯

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

সোনার কেল্লা

এক

ফেলুদা হাতের বইটা সশব্দে বন্ধ করে টক্ টক্ দুটো তুড়ি মেরে বিরাট হাই তুলে বলল, 'জিয়োমেট্রি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ কি তুমি জিয়োমেট্রির বই পড়ছিলে?'

বইটায় একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, তাই নামটা পড়তে পারিনি। এটা জানি যে, ওটা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে ধার করে আনা। সিধু জ্যাঠার খুব বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ন। সবাইকে বই ধার দেন না, তবে ফেলুদাকে দেন। ফেলুদাও সিধু জ্যাঠার বই বাড়িতে এনেই আগে সেটায় একটা মলাট দিয়ে নেয়।

একটা চারমিনার ধরিয়ে পর পর দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'জিয়োমেট্রির বই বলে আলাদা কিছু নেই। যে-কোনো বই-ই জিয়োমেট্রির বই হতে পারে, কারণ সমস্ত জীবনটাই জিয়োমেট্রি। লক্ষ করলি নিশ্চয়ই—ধোঁয়ার রিংটা যখন আমার মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পারফেক্ট সার্কল। এই সার্কল জিনিসটা কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেটা একবার ভেবে দ্যাখ। তোর নিজের শরীরে দ্যাখ। তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল। এই সার্কেলের সাহায্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস আকাশের চাঁদ তারা সূর্য। এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে কল্পনা করলে সার্কল, আসলে গোলক—এক-একটা সলিড বুদ্বুদ, অর্থাৎ জিয়োমেট্রি। সৌরজগতের গ্রহগুলো আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক কার্ভে। এখানেও জিয়োমেট্রি। তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে রাস্তায় থুতু ফেললি—অবিশ্যি ফেলা উচিত নয়—ওটা আনহাইজিনিক—নেক্সট টাইম ফেললে গাঁট্টা খাবি—ওই থুতুটা গেল কিন্তু একটা প্যারাবোলিক কার্ভে—জিয়োমেট্রি। মাকড়সার জাল জিনিসটা ভালো করে দেখেছিস কখনো? কী জটিল জিয়োমেট্রি রয়েছে তাতে জানিস? একটা সরল চতুষ্কোণ দিয়ে শুরু

হয় জাল বোনা। তারপর সেটাকে দুটো ডায়াগনাল টেনে চারটে ত্রিকোণে ভাগ করা হয়। তারপর সেই ডায়াগনাল দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হয় স্পাইর‍্যাল জাল; আর সেটাই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো চতুষ্কোণটাকে ছেয়ে ফেলে। ব্যাপারটা এমন তাজ্জব যে ভাবলে কূলকিনারা পাবি না।...'

রবিবারের সকাল। আমরা দু'জনে আমাদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় বসে আছি। বাবা তাঁর রবিবারের নিয়ম মতো ছেলেবেলার বন্ধু সুবিমল কাকার বাড়িতে আড্ডা মারতে গেছেন। ফেলুদা সোফায় বসে তার পা দুটো সামনের নিচু টেবিলটার উপর তুলে দিয়েছে। আমি বসেছি তক্তপোশে, দেয়ালের সঙ্গে তাকিয়াটা লাগিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে। আমার হাতে রয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি একটা গোলকধাঁধার ভিতর ছোট্ট লোহার দানা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই দানাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলকধাঁধার মাঝখানে আনবার চেষ্টা করছি। বুঝলাম যে, এ-ও একটা কঠিন জিয়োমেট্রির ব্যাপার।

কাছেই নীহার-পিন্টুদের বাড়িতে পুজোর প্যান্ডেলে 'কাটি পতঙ্গ' ছবির 'ইয়ে জো মহব্বৎ হ্যায়' গানটা বাজছে। গোল গ্রামোফোন রেকর্ডে নিছি স্পাইর‍্যাল প্যাঁচ। অর্থাৎ জিয়োমেট্রি।

'কেবল চোখে দেখা যায় এমন জিনিস না,' ফেলুদা বলে চলল, 'মানুষের মনের ব্যাপারটাও জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায়। সাদাসিধে মানুষের মন স্ট্রেট লাইনে চলে; প্যাঁচালো মন সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে, আবার পাগলের মন যে কখন কোন দিকে চলবে তা কেউ বলতে পারে না—একেবারে জটিল জিয়োমেট্রি।'

ফেলুদার দৌলতে অবিশ্যি আমার সোজা-বাঁকা পাগল-ছাগল অনেক রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ হবার সুযোগ হয়েছে। ফেলুদা নিজে কীরকম জ্যামিতিক নকশার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন ভাবছিলাম। ওকে জিগ্যেস করাতে বলল, 'একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক বলতে পারিস।'

'আর আমি কি সেই জ্যোতিষ্কের স্যাটেলাইট?'

'তুই একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিমাণহীন স্থাননির্দেশক চিহ্ন।'

আমার নিজেকে স্যাটেলাইট বলে ভাবতে ভালোই লাগে। তবে সব সময় স্যাটেলাইট থাকা সম্ভব হয় না এই যা আপসোস। গ্যাংটকে গণ্ডগোলের ব্যাপারে অবিশ্যি ওর সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তখন আমার ছুটি ছিল। তার পরের দুটো তদন্তের ব্যাপারে—একটা ধলভূমগড়ে খুন, আরেকটা পাটনায় একটা জাল উইলের ব্যাপারে—এই দুটোতে আমি বাদ পড়ে গেছি। এখন পুজোর ছুটি। ক'দিন থেকেই ভাবছি এই সময় একটা কেস এলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেটা যে সত্যিই এসে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে-কোনো

জিনিস মনে মনে খুব জোর দিয়ে চাইলে অনেক সময় আপনা থেকেই এসে পড়ে মোট কথা আজ যেটা ঘটল সেটা আমার এই চাওয়ার ফল বলে ভেবে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পিন্টুদের বাড়ির লাউডস্পীকারে সবেমাত্র 'জনি মেরা নাম'-এর একটা গান দিয়েছে, ফেলুদা অ্যাশ-ট্রেতে ছাই ফেলে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজটা হাতে নিয়েছে, আমি একবার রাস্তায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন সজোরে নেড়ে উঠল। বাবা বারোটার আগে ফিরবেন না, তাই বুঝলাম এ অন্য লোক। দরজা খুলে দেখি ধুতি আর নীল সার্ট পরা একজন নিরীহ গোছের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

'এ বাড়িতে প্রদোষ মিত্তির বলে কেউ থাকেন ?'

লাউডস্পীকারের জন্য প্রশ্নটা করতে ভদ্রলোককে বেশ চেঁচাতে হল। নিজের নাম শুনে ফেলুদা সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল।

'কোত্থেকে আসছেন ?'

'আজ্ঞে, আমি আসছি সেই শ্যামবাজার থেকে।'

'ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।

'বসুন। আমিই প্রদোষ মিত্তির।'

'ওঃ ! আপনি এত ইয়ং সেটা আমি ঠিক...'

ভদ্রলোক গদ্‌গদ ভাব করে সোফার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর হাসি কিন্তু বসার পরেই মিলিয়ে গেল।

'কী ব্যাপার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'কৈলাস চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তিনি, মানে, আমার একজন খদ্দের আর কী। আমার নাম সুধীর ধর। আমার একটা বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রীটে—ধর অ্যান্ড কোম্পানি—দেখে থাকতে পারেন হয়ত।'

ফেলুদা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তারপর আমায় বলল, 'তোপ্‌সে—জানলাটা বন্ধ করে দে তো।'

রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গানের আওয়াজটা একটু কমল আর তার ফলে ভদ্রলোকও আরেকটু স্বাভাবিকভাবে বাকি কথাগুলো বলতে পারলেন।

'দিন সাতেক আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আমার ছেলের বিষয়ে—আপনি কি..., ?'

'কী খবর বলুন তো ?'

'ওই জাতিস্মর...মানে...'

'ওই মুকুল বলে ছেলেটি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খবরটা তাহলে সত্যি ?'

'মানে, ও আপনার যে ধরনের কথাবার্তা বলে তাতে তো...'

জাতিস্মর ব্যাপারটা আমি জানতাম। এক-একজন থাকে, তাদের নাকি হঠাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বলে জাতিস্মর। অবিশ্যি পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে কিনা সেটা ফেলুদাও নাকি জানে না।

ফেলুদা চারমিনারের প্যাকেটটা খুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক একটু হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি খান না। তারপর বললেন, 'বোধহয় মনে থাকবে, আমার এই ছেলেটি—আট বছর মাত্র বয়স—একটা জায়গার বর্ণনা দেয়, সেখানে নাকি সে গেছে। অথচ তেমন জায়গায়—আমার ছেলে তো দূরের কথা—আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের কারুর কখনো যাবার সৌভাগ্য হয়নি। ছা-পোষা লোক, বুঝতেই তো পারছেন। দোকান দেখি, এদিকে বইয়ের বাজার দিনে দিনে—'

'একটা দুর্গের কথা বলে না আপনার ছেলে ?' ফেলুদা ভদ্রলোককে কতকটা বাধা দিয়েই বলল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে—সোনার কেল্লা। তার মাথায় কামান বসানো আছে, যুদ্ধ হচ্ছে, লোক মরছে—সে সব নাকি সে দেখেছে। সে নিজে পাগড়ি পরে উটের পিঠে চড়ে বালির উপর বেড়াত। বালির কথা খুব বলে। হাতী ঘোড়া এসব অনেক কিছু বলে। আবার ময়ূরের কথা বলে। ওর হাতে একটা দাগ আছে কনুইয়ের কাছে। সেটা জন্মে অবধি আছে। আমরা তো জন্মদাগ বলেই জানতাম। ও বলে যে একবার নাকি একটা ময়ূর ওকে ঠোকর মেরেছিল, এটা নাকি সেই ঠোকরের দাগ।'

'কোথায় থাকত সেটা পরিষ্কার ভাবে বলে ?'

'না—তবে তার বাড়ি থেকে নাকি সোনার কেল্লা দেখা যেত। মাঝে মাঝে কাগজে হিজিবিজি কাটে পেনসিল দিয়ে। বলে—এই দ্যাখো আমার বাড়ি। দেখে তো বাড়ির মতোই মনে হয়।'

'বই-টইয়ের মধ্যে এমন কোনো জায়গার ছবি সে দেখে থাকতে পারে না ? আপনাদের তো বইয়ের দোকান আছে...'

'তা অবিশ্যি পারে। কিন্তু ছবির বই তো অনেক ছেলেই দেখে—তাই বলে কি তারা অষ্টপ্রহর এইভাবে কথা বলে ? আপনি আমার ছেলেকে দেখেননি তাই। সত্যি বলতে কী—তার মনটাই যেন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের বাড়ি, নিজের ভাই-বোন বাপ-মা আত্মীয়স্বজন—এর কোনোটাই যেন তার আপন নয়।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না সে ছেলে।'

'কবে থেকে এইসব বলতে শুরু করেছে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তা মাস দুয়েক। ওই ছবি আঁকা দিয়েই শুরু জানেন। সেদিন খুব জল হয়েছে. আমি দোকান থেকে সবে ফিরিচি, আর সে আমায় এসে ছবি দেখাচ্ছে। গোড়ায় গা করিনি। ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে! কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি। আমার গিন্নীই প্রথম খেয়াল করে। তারপর ক'দিন ধরে তার কথা শুনে-টুনে, তার হাবভাব দেখে, আমার আরেক খদ্দের

আছে—নাম শুনেছেন কি?—ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। প্যারাসাইকলজিস্ট। শুনেছি বইকি। তা তিনি তো আপনার ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাবেন বলে কাগজে বেরিয়েছে।'

'যাবেন না, চলে গেছেন অলরেডি। তিন দিন এলেন আমার বাড়িতে। বললেন, এ তো রাজপুতানার কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললুম হতে পারে। শেষটায় বললেন কী, তোমার ছেলে জাতিস্মর; এই জাতিস্মর নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুতানায় যাবো। ঠিক জায়গায় গিয়ে ফেলতে পারলে তোমার ছেলের নিশ্চয়ই আরো অনেক কথা মনে পড়বে। তাতে আমার খুব সুবিধে হবে। ওর খরচাও আমি দেবো, খুব যত্নে রাখব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।'

'তারপর ?' ফেলুদার গলার স্বর আর তার এগিয়ে বসার ভঙ্গিতে বুঝলাম সে বেশ ইন্টারেস্ট পেয়েছে।

'তারপর আর কী—মুকুলকে নিয়ে চলে গেলেন।'

'ছেলে আপত্তি করেনি ?'

ভদ্রলোক একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'কোথায় আছেন আপনি ? যেই বললে সোনার কেল্লা দেখাবে অমনি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। আপনি তো দেখেননি আমার ছেলেকে। ও, মানে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। একেবারেই নয়। রাত তিনটের সময় উঠে বসে আছে। গুন-গুন করে গান গাইছে। ফিলিমের গানটান নয় মশাই—গেঁয়ো গেঁয়ো সুর—তবে বাংলাদেশের গাঁ নয় এটা জানি। আমি আবার একটু হারমোনিয়াম-টারমোনিয়াম বাজাই, বুঝেছেন...'

ভদ্রলোক এত কথা বললেন, কিন্তু ফেলুদার কাছে কেন এলেন, গোয়েন্দার কেন প্রয়োজন হতে পারে তাঁর, সেটা এখনো পর্যন্ত কিছুই বললেন না। হঠাৎ ফেলুদার একটা কথাতেই যেন ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিয়ে নিল।

'আপনার ছেলে তো কী সব গুপ্তধনের কথা বলছে না ?'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন মুষড়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেইখানেই তো গণ্ডগোল মশাই। আমায় বলেছে, কিন্তু কাগজের রিপোর্টারের সামনে কথাটা বলেই তো সর্বনাশ করেছে।'

'কেন, সর্বনাশ বলছেন কেন ?' প্রশ্নটা করেই ফেলুদা আমাদের চাকর শ্রীনাথকে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলল।

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন, সেটা বুঝতেই পারবেন। গতকাল সকালে তুফান এক্সপ্রেসে হেমাঙ্গবাবু আমার ছেলেকে নিয়ে রাজস্থান রওনা দিয়েছেন, আর—'

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'রাজস্থানের কোন জায়গায় গেছেন সেটা জানেন ?'

সুধীরবাবু বললেন, 'যোধপুর বলেই তো বললেন। বললেন, যখন বালির কথা বলছে, তখন উত্তর-পশ্চিম দিকটা দিয়ে শুরু করব। তা সে যাক গে—এখন কথা হচ্ছে কী, কালই সন্ধ্যায় আমাদের পাড়া থেকে একটি মুকুলের বয়সী ছেলেকে কে বা কারা যেন ধরে নিয়ে যায়।'

'আপনার ধারণা তাকে আপনার ছেলে বলে ভুল করে ?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দুজনের চেহারাতেও বেশ মিল আছে। শিবরতন মুখুজ্যে সলিসিটারের বাড়ি আছে আমাদের পাড়ায়, এটি সে বাড়িরই ছেলে, নাম নীলু, মুখুজ্যে মশায়ের নাতি। তাদের বাড়িতে, বুঝতেই পারছেন, কান্নাকাটি পড়ে গেছল। পুলিস-টুলিস অনেক হাঙ্গামা। এখন অবিশ্যি তাকে ফিরে পেয়ে সব ঠাণ্ডা।'

'এর মধ্যেই ফেরত দিয়ে দিল ?'

'আজই ভোরে। কিন্তু তাতে কী হল মশাই ! আমার তো এদিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা তো বুঝেছে ভুল ছেলে এনেছে। কিন্তু সে ছেলে যে এদিকে তাদের বলে দিয়েছে যে মুকুল যোধপুর গেছে। এখন ধরুন যদি সে গুণ্ডারা গুপ্তধনের লোভে রাজস্থানে ধাওয়া করে তাহলে তো বুঝতেই পারছেন...'

ফেলুদা চুপ করে ভাবছে। তার কপালে চারটে ঢেউ-খেলানো দাগ। আমার বুকের ভিতর টিপটিপানি। সেটা আর কিছু নয়—এই সুযোগে যদি পুজোয় রাজস্থানটা ঘুরে আসা যায়, সেই আশায় আর কী। যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর—নামগুলো শুনেছি কেবল, আর ইতিহাসে পড়েছি। আর অবনী ঠাকুরের রাজকাহিনীতে—যেটা আমার নরেশ কাকা আমাকে জন্মদিনে দেয়।

শ্রীনাথ চা এনে রাখল টেবিলের উপর। ফেলুদা সুধীরবাবুর দিকে একটা পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এবার একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আপনার বিষয় কৈলাসবাবু যা বলেছিলেন, তাতে তো আপনাকে খুবই ইয়ে বলে মনে হয়। তাই ভাবছিলুম, যদি ধরুন, আপনি যদি রাজস্থানটা যেতে পারতেন। অবিশ্যি গিয়ে যদি দেখেন ওরা নিরাপদে আছে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি ধরুন গিয়ে কিছু গোলমাল দেখেন ! মানে, আপনার সাহসের কথাও অনেক শুনিচি। অবিশ্যি আমি নেহাত ছা-পোষা লোক। আপনার কাছে আসাটাই আমার পক্ষে একটা ধৃষ্টতা। কিন্তু যদি ধরুন আপনি যেতে রাজীই হন, তাহলে আপনার, মানে, যাতায়াতের খরচটা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই দেবো।'

ফেলুদা কপালে ভ্রূকুটি নিয়ে আরো অন্তত মিনিট খানেক ওইভাবে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'আমি কী স্থির করি সেটা আপনাকে কাল জানাব। আপনার ছেলের একটা ছবি বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই ? কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা তেমন স্পষ্ট নয়।'

সুধীরবাবু চায়ে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার খুড়তুতো ভাই ছবিটবি তোলে—সে একটা তুলেছিল মুকুলের ছবি। আমার গিন্নীর কাছে আছে।'

'ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক বাকি চা-টা শেষ করে হাত থেকে কাপ রেখে উঠে পড়লেন।

'আমার দোকানে অবিশ্যি টেলিফোন আছে—৩৪-৫১১৬। দশটা থেকে আমি দোকানে থাকি।'

'আপনি এমনিতে থাকেন কোথায় ?'

'মেছোবাজার। সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীট। মেন রোডের উপরেই।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেলুদাকে বললাম, 'আচ্ছা, একটা কথার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না!'

'প্যারাসাইকলজিস্ট তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের মনের কতগুলো বিশেষ ধরনের ধোঁয়াটে দিক নিয়ে যারা চর্চা করে তাদের বলে প্যারাসাইকলজিস্ট। যেমন টেলিপ্যাথি। একজন লোক আরেকজন লোকের মনের কথা জেনে ফেলল। কিংবা নিজের মনের জোরে আরেকজনের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। অনেক সময় এমন হয় যে, তুই ঘরে বসে আছিস, হঠাৎ একজন পুরনো বন্ধুর কথা মনে পড়ল—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বন্ধু তোকে টেলিফোন করল। প্যারাসাইকলজিস্টরা বলে যে ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। এর পেছনে আছে টেলিপ্যাথি। আরো আছে, যেমন এক্সট্রা সেন্সরি-পারসেপশন—যাকে সংক্ষেপে বলে ই এস্ পি। ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে জেনে ফেলা। বা এই যে জাতিস্মর—পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া। এগুলো সবই হচ্ছে প্যারাসাইকলজিস্টদের গবেষণার বিষয়।'

'এই হেমাঙ্গ হাজরা বুঝি খুব বড় প্যারাসাইকলজিস্ট?'

'যে ক'টি আছেন, তাদের মধ্যে তো বেশ নামকরা বলেই জানি। বিদেশে-টিদেশে গেছেন, লেকচার-টেকচার দিয়েছেন, বোধ হয় একটা সোসাইটিও করেছেন।'

'তোমার এসব জিনিসে বিশ্বাস হয় বুঝি?'

'আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো। মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে অজস্র আছে। এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে মনে করত জানিস? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীটা ফুরিয়ে গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না। কিন্তু ভূপর্যটক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে ভূপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন ফ্ল্যাটওয়ালারা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন। আবার লোকে এটাও বিশ্বাস করেছে যে, পৃথিবীটাই স্থির, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে। এক সময় একদল আবার ভাবত যে, আকাশটা বুঝি একটা বিরাট উপুড়-করা বাটি, যার গায়ে তারাগুলো সব মণিমুক্তোর মতো বসানো আছে। কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে সূর্যই স্থির, আর সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু ঘুরছে। কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিলেন যে, এই ঘোরাটা বুঝি বৃত্তাকারে। কেপলার এসে প্রমাণ করলেন ঘোরাটা আসলে এলিপটিক কক্ষে। তারপর আবার

গ্যালিলিও...যাক গে, তোকে এত জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। তোর নাবালক মস্তিষ্কে এসব ঢুকবে না।'

ফেলুদা এতবড় গোয়েন্দা হয়েও বুঝতে পারল না যে আমাকে এখন খোঁচা-টোঁচা দিয়ে আমার ফুর্তিটা মাটি করা সহজ হবে না, কারণ আমার মন অলরেডি বলছে যে এবার ছুটিটা রাজস্থানেই কাটবে, আর নতুন দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলবে নতুন রহস্যের জট ছাড়ানো। দেখা যাক আমার টেলিপ্যাথির দৌড় কদ্দূর।

॥ ২ ॥

ফেলুদা যদিও একদিন সময় চেয়েছিল, সুধীরবাবু চলে যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ও রাজস্থান যাওয়া ঠিক করে ফেলল। কথাটা আমাকে বলতে আমি বললাম, 'যাচ্ছি তো?'

ফেলুদা বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে রাজস্থানের পাঁচটা কেল্লাওয়ালা শহরের নাম করতে পারলে চান্স আছে।'

'যোধপুর, জয়পুর, চিতোর, বিকানির আর...আর...বুঁদির কেল্লা!'

রিস্টওয়াচের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে তড়াক করে সোফা থেকে উঠে পড়ে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্ট-সার্ট পরে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ রোববার—দুটো পর্যন্ত ফেয়ারলি প্লেস খোলা—চট করে রিজার্ভেশনটা করে আসি।'

একটার মধ্যে ফেলুদা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ডিরেক্টরি খুলে নম্বর বার করে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার বাড়িতে একটা টেলিফোন করল। যে লোকটা নেই, তাকে ফোন করা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'সুধীরবাবু লোকটা সত্যি কথা বলেছে কিনা সেটার প্রমাণের দরকার ছিল।'

'পেলে প্রমাণ?'

'হ্যাঁ।'

দুপুরবেলাটা ফেলুদা বুকের তলায় বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে তার খাটে শুয়ে এক সঙ্গে পাঁচখানা বই ঘাটাঘাটি করল। দুটো বই পেলিক্যানের—সেগুলো প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে। এগুলো নাকি ফেলুদা তার কলেজের পুরানো বন্ধু অনুতোষ বটব্যালের কাছ থেকে ধার করে এনেছে। অন্য তিনটের মধ্যে একটা হল টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের বই, আরেকটা হল গাইড টু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বার্মা অ্যাণ্ড সিলোন, আর আরেকটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, কার লেখা ভুলে গেছি।

বিকেলে চা খাবার পর ফেলুদা বলল, 'তৈরি হয়ে নে। একবার সুধীরবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার।'

এখানে বলে রাখি যে, বাবাকে রাজস্থান যাচ্ছি বলাতে উনি খুব খুশি হলেন। উনি নিজে দাদুর সঙ্গে ছেলেবেলায় দু'বার রাজস্থান ঘুরে এসেছেন। বললেন, 'চিতোরটা মিস করিস না। চিতোরের কেল্লা দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। রাজপুতরা যে কত বড় বীর যোদ্ধা ছিল সেটা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম। ফেলুদা যেতে রাজী হয়েছে শুনে সুধীরবাবুর মুখে আবার সেই গদ্গদ ভাব ফুটে উঠল।

'কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনাকে তা বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'এখনো সেটার প্রয়োজন আসেনি সুধীরবাবু। এখন ধরে নিন আমরা এমনি বেড়াতে যাচ্ছি, আপনার অনুরোধে যাচ্ছি না!'

'সময় খুব কম। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ আছে। এক হচ্ছে—আপনার ছেলের একটা ছবি চাই; আর দুই—যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই নীলু ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করব—সেই যাকে কিডন্যাপ করেছিল।'

সুধীরবাবু বললেন, 'এমনিতে সে ছেলে বিকেলে বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুজোর বাজার, বুঝতেই তো পারছেন। তবে আজ বোধহয় তাকে আর বেরোতে দেবে না। দাঁড়ান, আগে ছবিটা এনে দিই আপনাকে।'

সুধীরবাবুর বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে একই ফুটপাথে হল সলিসিটার শিবরতন মুখার্জির বাড়ি। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন; সামনে বৈঠকখানায় তক্তপোশে একজন মুখে শ্বেতীর দাগওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। সুধীরবাবুর কথা শুনে বললেন, 'আপনার ছেলের দৌলতে আমার নাতিরও যে খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।—বসুন আপনারা। মনোহর!'

চাকর এলে পর শিবরতনবাবু বললেন, 'এঁদের তিনজনের জন্য চা কর। আর দেখ তো নীলু আছে কিনা—বল আমি ডাকছি।'

আমরা একটা বড় টেবিলের পাশে তিনটে চেয়ারে বসেছিলাম। আমাদের দু'পাশের দেয়ালের সামনে সিলিং পর্যন্ত উঁচু আলমারি মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা। ফেলুদা বলে যে আইনের ব্যাপারে যত বই লাগে, অন্য কিছুতেই নাকি তত লাগে না।

আমি এই ফাঁকে একবার মুকুলের ফোটোটা ভাল করে দেখে নিলাম। বাড়ির ছাতে তোলা ছবি। ছেলেটি রোদে ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখ করে সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শিবরতনবাবু বললেন, 'নীলুকে আমরাও অনেক কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেছি। গোড়ার দিকে তো কথাই বলছিল না; নার্ভাস শকে গুম মেরে গিয়েছিল। বিকেলের দিক থেকে একটু নরম্যাল মনে হচ্ছে।'

'পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ধরে নিয়ে যাবার পর দেওয়া হয়েছিল। তবে তারা কিছু করবার আগেই তো দেখছি ফেরত এসে গেল।'

এইবার নীলু ছেলেটি এসে চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সত্যিই, ছবিতে মুকুলের যে চেহারা দেখছি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে

ছেলেটির এখনো ভয় কাটেনি। সে সন্দেহের ভাব করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'তোমার হাতে বুঝি ব্যথা পেয়েছ নীলু?'

শিবরতন কী জানি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাঁকে ইশারা করে থামিয়ে দিল। নীলু নিজেই প্রশ্নটার জবাব দিল—

'ওরা যখন আমার হাত ধরে টানল, তখন আমার হাতে ভীষণ জ্বালা করল।'

কবজির কিছু ওপরে কাটা দাগটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ওরা বলছ—তার মানে একজনের বেশি লোক ছিল বুঝি?'

'একজন লোক আমার চোখটা আর মুখটা চেপে ধরলে, আর কোলে তুলে

নিয়ে গাড়িতে উঠল। আর আরেকজন তো গাড়ি চালালো। আমার খুব ভয় করছিল।'

'আমারও ভয় করত', ফেলুদা বলল, 'তোমার চেয়েও বেশি। তুমি খুব সাহসী। তা তোমাকে যখন ধরল, তখন তুমি কী করছিলে?'

'আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিলাম। মতিদের বাড়িতে পুজো হয়। মতি আমার ক্লাসে পড়ে।'

'রাস্তায় তখন বেশি লোকজন ছিল না বুঝি?'

শিবরতনবাবু বললেন, 'এদিকটায় পরশু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বোমাটোমা পড়েছিল। তাই কাল সন্ধের দিকে লোক চলাচলটা একটু কমেছে।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে একটা হুঁ শব্দ করে আবার নীলুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল?'

'জানি না। আমার চোখ বেঁধে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ গাড়ি চলল।'

'তারপর?'

'তারপর একটা চেয়ারে বসাল। তারপর বসিয়ে একজন বলল, তুমি কোন ইস্কুলে পড়? আমি ইস্কুলের নাম বললাম। তারপর বলল, 'তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার ইস্কুলের সামনে নামিয়ে দেবো, আর তাহলে তুমি বাড়ি যেতে পারবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ পারব। তারপর আমি বললাম, কী জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর, দেরি হলে মা বকবে। তখন লোকটা বলল, সোনার কেল্লা কোথায়? তখন আমি বললাম, আমি জানি না, আর মুকুলও জানে না ; ও খালি সোনার কেল্লা জানে। তখন ওরা সব কী ইংরিজিতে বলল, মিসটেক। তারপর বলল, তোমার নাম কী? আমি বললাম, মুকুল আমার বন্ধু কিন্তু সে রাজস্থানে চলে গেছে। তখন বলল, জায়গাটার নাম তুমি জান? আমি বললাম, জয়পুর।'

'জয়পুর বললে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না না, যোধপুর। হ্যাঁ, যোধপুর বললাম।'

নীলু একটু থামল। আমরাও সকলে চুপ। চাকর চা আর মিষ্টি এনে রেখে গেছে, কিন্তু কারুরই সে দিকে দৃষ্টি নেই। ফেলুদা বলল, 'আর কিছু মনে পড়ছে?'

নীলু একটু ভেবে বলল,'একজন লোক সিগারেট খাচ্ছিল। না না, চুরুট।'

'তুমি চুরুটের গন্ধ জান?'

'আমার মেসোমশাই খায় যে।'

'সেই রাত্রে তুমি ঘুমোলে কোথায়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

নীলু বলল, 'জানি না তো।'

'জান না ? জান না মানে ?'

'আমাকে একবার বলল, দুধ খাও। তারপর একটা খুব ভারী গেলাসে দুধ দিল আর আমি খেলাম। আর তারপর তো আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই।'

'তারপর ? ঘুম ভাঙল কখন ?'

নীলু একটু বেচারা-বেচারা ভাব করে শিবরতনবাবুর দিকে তাকাল। শিবরতনবাবু হেসে বললেন, 'ওর ঘুম ভাঙে বাড়িতে আসার পর। ওকে ওর স্কুলের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তখন ও ঘুমন্ত। বোধহয় ভোর রাত্রের দিকে। তারপর আমাদের বাড়িতে যে লোকটা খবরের কাগজ দেয়, সে ভোরে সাইকেল করে ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায়। ও-ই এসে আমাদের বাড়িতে খবর দেয়। তারপর আমি আর আমার ছেলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। ডাক্তার বললে যে, কোনো ঘুমের ওষুধ একটু হেভি ডোজে খাইয়ে দিয়েছিল আর কি।'

ফেলুদা গম্ভীর। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় একবার শুধু বলল, 'স্কাউন্ড্রেলস্!' তারপর নীলুকে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ নীলুবাবু। এবার তুমি যেতে পার।'

শিবরতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোবার পর সুধীরবাবু বললেন, 'চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করছেন কি ?'

ফেলুদা বলল, 'কয়েকজন অত্যন্ত লোভী এবং বেপরোয়া লোক যে আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে তারা রাজস্থান পর্যন্ত যাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। ভালো কথা, আপনি বরং আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিন। ডক্টর হাজরা তো আর আমাকে চেনেন না। আপনি আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিলে সুবিধে হবে।'

চিঠিটা দেবার পর সুধীরবাবু আরেকবার ফেলুদাকে রাজস্থানের ভাড়াটা অফার করলেন। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। বাসস্টপের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বললেন, 'গিয়ে অন্তত একটা খবর দেবেন স্যার। বড্ড চিন্তায় থাকব। অবিশ্যি ডাক্তারবাবু লিখবেন চিঠি, নিজেই কথা দিয়েছেন। কিন্তু যদি নাও লেখেন, আপনি অন্তত একখানা...'

বাড়িতে ফিরে এসে গোছগাছ করার আগে ফেলুদা তার বিখ্যাত নীল খাতা ভলিউম সিক্স খুলে খাটে বসে বলল, 'কতগুলো তারিখের হিসেব বল তো দেখি—লিখে নি। ডক্টর হাজরা মুকুলকে নিয়ে রাজস্থান রওনা হয়েছেন কবে ?'

'গতকাল ৯ই অক্টোবর।'

'নীলুকে কিডন্যাপ করেছিল কবে ?'

'কালই। সন্ধেবেলা।'

'ফেরত দিয়েছে আজ সকালে, অর্থাৎ ১০ই। আমরা রওনা হচ্ছি কাল ১১ই সকালে। আগ্রা পৌঁছাব ১২ই। সেদিনই বিকেলে ট্রেনে চড়ে সেদিনই রাত্রে পৌঁছাব বান্দিকুই। বান্দিকুই থেকে রাত ১২টায় গাড়ি, মারওয়াড় পৌঁছাব সেদিনই—অর্থাৎ ১৩ই সন্ধ্যাবেলা, ১৩ই...১৩ই...'

এইভাবে ফেলুদা কিছুক্ষণ আপন মনে বিড়বিড় করে কী জানি ক্যালকুলেট করল। তারপর বলল, 'জিয়োমেট্রি। এখানেও জিয়োমেট্রি। একটা বিন্দু—সেই বিন্দুর দিকে কনভার্জ করছে কতগুলো লাইন। জিয়োমেট্রি...'

॥ ৩ ॥

আমরা আধঘণ্টা হল আগ্রা ফোর্ট স্টেশন থেকে বান্দিকুইয়ের ট্রেনে চেপেছি। আগ্রায় হাতে তিন ঘণ্টা সময় ছিল। সেই ফাঁকে দশ বছর বাদে আরেকবার তাজমহলটা দেখে নিলাম, আর ফেলুদাও আমাকে তাজের জিয়োমেট্রি সম্পর্কে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়ে দিল।

গতকাল কলকাতা ছাড়ার আগে একটা জরুরী কাজ সেরে নিয়েছিলাম—সেটার কথা এখানে বলে রাখি। তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল সাড়ে ন'টায়, তাই আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম খুব ভোরে। ছ'টা নাগাদ চা খাবার পর ফেলুদা বলল, 'একবার তোর সিধু জ্যাঠার ওখানে ঢুঁ মারতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারলে সুবিধে হবে।'

সিধু জ্যাঠা থাকেন সর্দার শঙ্কর রোডে। আমাদের তারা রোড থেকে হেঁটে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। এখানে বলে রাখি, সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েছেন। আজকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, কিছুটা সময় সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা একা বই দেখে দাবা খেলেন, আর খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন। এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এক খাবারের সঙ্গে আরেক খাবার মিশিয়ে খাওয়া। উনি বলেন দইয়ের সঙ্গে অমলেট মেখে খেতে নাকি অমৃতের মতো লাগে। আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হন না উনি। আমাদের যে পৈতৃক গ্রাম (আমি যাইনি কক্ষনো) উনি সে গ্রামেরই লোক, আর আমাদের বাড়ির পাশেই ওঁর বাড়ি ছিল। উনি তাই আমার বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠামশাই।

ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেখি সিধু জ্যাঠা দরজার ঠিক মুখটায় একটা মোড়ার উপর বসে নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছেন, যদিও মাথার পিছন দিকে ছাড়া আর কোথাও চুল নেই তাঁর। আমাদের দেখে মোড়াটা পাশ করে বললেন, 'বোসো।

নারায়ণকে হাঁক দিয়ে বলো চা দেবে।'

একটা তক্তপোশ, দুটো চেয়ার, আর ইয়া বড় বড় তিনটে বইয়ের আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। তক্তপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই। আমরা জানতাম ওই খালি জায়গাটাই সিধু জ্যাঠার জায়গা, তাই আমরা চেয়ার দুটোতে বসলাম। ফেলুদা তার ধার-করা মলাট দেওয়া বইটা সঙ্গে এনেছিল, সেটা একটা আলমারির একটা তাকের ফাঁকে গুঁজে দিল।

চুল কাটতে কাটতেই সিধু জ্যাঠা বললেন, 'ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ, ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো? যে কাজেই স্পেশালাইজ কর না কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে আনন্দ আর কনফিডেন্স দুটোই পাবে বেশি।'

ফেলুদা নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিষ্কর্তা কে জান?'

ফেলুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না; পড়েছিলাম বোধহয়।'

আমি বুঝলাম ফেলুদার দিব্যি মনে আছে, কিন্তু সে সিধু জ্যাঠাকে খুশি করার জন্য ভুলে যাওয়ার ভান করছে।

'হুঁ! জিজ্ঞেস করলে অনেকেই দেখবে ফস করে বলে বসবে আলফোঁস বের্তিয়োঁ। কিন্তু সেটা ভুল। কারেক্ট নামটা হচ্ছে হুয়ান ভুকেটিচ। মনে রেখো। আর্জেন্টিনার লোক। বুড়ো আঙুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন। আর সে ছাপকে চারটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই: অবিশ্যি তার কয়েক বছর পরে ইংল্যান্ডের হেনরি সাহেব আরো মজবুত করেন এই সিস্টেমকে।'

ফেলুদা আর বেশি সময় নষ্ট না করে ঘড়ি দেখে বলল, 'আপনি ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার নাম শুনেছেন বোধহয়। যিনি প্যারাসাইকলজি নিয়ে—'

'পাড়া-ছাই-চলো-যাই?'

এটা সিধু জ্যাঠার একটা বাতিক। একেকটা ইংরিজি কথাকে উনি এইভাবেই বেঁকিয়ে বাংলা করে বলেন। Exhibition হল ইস্-কি ভীষণ, Impossible হল আম-পচে-বেল, Dictionary হল দ্যাখস-নাড়ী, Governor হল গোবরনাড়ু—এই রকম আর কী।

'শুনেছি বইকি!' বললেন সিধু জ্যাঠা। 'এই তো সেদিনও কাগজে নাম দেখলাম ওর। কেন—তাকে নিয়ে আবার কী? কিছু গোলমাল করেছে নাকি? ও তো গোলমাল করার লোক নয়। বরং উল্টো। অন্যদের বুজরুকি ধরে দিয়েছে ও।'

'তাই বুঝি ?' ফেলুদা বুঝেছে যে একটা ইন্টারেস্টিং খবরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

'সে জান না বুঝি ? বছর চারেক আগের ব্যাপার। কাগজে বেরিয়েছিল তো। শিকাগোতে এক বাঙালী ভদ্রলোক—ভদ্র আর বলি কী করে, চরম ছোটলোক—এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। খাস শিকাগো শহরে। তরতর করে আমেরিকান খদ্দের জুটে যায়, বুঝেছ ! হুজুগে জাত তো, আর পয়সা অঢেল। হিপ্‌নটিজম অ্যাপ্লাই করে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেবো বলে ক্লেম করেছিল। এইটিনথ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আনটন মেসমার যা করে। এর বেলা দু-একটা ছুটছাট লেগেও গিয়েছিল বোধহয়—যেমন হয় আর কী। সেই সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে যায়। সে জানতে পেরে ব্যাপারটা চাক্ষুষ করতে যায়; গিয়ে ভণ্ডামি ধরে ফেলে। সে এক স্ক্যাণ্ডাল। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে দেশছাড়া করে ছেড়েছিল আমেরিকান সরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ—নাম নিয়েছিল ভবানন্দ.....হাজরা খুব সলিড লোক। অন্তত লেখাটেখা পড়ে তো তাই মনে হয়। খান দুয়েক লেখা তো আমার কাছেই রয়েছে। বাঁ দিকের আলমারির তলার তাকে ডান কোণে দেখ তো। প্যারাসাইকলজিক্যাল সোসাইটির তিনখানা জার্নাল পাবে...'

ফেলুদা ম্যাগাজিন তিনটে ধার করে নেয়। এখন ট্রেনে বসে ও সেগুলোই উল্টেপাল্টে দেখছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি : উত্তর প্রদেশ পেরিয়ে রাজস্থানে ঢুকেছি কিছুক্ষণ আগেই।

'এখানে রোদের তেজই আলাদা। সাধে কী আর লোকগুলো এত পাওয়ারফুল !'

কথাটা এল আমাদের সামনের বেঞ্চি থেকে। ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট, আর যাত্রীও আছি সবসুদ্ধ চারজন। যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমত রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু' ইঞ্চি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যায়নি। ইনি কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। ইনি যে বাঙালী সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কারণ বুশ সার্ট আর প্যান্ট থেকে বোঝা খুব শক্ত। ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা শুনছি। দূর দেশে এসে জাতভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ? আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাতৃভাষাটাকে একরকম বাধ্য হয়েই বয়কট করতে হবে।'

ফেলুদা হয়ত খানিকটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর যাবেন ?'

'যোধপুরটা তো পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে। আপনারা ?'

'আমরাও আপাতত যোধপুর।'

'বাঃ—চমৎকার হল। আপনিও কি লেখেন-টেখেন নাকি?'

'আজ্ঞে না।' ফেলুদা হাসল। 'আমি পড়ি। আপনি লেখেন?'

'জটায়ু নামটা চেনা লাগচে কি?'

'জটায়ু? সেই যে সব রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখেন? আমি তো পড়েওছি তার দু-একটা বই— সাহারায় শিহরন, দুর্ধর্ষ দুশমন—আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে।

'আপনিই জটায়ু?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—ভদ্রলোকের দাঁত বেরিয়ে গেল, ঘাড় নুয়ে পড়ল—'এই অধমেরই ছদ্মনামই জটায়ু। নমস্কার।'

'নমস্কার। আমার নাম প্রদোষ মিত্তির। ইনি শ্রীমান তপেশরঞ্জন।'

ফেলুদা হাসি চেপে রেখেছে কী করে? আমার তো সেই যাকে বলে পেট থেকে ভসভসিয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে। ইনিই জটায়ু! আর আমি ভাবতাম, যেরকম গল্প লেখেন,চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেম্‌স বন্ডের বাবা।

'আমার আসল নাম লালমোহন গাঙ্গুলী। অবিশ্যি বলবেন না কাউকে। ছদ্মনামটা, মানে, ছদ্মবেশের মতোই—ধরা পড়ে গেলে তার আর কোনো ইয়ে থাকে না।'

আমরা আগ্রা থেকে কিছু গুলাবী রেউড়ি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙাটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো বেশ কিছুদিন থেকেই ঘুরছেন বলে মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক 'হ্যাঁ, তা—' বলে একটা রেউড়ি তুলে নিয়েই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন, 'আপনি জানলেন কী করে?'

ফেলুদা হেসে বললেন, 'আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের চামড়ার রোদে-না-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।'

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরেব্বাসরে, আপনার তো ভয়ঙ্কর অবজারভেশন মশাই। ঠিকই ধরেছেন দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি—এইসব একটু ঘুরে দেখলুম আর কী। দিন দশেক হল বেরিয়েচি। অ্যাদ্দিন স্রেফ বাড়িতে বসে বসে দেশ-বিদেশের গপ্পো লিখিচি। থাকি ভদ্রেশ্বরে।এবার তাই ভাবলুম—একটু ঘুরে দেখা যাক, লেখার সুবিধে হবে। আর অ্যাডভেঞ্চারের গপ্পো এইসব দিকেই জমে ভালো, বলুন! দেখুন না কীরকম সব রুক্ষ পাহাড়, বাইসেপ-ট্রাইসেপের মতো ফুলে ফুলে রয়েছে!

বাংলাদেশের—এক হিমালয় ছাড়া—মাস্‌ল নেই মশাই। সমতলভূমিতে কি অ্যাডভেঞ্চার জমে?'

আমরা তিনজনে রেউড়ি খেতে লাগলাম। জটায়ু দেখি মাঝে মাঝে আড়চোখে ফেলুদার দিকে দেখছেন। শেষটায় বললেন, 'আপনার হাইট কত মশাই? কিছু মনে করবেন না।'

'প্রায় ছয়', ফেলুদা বলল।

'ওঃ, দারুণ হাইট। আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি। প্রখর রুদ্র—জানেন তো? রাশিয়ান নাম—প্রখর, কিন্তু বাঙালীকেও কিরকম মানিয়ে গেছে বলুন! আসলে নিজে যা হতে পারলুম না, বুঝেছেন, হিরোদের মধ্যে দিয়ে সেই সব আশ মিটিয়ে নিচ্চি। কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জন্যে? সেই কলেজে থাকতে চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখতুম বিলিতি ম্যাগাজিনে। বুক চিতিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী বুকের ছাতি, কোমরখানা একেবারে সিংহের মতো। চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শরীরে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্‌লের। বলছে—একমাসের মধ্যে আমার মতো চেহারা হয়ে যাবে, আমার সিস্টেম ফলো করে। ওদের দেশে হতে পারে মশাই। বাংলাদেশে ইমপসিব্‌ল। বাপের পয়সা ছিল, কিছু নষ্ট করলুম, লেসন আনালুম, ফলো করলুম—কিস্যু হল না। যেই কে সেই। মামা বললেন—পর্দার রড ধরে ঝুলবি রোজ, দেখবি একমাসের মধ্যে হাইট বেড়ে যাবে। কোথায় একমাস! ঝুলতে ঝুলতে একদিন মশাই রড সুদ্ধু খসে মাটিতে পড়ে হাঁটুর হাড় ডিসলোকেট হয়ে গেল, অথচ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন সেই পাঁচ সাড়ে তিনই রয়ে গেলাম। বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব না। শেষটায় ভাবলুম—দুত্তোরি, গায়ের মাস্‌লের কথা আর ভাবব না, তার চেয়ে ব্রেনের মাস্‌লের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া যাক। আর মেনটাল হাইট। শুরু করলাম রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা। লালমোহন গাংগুলী নাম তো আর চলে না, তাই নিলুম ছদ্মনাম—জটায়ু। ফাইটার। কী ফাইটটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো!'

ট্রেনটাকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বললেও কাছাকাছির মধ্যে এত স্টেশন পড়ছে যে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি একটানা গাড়ি চলতেই পারছে না। ফেলুদা প্যারাসাইকলজিক্যাল পত্রিকা ছেড়ে এখন রাজস্থানের বিষয়ে একটা বই পড়তে শুরু করেছে। রাজস্থানের কেল্লার সব ছবি রয়েছে এ বইতে। সেগুলো সে খুব খুঁটিয়ে দেখছে আর মন দিয়ে তাদের বর্ণনা পড়ছে। আমাদের সামনে আপার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর গোঁফ আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি বাঙালী নন। ভদ্রলোক একটার পর একটা কমলালেবু খেয়ে চলেছেন, আর

তার খোসা আর ছিবড়ে ফেলছেন সামনে পাতা একটা উর্দু খবরের কাগজের উপর।

ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আপনি কি মশাই গোয়েন্দা জাতীয় কিছু ?'

'কেন বলুন তো ?'

'না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন...'

'আমার ও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে।'

'বাঃ ! তা আপনারাও তো যোধপুরেই যাচ্ছেন বলে বললেন।'

'আপাতত।'

'কোনো রহস্য আছে নাকি ? যদি থাকে তো আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ঝুলে পড়ব—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'আপনার উটের পিঠে চড়তে আপত্তি নেই তো ?'

'আরেব্বাস, উট ! ভদ্রলোক চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শিপ অফ দি ডেজার্ট ! এ তো আমার স্বপ্ন মশাই। আমার আরক্ত আরব উপন্যাসে আমি বেদুইনের কথা লিখেছি যে ! তাছাড়া সাহারায় শিহরনেও আছে। অদ্ভুত জীব। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কী রোমান্টিক—ওঃ !'

ফেলুদা বলল, 'পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি ?

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'ওটা ঠিক নয় বুঝি ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'জল আসে উটের কুঁজ থেকে। কুঁজটা আসলে চর্বি। ওই চর্বিকে অক্সিডাইজ করে উট জল করে নেয়। এক নাগাড়ে দশ পনেরো দিন ওই চর্বির জোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবিশ্যি একবার জলের সন্ধান পেলে দশ মিনিটে পঁচিশ গ্যালনও খেয়ে নেয় বলে শোনা গেছে।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস বললেন। নেক্সট এডিশনে ওটা কারেক্ট করে দেবো।'

॥ ৪ ॥

এখানকার ট্রেন ঢিমে হলেও, বেশি যে লেট করছে না এটাই ভাগ্যি। গাড়ি বদল করার ব্যাপার যেখানে থাকে, সেখানে লেট করলে অনেক সময় ভারী মুশকিল হয়।

ভরতপুর স্টেশনে এসে আমরা প্রথম ময়ূর দেখলাম। প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে তিনটে ময়ূর দিব্যি লাইনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফেলুদা বলল, 'কলকাতায়

যেমন কাক-চড়ুই দেখিস সর্বত্র, এখানে তেমনি দেখবি ময়ূর আর টিয়া।'

লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাট্টার সাইজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা সবাই রাজস্থানী। এদের পরনে খাটো ধুতি হাঁটু অবধি তোলা, আর একপাশে বোতামওয়ালা জামা। এ ছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগরা, আর অনেকের হাতেই একটা করে লাঠি।

বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে রুটি আর মাংসের ঝোল খেতে-খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এই যে সব লোক দেখছেন, এদের মধ্যে এক-আধটা ডাকাত থাকার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি। আরাবল্লী পাহাড় হল গিয়ে ডাকাতদের আস্তানা, জানেন তো? আর এ সব ডাকাত কীরকম পাওয়ারফুল হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। জানালার লোহার শিক দু-হাতে দু-দিকে টেনে ফাঁক করে জেলখানা থেকে পালায় মশাই এরা।'

ফেলুদা বলল, 'জানি। আর কারুর উপর ক্ষেপে গেলে এরা কীভাবে শাস্তি দেয় বলুন তো?'

'মেরে ফেলে নিশ্চয়ই?'

'উঁহু। ওইখানেই তো মজা। সে লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে বের করে তলোয়ার দিয়ে নাকটা কেটে ছেড়ে দেয়।'

লালমোহনবাবুর হাতের মাংসের টুকরোটা আর মুখে পোরা হল না।

'নাক কেটে?'

'তাই তো শুনেছি।'

'এ যে সেই পৌরাণিক যুগের সাজার মতো মনে হচ্ছে মশাই। কী সাংঘাতিক!'

মাঝরাত্তিরে মারওয়াড়ের ট্রেনে ওঠার সময় অন্ধকারে একটু হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করতে হলেও, জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। রাত্রে ঘুমও হল ভালো। সকালে ঘুম থেকে উঠে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পুরোনো কেল্লা দেখতে পেলাম। তার এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি কিষণগড় স্টেশনে এসে থামল। ফেলুদা বলল, 'জায়গার নামে গড় আছে দেখলেই বুঝবি কাছাকাছির মধ্যে কোথাও এরকম একটা পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা আছে।'

কিষণগড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে চা খেলাম। এখানকার চায়ের ভাঁড়গুলো দেখলাম বাংলাদেশের ভাঁড়ের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর মজবুত। চায়ের স্বাদও একটু অন্য রকম। ফেলুদা বলল যে, উটের দুধ দিয়ে তৈরি। সেটা শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু পর পর দু'ভাঁড় চা খেলেন।

চা খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কলে চট করে দাঁতটা মেজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বিরাট পাগড়ি মাথায় একটা রাজস্থানী লোক নাক

অবধি চাদর ঢেকে বেঞ্চির উপর পা তুলে হাঁটুর উপর থুতনি ভর করে লালমোহনবাবুর বেঞ্চির একটা পাশ দখল করে বসে আছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে ভেতরের জামার রংটা দেখলাম টকটকে লাল।

লালমোহনবাবু কামরায় ঢুকে তাকে দেখেই সটান নিজের জায়গা ছেড়ে আমাদের বেঞ্চির একটা কোণে বসে পড়লেন। ফেলুদা 'তোরা আরাম করে বোস' বলে একেবারে সেই রাজস্থানীটার পাশেই বসে পড়ল।

আমি লোকটার পাগড়িটা লক্ষ করছিলাম। কত অজস্র প্যাঁচ আছে ওই পাগড়িতে সেটা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। লালমোহনবাবু চাপা গলায়

ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'পাওয়ারফুলি সাসপিশাস্। এরকম চাষাভুষোর মতো পোশাক অথচ দিব্যি প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসে আছে। কত হীরেজহরত আছে ওই পুঁটলিটার মধ্যে কে জানে!'

পুঁটলিটা পাশেই রাখা ছিল। ফেলুদা খালি একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর থেকে রাজস্থানের বইটা বার করে নিল। আমি নিউম্যানের ব্র্যাড্‌শ টাইম-টেবলটা খুলে সামনে কী কী স্টেশন পড়বে দেখতে লাগলাম। অদ্ভুত নাম এখানকার সব স্টেশনের—গালোটা, তিলাওনিয়া, মাক্রেরা, ভেসানা, সেন্দ্রা। কোত্থেকে এল এসব নাম কে জানে। ফেলুদা বলে জায়গার নামের মধ্যে নাকি অনেক ইতিহাস লুকোনো থাকে। কিন্তু সে সব ইতিহাস খুঁজে বার করবে কে?

গাড়ি ঘটর ঘটর করে চলেছে, আমি রাজকাহিনীর শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্যের কথা

ভাবছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম আমার সার্টের পাশটায় একটা টান পড়ছে। পাশ ফিরে দেখি লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি ঢোক গিলে শুকনো গলায় ফিস ফিস করে বললেন, 'ব্লাড।'

ব্লাড? লোকটা বলে কী?

তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনের রাজস্থানী লোকটার দিকে। লোকটা মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির উপরে তোলা পা দুটোর দিকে চোখ গেল। দেখলাম, বুড়ো আঙুলের পাশটা ফুলে উঠে রক্ত জমে রয়েছে। তারপর বুঝলাম এতক্ষণ কাপড়ে যেগুলোকে মাটির দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলো আসলে শুকনো লাগচে রক্ত।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, ও দিব্যি একমনে বই পড়ে চলেছে।

লালমোহনবাবুর পক্ষে বোধ হয় ফেলুদার নিশ্চিন্ত ভাবটা সহ্য হল না। তিনি হঠাৎ সেই শুকনো গলাতেই বলে উঠলেন, মিস্টার মিটার, সাস্পিশাস্ ব্লাড-মার্কস্ অন আওয়ার নিউ কো-প্যাসেঞ্জার।'

ফেলুদা বই থেকে চোখ তুলে একবার ঘুমন্ত লোকটার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'প্রব্যাবলি কজ্‌ড বাই বাগ্‌স।'

রক্তের কারণ ছারপোকা হতে পারে জেনে জটায়ু কেমন জানি মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভয় যে কাটল না সেটা তাঁর জড়োসড়ো ভাব আর বার বার ভুরু কুঁচকে আড়চোখে ঘুমন্ত লোকটার দিকে চাওয়া থেকে বুঝতে পারছিলাম।

দুপুর আড়াইটার সময় গাড়ি মারওয়াড় জংশনে পৌঁছাল। খাওয়াটা স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে সেরে ঘণ্টাখানেক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে সাড়ে তিনটেয় যোধপুরের গাড়িতে ওঠার সময় আর সেই লাল জামা পরা লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

আড়াই ঘণ্টার জার্নির মধ্যে ঘন ঘন উটের দল চোখে পড়ায় লালমোহনবাবু বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যোধপুরে পৌঁছলাম ছটা বেজে দশ মিনিটে। ট্রেনটি কুড়ি মিনিট লেট করেছে। কলকাতা হলে এতক্ষণে সূর্য ডুবে যেত, কিন্তু এদিকটা পশ্চিমে বলে এখনো দিব্যি রোদ রয়েছে।

আমাদের বুকিং ছিল সার্কিট হাউসে। লালমোহনবাবু বললেন তিনি নিউ বম্বে লজে থাকছেন। 'কাল সকাল সকাল এসে পড়ব, একসঙ্গে ফোর্টে যাওয়া যাবে' বলে ভদ্রলোক টাঙ্গার লাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শুনলাম সার্কিট হাউসটা খুব কাছেই। যেতে যেতে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে লক্ষ করছিলাম একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল—প্রায় একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু! ফেলুদা

বলল, এককালে পুরো যোধপুর শহরটাই নাকি ওই পাঁচিলটা দিয়ে ঘেরা ছিল। ওটার সাত জায়গায় নাকি সাতটা ফটক আছে। বাইরে থেকে সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে জানলে ওই ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত।

আরেকটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ্ বাঁ দিকে।'

চেয়ে দেখি শহরের বাড়ির মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট থমথমে এক কেল্লা। বুঝলাম ওটাই হল বিখ্যাত যোধপুর ফোর্ট। আমি জানতাম এখানকার রাজারা মোগলদের হয়ে লড়াই করেছে।

কখন কেল্লাটা কাছ থেকে দেখতে পাবো সেটা ভাবতে ভাবতেই সার্কিট হাউসে পৌঁছে গেলাম। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে একটা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পোর্টিকোর তলায় আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়াল। মালপত্তর নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কিনা আর ফেলুদার নাম মিস্টার মিটার কিনা। ফেলুদা 'হ্যাঁ' বলাতে ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের জন্য একতলায় একটা ডাবল রুম বুক করা আছে। খাতায় নাম সই করার সময় আমাদের নামের কয়েক লাইন উপরেই পর পর দুটো নাম চোখে পড়ল—ডক্টর এইচ এম হাজরা আর মাস্টার এম ধর।

সার্কিট হাউসের প্ল্যানটা খুব সহজ। ঢুকেই একটা বড় খোলা জায়গা, বাঁ দিকে রিসেপশন কাউন্টার আর ম্যানেজারের ঘর, সামনে দোতলার সিঁড়ি, ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকে লম্বা বারান্দার পাশে পর পর লাইন করে ঘর। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। একজন বেয়ারা এসে আমাদের মাল তুলে নিল, আমরা তার পিছন পিছন ডান দিকের বারান্দা দিয়ে রওনা দিলাম তিন নম্বর ঘরের দিকে। একজন সরু গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারে বসে একজন মারওয়াড়ি টুপি পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন; আমরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালী মনে হচ্ছে?' ফেলুদা হেসে 'হ্যাঁ' বলল। আমরা তিন নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। একপাশে একটা দু'জন-বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আর একটা গোল টেবিলের উপর একটা অ্যাশ-ট্রে। এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাস্ক, গেলাস আর বেড-সাইড ল্যাম্প। ঘরের সঙ্গে লাগা বাথরুমের দরজাটা বাঁ দিকে।

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আনতে বলে পাখাটা খুলে দিয়ে সোফায় বসে বলল, 'খাতায় নাম দুটো দেখলি?'

আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওই ছাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা লোকটা আশা করি

ডক্টর হাজরা নন।'

'কেন? হলে ক্ষতি কী?'

ক্ষতি যে কী সেটা অবিশ্যি আমি চট করে ভেবে বলতে পারলাম না। ফেলুদা আমার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, 'তোর আসলে লোকটাকে দেখে ভালো লাগেনি। তুই মনে মনে চাইছিস যে ডক্টর হাজরা লোকটা খুব শান্তশিষ্ট হাসিখুশি অমায়িক হন—এই তো?'

ফেলুদা ঠিকই ধরেছে। এ লোকটাকে দেখলে বেশ সেয়ানা বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বোধহয় বেশ লম্বা আর জাঁদরেল। ডাক্তার বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নয়।

ফেলুদা একটা সিগারেট শেষ করতে না করতেই চা এসে গেল, আর বেয়ারা ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই দরজায় টোকা পড়ল। ফেলুদা ভীষণ বিলিতি কায়দায় বলে উঠল, 'কাম ইন!' পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকলেন মিলিটারি গোঁফ।

'ডিসটার্ব করছি না তো?'

'মোটেই না। বসুন। চা খাবেন?'

'নাঃ। এই অল্পক্ষণ আগেই খেয়েছি। আর ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং—চা-টা এখানে তেমন সুবিধের নয়। শুধু এখানে বলছি কেন, ভারতবর্ষ হল খাস চায়ের দেশ, অথচ ক'টা হোটেলে ক'টা ডাকবাংলোয় ক'টা সার্কিট হাউসে ভালো চা খেয়েছেন আপনি বলুন তো? অথচ বাইরে যান, বিদেশে যান—অ্যালবেনিয়ার মতো জায়গায় গিয়ে ভালো চা খেয়েছি জানেন? ফার্স্ট ক্লাস দার্জিলিং টি। আর ইউরোপের অন্য বড় শহরে তো কথাই নেই। একমাত্র খারাপ যেটা লাগে সেটা হল কাপড়ের থলিতে চায়ের পাতার ব্যাপারটা—যাকে টি-ব্যাগস বলে। কাপে থাকবে গরম জল, আর একটা সুতো বাঁধা কাপড়ের থলিতে থাকবে চায়ের পাতা। সেইটে জলে ডুবিয়ে লিকার তৈরি করে নিতে হবে আপনাকে। তারপর তাতে আপনি দুধ দিন কী লেবু কচলে দিন সেটা আপনার রুচি। লেমন টি-টাই আমি বেশি প্রেফার করি। তবে তার জন্যে চাই ভালো লিকার। এখানকার চা খুব অর্ডিনারি।'

'আপনার তো অনেক দেশ-টেশ ঘোরা আছে বুঝি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ওইটেই তো করেছি সারা জীবন ধরে', ভদ্রলোক বললেন। 'আমি হলাম যাকে বলে গ্লোব-ট্রটার। তার সঙ্গে আবার শিকারের শখও আছে। সেটা অবিশ্যি আফ্রিকায় থাকতেই হয়েছিল। আমার নাম মন্দার বোস।'

গ্লোব-ট্রটার উমেশ ভট্টাচার্যের নাম শুনেছি, কিন্তু এঁর নাম তো শুনিনি। ভদ্রলোক যেন আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই বললেন, 'অবিশ্যি আমার নাম

আপনাদের শোনার কথা নয়। যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, তখন কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল। তারপর এই ছত্রিশ বছর পরে মাস তিনেক হল সবে দেশে ফিরেছি।'

'সে অনুপাতে আপনার বাংলার উপর দখলটা তো ভালো আছে বলতে হবে।'

'দেখুন মশাই, সেটা এনটায়রলি আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি বিদেশে বাংলা ভুলবেন বলে ইচ্ছে করেন, তা হলে তিন মাসে ভুলে যেতে পারেন। আর তা যদি ইচ্ছে না করেন, তা হলে ত্রিশ বছরেও ভোলবার কোনো চান্স নেই। অবিশ্যি আমি আবার বাঙালীর সঙ্গও পেয়েছি যথেষ্ট। কিনিয়াতে একবার হাতির দাঁতের ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে একটি বাঙালী ছিলেন। আমরা এক সঙ্গে ছিলাম প্রায় সাত বছর।'

'সার্কিট হাউসে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঙালী আছেন কি?'

এটা অনেকবার লক্ষ করেছি, বাজে কথায় সময় নষ্ট করার লোক ফেলুদা নয়!

ভদ্রলোক বললেন, 'আছে বইকি। সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে আমার। আসলে কলকাতায় বাঙালীদের আর সোয়াস্তি নেই সেটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই সুযোগ পেলেই এদিকে ওদিকে গিয়ে ঘুরে আসছে। অবিশ্যি দিস ম্যান হ্যাজ কাম উইথ এ পারপাস্। ভদ্রলোক সাইকলজিস্ট। তবে গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হয়। সঙ্গে একটি ছেলে আছে বছর আষ্টেকের, সে নাকি জাতিস্মর। পূর্বজন্মে রাজস্থানে কোনো কেল্লার কাছে নাকি জন্মেছিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডাক্তারটি বুজরুক না ছেলেটি ধাপ্পা দিচ্ছে বোঝা শক্ত। এমনিতেও ছেলেটির হাবভাব সাসপিশাস্। কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। ভেরি ফিশি। অনেক তো দেখলুম ভণ্ডামি এই ত্রিশ বছরে, আবার এখানে এসেও যে সেই একই জিনিস দেখতে হবে তা ভাবিনি।'

'আপনি কি এখানেও ট্যুরিং করতে এসেছেন নাকি?'

ভদ্রলোক হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, 'টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ—নিজের দেশটা ভালো করে দেখাই হয়নি এখনো। বাই দ্য ওয়ে—আপনার পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না!'

ফেলুদা নিজের আর আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি আবার আমার দেশের বাইরে কোথাওই যাইনি।'

'আই সী: ওয়েল—সাড়ে আটটা নাগাদ যদি ডাইনিং রুমে আসেন তো আবার দেখা হবে। আমার আবার আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ...'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাও দু'জনে বাইরের বারান্দায় এলাম। এসে দেখলাম, গেট দিয়ে একটা ট্যাক্সি ঢুকছে। সেটা এসে সার্কিট হাউসের সামনে থামল, আর

সেটা থেকে নামল একটি বছর চল্লিশের মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক আর একটা রোগা ফরসা বাচ্চা ছেলে। বোঝাই গেল যে এরাই হচ্ছে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা এবং জাতিস্মর শ্রীমান মুকুল ধর।

॥ ৫ ॥

মিস্টার বোস ডক্টর হাজরাকে গুড ইভনিং বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ডক্টর হাজরা ছেলেটির হাত ধরে বারান্দা দিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে এসে, বোধহয় হঠাৎ দু'জন অচেনা বাঙালীকে দেখে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদা হেসে নমস্কার করে বলল, 'আপনিই বোধ হয় ডক্টর হাজরা?'

'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো—?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে ডক্টর হাজরাকে দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সত্যি বলতে কী, আমরা আপনার খোঁজেই এসেছি। সুধীরবাবুর অনুরোধে। সুধীরবাবু একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন আপনার নামে।'

'ও। আই সী। মুকুল, তুমি ঘরে যাও, আমি এঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি, কেমন?'

'আমি বাগানে যাব।'

ছেলেটির গলা বাঁশির মতো মিষ্টি, যদিও কথাটা বলল, একেবারে নেড়াভাবে, এক সুরে। প্রায় যেন একটা যন্ত্রের মানুষের ভেতর থেকে কথা বেরোচ্ছে। ডক্টর হাজরা বললেন, 'ঠিক আছে, বাগানে যাও, তবে লক্ষ্মী হয়ে থেকো, গেটের বাইরে যেও না, কেমন?'

ছেলেটি আর কিছু না বলে বারান্দা থেকে এক লাফে নুড়িফেলা জায়গাটায় নামল। তারপর একটা ফুলের লাইন টপকে বাগানের ঘাসের উপর পৌঁছে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ডক্টর হাজরা আমাদের দিকে ফিরে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'কোথায় বসবেন?'

'আসুন আমাদের ঘরে।'

ডক্টর হাজরার কানের চুলে পাক ধরেছে। চোখ দুটোয় বেশ একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। কাছ থেকে দেখে মনে হল বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে সুধীরবাবুর চিঠিটা দিয়ে তাঁকে একটা চারমিনার অফার করল। ভদ্রলোক একটু হেসে 'ও রসে বঞ্চিত' বলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

পড়া হলে পর ডক্টর হাজরা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে রাখলেন।

ফেলুদা এবার নীলুকে কিডন্যাপ করার ঘটনা বলে বলল, 'সুধীরবাবু ভয় পাচ্ছিলেন যে ওই লোকগুলো হয়ত মুকুলকে ধাওয়া করে একেবারে যোধপুর পর্যন্ত চলে এসেছে। সেই কারণেই উনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি খানিকটা তাঁর অনুরোধে পড়েই এসেছি। অবিশ্যি দুর্ঘটনা যদি কোনো না ঘটে তাহলেও আমাদের আসাটা যে একেবারে ব্যর্থ হবে তা নয়, কারণ রাজস্থান দেখার শখটা অনেক দিনের।'

ডক্টর হাজরা একটুক্ষণ ভেবে বললেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ যাকে বলে সে রকম অবিশ্যি এখনো পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের অতগুলো কথা না বললেও চলত। আমি সুধীরবাবুকে বলেছিলাম যে ইনভেস্টিগেশনটা সেরে নিই, তারপর আপনি যত ইচ্ছা রিপোর্টার ডাকতে চান ডাকতে পারেন। বিশেষ করে যেখানে গুপ্তধনের কথাটা বলছে। আমি না হয় জানি যে কোনো কথাটারই হয়ত ভিত্তি নেই, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে।'

'জাতিস্মর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?'

'মনে যা করি সেটাকে তো এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে ঢিল মারা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অথচ ঢিল না মেরেই বা কী করি বলুন। জাতিস্মর যে আগেও এক-আধটা বেরোয়নি তা তো নয়। আর তাদের অনেক কথাই তো হুবহু মিলে গেছে। সেই জন্যেই যখন এই মুকুল ছেলেটির খবর পাই, তখনই ঠিক করি যে একে নিয়ে একটা খরো ইনভেস্টিগেশন করব। যদি দেখি যে এর কথার সঙ্গে সব ডিটেল মিলে যাচ্ছে, তখন সেটাকে একটা প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে ধরে তার উপর গবেষণা চালাব।'

'কিছুদূর এগিয়েছেন কি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এইটে অন্তত বুঝেছি যে, রাজস্থান সম্বন্ধে কোনো ভুল করিনি। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে মুকুলের হাবভাব বদলে গেছে। বুঝতেই তো পারছেন, বাপ-মা-ভাই-বোনকে এই প্রথম ছেড়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এল, অথচ এই ক'দিনে একটিবার তাদের নাম পর্যন্ত করল না।'

'আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?'

'কোনো গোলমাল নেই। কারণ, বুঝতেই তো পারছেন, আমি ওকে ওর স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে চলেছি। ওর সমস্ত মনটাই তো পড়ে আছে ওর সোনার কেল্লার দেশে, আর এখানে এসে কেল্লা দেখলেই ও লাফিয়ে উঠছে।'

'কিন্তু সোনার কেল্লা দেখেছে কি?'

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন।

না। তা দেখেনি। আসবার পথে কিষণগড় দেখিয়ে এনেছি। গতকাল সন্ধ্যায় এখানকার কেল্লাটা দেখেছে বাইরে থেকে। আজ বারমের নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিবারই বলে—এটা নয়—আরেকটা দেখবে চলো। এ ব্যাপারে ধৈর্য লাগে মশাই। অথচ চিতোর উদয়পুরের দিকটা গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ ওদিকে বালি নেই। বালির কথা ও বার বার বলে, আর বালি বলতে এদিকটাতেই আছে, আর আগেও তাই ছিল। কাল তাই ভাবছি বিকানিরটা দেখিয়ে আনব।'

'আমরা আপনার সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আর শুধু তাই না। আপনি সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারব, কারণ...একটা ঘটনা...'

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ফেলুদা সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করেছিল, কিন্তু সেটা আর খুলল না।

'কাল সন্ধ্যায় একটা টেলিফোন এসেছিল,' ডক্টর হাজরা বললেন।

'কোথায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই সার্কিট হাউসে। আমি তখন কেল্লা দেখতে গেছি। কেউ একজন ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিনা। ম্যানেজার ন্যাচারেলি হ্যাঁ বলে দিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কলকাতার কাগজের খবরটা এখানে কেউ কেউ হয়ত জানে, এবং সেই জন্যেই সেটাকে ভেরিফাই করার জন্যে এখানে ফোন করেছে। যোধপুরে তো বাঙালীর অভাব নেই; এসব ব্যাপারে কৌতূহল জিনিসটা স্বাভাবিক নয় কি?'

'বুঝলাম। কিন্তু সে লোক আমি এসেছি জেনেও আর খোঁজ করল না কেন? বা এখানে এল না কেন?'

'হুঁ...' ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় আমি আপনার সঙ্গে থাকাটাই ভালো। আর মুকুলকেও একা ছাড়বেন না বেশি।'

'পাগল!'

ডক্টর হাজরা উঠে পড়লেন।

'কালকের জন্যে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা আছে। আপনারা তো মাত্র দু'জন, তাই একটা ট্যাক্সিতেই হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক যখন দরজার দিকে এগোচ্ছেন তখন ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল—

'ভালো কথা—শিকাগোতে আপনাকে জড়িয়ে একবার কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি? এই বছর চারেক আগে?'

ডক্টর হাজরা ভুরু কুঁচকোলেন।

'ঘটনা ? শিকাগোতে আমি গেছি বটে...'

'একটা আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় সংক্রান্ত ব্যাপার... ?'

ডক্টর হাজরা হো হো করে হেসে উঠলেন—'ওহো—সেই স্বামী ভবানন্দের ব্যাপার ? যাকে আমেরিকানরা বলত বাব্যাশাভা ! ঘটেছিল বটে, কিন্তু কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা অতিরঞ্জিত। লোকটা ভণ্ড ঠিকই, কিন্তু সে রকম ভণ্ড অনেক হাতুড়ে, অনেক টোটকাওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তার চেয়ে বেশি কিছু না। ওর বুজরুকি আসলে ধরে ফেলে ওর পেশেন্টরাই। খবরটা রটে যায়। প্রেস থেকে আমার কাছে আসে ওপিনিয়নের জন্য। আমি বরং ওর সম্বন্ধে খানিকটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম। কাগজে তিলটাকে তাল করে ছাপায়। তারপর আমার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। আমি নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই—অ্যান্ড উই পার্টেড অ্যাজ ফ্রেন্ডস।'

'ধন্যবাদ। কাগজের রিপোর্ট দেখে আমার ধারণা অন্যরকম হয়েছিল।'

ডক্টর হাজরার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘর থেকে বেরোলোম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশটা এখনো লাল, তবে রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। কিন্তু মুকুল কোথায় ? বাগানে ছিল সে, কিন্তু এখন দেখছি নেই। ডক্টর হাজরা চট করে একবার নিজের ঘরে খুঁজে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন।

'ছেলেটা গেল কোথায়' বলে ভদ্রলোক বারান্দা থেকে বাইরে নামলেন। আমরা তার পিছন পিছন গেলাম বাগানে। বাগানে যে নেই সে ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'মুকুল !' ডক্টর হাজরা ডাক দিলেন। 'মুকুল !'

'ও আপনার ডাক শুনেছে,' ফেলুদা বলল। 'ও আসছে।'

আবছা অন্ধকারে দেখলাম মুকুল রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকল। আর সেই সঙ্গে দেখলাম উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে একটা লোক দ্রুত হেঁটে পুবদিকে নতুন প্যালেসের দিকটায় চলে গেল। লোকটার মুখ দেখতে পারলাম না বটে, কিন্তু তার গায়ের জামার টকটকে লাল রংটা এই অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ফেলুদা দেখেছে কি লোকটাকে ?

মুকুল এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডক্টর হাজরা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন—

'ওরকমভাবে বাইরে বেরোতে হয় না মুকুল !'

'কেন ?' মুকুল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'অচেনা জায়গা—কতরকম দুষ্ট লোক আছে এখানে।'

'আমি তো চিনি।'

'কাকে চেনো ?'

মুকুল হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখাল—

'ওই যে, যে লোকটা এসেছিল।'

হেমাঙ্গবাবু মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ দা ট্রাবল। কাকে যে সত্যি করে চেনে আর কাকে যে পূর্বজন্মে চিনত তা বলা মুশকিল।'

লক্ষ করলাম মুকুলের হাতে কী জানি একটা কাগজের টুকরো চক চক করছে। ফেলুদাও দেখেছিল সেটা। বলল, 'তোমার হাতের কাগজটা একবার দেখব ?'

মুকুল কাগজটা দিল। একটা দু' ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনালি রাংতা।

'এটা কোথায় পেলে মুকুল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এইখানে', বলে মুকুল ঘাসের দিকে আঙুল দেখাল।

'এটা আমি রাখতে পারি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওটা আমি পেয়েছি।' সেই একই সুর। একই ঠাণ্ডা গলার স্বর। অগত্যা ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

ডক্টর হাজরা বললেন, 'চলো মুকুল, ঘরে যাই। হাত-মুখ ধুয়ে তারপর খেতে যাবো আমরা। চলি মিস্টার মিত্তির। কাল ঠিক সাড়ে সাতটায় আর্লি ব্রেকফাস্ট করে বেরোচ্ছি আমরা।'

খেতে যাবার আগেই ফেলুদা সুধীরবাবুকে পৌঁছ-খবর আর মুকুলের খবর দিয়ে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়েছিল। স্নানটান সেরে যখন ডাইনিং রুমে পৌঁছেছি ততক্ষণে ডক্টর হাজরা আর মুকুল ঘরে চলে গেছেন। মন্দারবাবুকে দেখলাম উল্টো দিকের কোনায় সেই অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে পুডিং খাচ্ছেন। আমাদের সুপ আসতে আসতে তাঁরা উঠে পড়লেন। দরজার দিকে যাবার পথে মন্দার বোস হাত তুলে গুডনাইট জানিয়ে গেলেন।

দু'দিন ট্রেনে পথ চলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। ইচ্ছে ছিল, খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ফেলুদার জন্য একটুক্ষণ জেগে থাকতে হল। ফেলুদা তার নীল খাতা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসেছে, আর আমি খাটে গিয়ে শুয়েছি। সঙ্গে অ্যান্টি-মশা মলম ছিল বলে আর মশারি টাঙাতে দিইনি।

ফেলুদা ডট পেনের পেছনটা টিপে নিবটা বার করে নিয়ে বলল, 'কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।'

বললাম, 'কবে থেকে শুরু করব ?'

'সুধীর ধরের আসা থেকে।'

'তাহলে প্রথমে সুধীরবাবু। তারপর নিবারণ। তারপর নীলু। তারপর

শিবরতনবাবুর চাকর—'

'নাম কী?'

'মনে নেই।'

'মনোহর। তারপর?'

'তারপর জটায়ু।'

'আসল নাম কী?'

'লালমোহন।'

'পদবী?'

'পদবী...পদবী... গাঙ্গুলী।'

'গুড।'

ফেলুদা লিখে চলেছে। আমিও বলে চললাম।

'তারপর সেই লাল জামা পরা লোকটা।'

'আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে?'

'না—তা হয়নি—'

'ঠিক আছে। নেক্সট?'

'মন্দার বোস। আর তার সঙ্গে যে লোকটা ছিল।'

'আর মুকুল ধর, ডক্টর—'

'ফেলুদা!'

আমার চিৎকারে ফেলুদার কথা থেমে গেল। আমার চোখ পড়েছে ফেলুদার বিছানার উপর। কী যেন একটা বিশ্রী জিনিস বালিশের তলা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে। আমি সেদিকে আঙুল দেখালাম।

ফেলুদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বালিশটাকে সরিয়ে ফেলতেই একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা বিছানার চাদরটা ধরে একটা ঝটকা টান দিয়ে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চটি দিয়ে তিনটে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সেটাকে সাবাড় করল। তারপর একটা খবরের কাগজের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে থেঁতলানো বিছেটাকে তার মধ্যে তুলে বাথরুমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে কাগজটাকে পুঁটলি পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'জমাদারের আসার দরজাটা খোলা ছিল, তাই এ ব্যাটা ঢুকতে পেরেছে। নে, তুই এবার ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে ওঠা আছে।'

আমার কিন্তু মোটেই অতটা নিশ্চিন্ত লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছিল—নাঃ, থাক। যদি আমার টেলিপ্যাথির জোর থাকে, তাহলে হয়ত বিপদের কথা বেশি ভাবলেই বিপদ এসে পড়বে। তার চেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা দেখি।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে উঠে দাঁতটাত মেজে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা চেনা গলায় শুনলাম, 'গুড মর্নিং!' জটায়ু হাজির। ফেলুদা আগেই বারান্দায় বেরিয়ে বেতের চেয়ারে বসে চায়ের অপেক্ষা করছিল। লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওঃ—কী থ্রিলিং জায়গা মশাই! ফুল অফ পাওয়ারফুল সাস্‌পিশাস্ ক্যারেক্টারস্!'

'আপনি অক্ষত আছেন তো?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কী বলচেন মশাই! এখানে এসে দারুণ ফিট লাগছে। আজ আমাদের লজের ম্যানেজারকে পাঞ্জায় চ্যালেঞ্জ করেছিলুম। ভদ্রলোক রাজী হলেন না।' তারপর এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার কাছে একটি অস্ত্র আছে সুটকেসে—'

'গুলতি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নো স্যার! একটি নেপালী ভোজালি। খাস কাটমুণ্ডুর জিনিস। কেউ অ্যাটাক করলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবো পেটের মধ্যে, তারপর যা থাকে কপালে। অনেকদিনের শখ একটা ওয়েপনের কালেকশন করব, বুঝেছেন।'

আমার আবার হাসি পেলো, কিন্তু ক্রমেই সংযম অভ্যেস হয়ে আসছে, তাই সামলে গেলাম। লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'আজকের প্ল্যান কী আমাদের? ফোর্ট দেখতে যাচ্ছেন না?'

ফেলুদা বলল, 'যাচ্ছি বটে, তবে এখানে নয়, বিকানির।'

'হঠাৎ আগেভাগে বিকানির? কী ব্যাপার?'

'সঙ্গী পাওয়া গেছে। গাড়ি যাচ্ছে একটা।'

বারান্দার পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা গুড মর্নিং শোনা গেল। গ্লোব-ট্রটার আসছেন। 'ঘুম হল ভালো?'

লালমোহনবাবু দেখলাম মন্দার বোসের মিলিটারি গোঁফ আর জাঁদরেল চেহারার দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। ফেলুদা দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন।

'আরেব্বাস! গ্লোব-ট্রটার?' লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া। 'আপনাকে তো তাহলে কালটিভেট করতে হচ্ছে মশাই। অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই আপনার!'

'কোন রকমটা চাই আপনার?' মন্দার বোস হেসে বললেন, 'এক ক্যানিবলের হাঁড়িতে সেদ্ধ হওয়াটাই বাদ ছিল, বাকি প্রায় সব রকমই হয়েছে।'

মুকুল যে কখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। এখন দেখলাম সে চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এবার ডক্টর হাজরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক কাঁধে একটা ফ্লাস্ক, আরেকটায় একটা বাইনোকুলার, আর গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা। বললেন, 'প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। আপনাদের ফ্লাস্ক থাকলে সঙ্গে নিয়ে নেবেন। পথে কী পাওয়া যাবে ঠিক নেই। আমি হোটেলে বলে দিয়েছি—চারটে প্যাক্‌ড লাঞ্চ দিয়ে দেবে।'

মন্দার বোস বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা সব?'

বিকানিরের কথা শুনে ভদ্রলোক মেতে উঠলেন—

'যাওয়াই যদি হয় তাহলে সব এক সঙ্গে গেলেই হয়।'

'দি আইডিয়া!' বললেন জটায়ু।

ডক্টর হাজরা একটু কাচুমাচু ভাব করে বললেন, 'সবসুদ্ধ তাহলে ক'জন যাচ্ছি আমরা?'

মন্দার বোস বললেন, 'এক গাড়িতে সবাই যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আই উইল অ্যারেঞ্জ ফর অ্যানাদার ট্যাক্সি। আমার সঙ্গে মিস্টার মাহেশ্বরীও যাবেন বোধহয়।'

'আপনি যাবেন কি?' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হাজরা।

'গেলে শেয়ারে যাবো। কারুর স্কন্ধে চাপতে রাজী নই। আপনারা চারজন একটাতে যান। আমি মিস্টার গ্লোব-ট্রটারের সঙ্গে আছি।'

বুঝলাম, ভদ্রলোক মন্দারবাবুর কাছে থেকে গল্প শুনে ওঁর প্লটের স্টক বাড়াতে চাচ্ছেন। অলরেডি উনি কম করে পঁচিশখানা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখেছেন। ভালোই হল; এক গাড়িতে পাঁচজন হলে একটু বেশি ঠাসাঠাসি হত। মন্দারবাবু ম্যানেজারকে বলে আরেকটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে ফেললেন। লালমোহনবাবু নিউ বসে লজে তৈরি হতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমাকে কাইন্ডলি পিক আপ করে নেবেন। আমি হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে রেডি হয়ে থাকছি।'

আগেই বলে রাখি—বিকানিরের কেল্লাও মুকুল একবার দেখেই বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাই আজকের দিনের আসল ঘটনা নয়। আসল ঘটনা ঘটল দেবীকুণ্ডে, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা সত্যিই দুর্ধর্ষ দুশমনের পাল্লায় পড়েছি।

বিকানির যাবার পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি, কেবল মাইল ষাটেক যাবার পর একটা বেদের দলকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সংসার পেতে বসেছে। মুকুল গাড়ি থামাতে বলে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসে বলল যে, তাদের চেনে।

এরপরে ফেলুদার সঙ্গে ডক্টর হাজরার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল মুকুলকে নিয়ে, সেটা এখানে বলে রাখি। এইসব কথা মুকুল ড্রাইভারের পাশে বসে শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না ; কিন্তু পেলেও তার হাবভাবে সেটা কিছুই বোঝা যায়নি।

ফেলুদা বলল, 'আচ্ছা ডক্টর হাজরা, মুকুল তার পূর্বজন্মের কী কী ঘটনা বা জিনিসের কথা বলে সেটা একবার বলবেন ?'

হাজরা বললেন, 'যে জিনিসটার কথা বার বারই বলে সেটা হচ্ছে সোনার কেল্লা। সেই কেল্লার কাছেই নাকি ওর বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মেঝের তলায় নাকি ধনরত্ন পোঁতা ছিল। যেরকমভাবে বলে তাতে মনে হয় যে এই ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা ওর সামনেই ঘটেছিল। এ ছাড়া যুদ্ধের কথা বলে। বলে, অনেক হাতি, অনেক ঘোড়া, সেপাই, কামান, ভীষণ শব্দ, ভীষণ চীৎকার। আর বলে উটের কথা। উটের পিঠে সে চড়েছে। আর ময়ূর। ময়ূরে নাকি ওর হাতে ঠোকর মেরেছিল। রক্ত বার করে দিয়েছিল। আর বলে বালির কথা। বালি দেখলেই কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠছে সেটা লক্ষ করেননি ?'

বিকানির পৌঁছলাম পৌনে বারোটায়। শহরে পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই রাস্তা ক্রমে চড়াই উঠেছে ; এই চড়াইয়ের উপরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর। আর শহরের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জিনিস হচ্ছে লালচে রঙের পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড দুর্গ।

আমাদের গাড়ি একেবারে সোজা দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ করলাম, যতই কাছে যাচ্ছি ততই যেন দুর্গটাকে আরো বড় বলে মনে হচ্ছে। বাবা ঠিকই বলেছিলেন। রাজপুতরা যে দারুণ শক্তিশালী জাত ছিল সেটা তাদের দুর্গের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

দুর্গের গেটের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি থামার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বলে উঠল, 'এখানে কেন থামলে ?'

ডক্টর হাজরা বললেন 'কেল্লাটা কি চিনতে পারছ মুকুল ?'

মুকুল গম্ভীর গলায় বলল, 'না। এটা বিচ্ছিরি কেল্লা। এটা সোনার কেল্লা না।'

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মুকুলের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোত্থেকে জানি একটা কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল আর তৎক্ষণাৎ মুকুল দৌড়ে এসে ডক্টর হাজরাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। আওয়াজটা এল কেল্লার উল্টোদিকের পার্কটা থেকে।

ফেলুদা বলল, 'ময়ূরের ডাক। এরকম আগেও হয়েছে কি ?'

ডক্টর হাজরা মুকুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কাল

যোধপুরেই হয়েছিল। হি কান্ট স্ট্যান্ড পীকক্‌স।'

মুকুল দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে আবার সেই গম্ভীর অথচ মিষ্টি গলায় বলল, 'এখানে থাকব না।'

ডক্টর হাজরা ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি বরং গাড়িটা নিয়ে এখানকার সার্কিট হাউসে গিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা অ্যাদ্দুর এসেছেন, একটু ঘুরেটুরে দেখে নিন। আমি গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের দেখা হলে সার্কিট হাউসে চলে আসবেন। তবে দুটোর বেশি দেরি করবেন না কিন্তু, তাহলে ওদিকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

ডক্টর হাজরার উদ্দেশ্য সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। এই প্রথম একটা রাজপুত কেল্লার ভিতরটা দেখতে পাব ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কেল্লার গেটের দিকে যখন এগোচ্ছি তখন ফেলুদা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বলল, 'দেখলি?'

বললাম, 'কী জিনিস?'

'সেই লোকটা।'

বুঝলাম ফেলুদা সেই লাল জামা পরা লোকটার কথা বলছে। কিন্তু ও যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কোনো লাল জামা দেখতে পেলাম না। অবিশ্যি লোকজন অনেক রয়েছে, কারণ কেল্লার গেটের বাইরেটা একটা ছোটখাটো বাজার। বললাম, 'কোথায় লোকটা?'

'ইডিয়ট। তুই বুঝি লাল জামা খুঁজছিস?'

'তবে কোন্ লোকের কথা বলছ তুমি?'

'তোর মতো বোকসন্দর দুনিয়ায় নেই। তুই শুধু জামাই দেখেছিস, আর কিছুই দেখিসনি। ইট ওয়াজ দা সেম ম্যান, চাদর দিয়ে নাক অবধি ঢাকা। কেবল আজ পরেছিল নীল জামা। আমরা যখন বেদেদের দেখতে নেমেছিলাম, সেই সময় একটা ট্যাক্সি যেতে দেখি বিকানিরের দিকে। তাতে দেখেছিলাম এই নীল জামা।'

'কিন্তু এখানে কী করছে লোকটা?'

'সেটা জানলে তো অর্ধেক বাজি মাত হয়ে যেত।'

লোকটা উধাও। মনে একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে কেল্লার বিশাল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকেই একটা বিরাট চাতাল, সেটার ডানদিকে বুকের ছাতি ফুলিয়ে কেল্লাটা দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের খোপরে খোপরে পায়রার বাসা। বিকানির নাকি হাজার বছর আগে একটা সমৃদ্ধ শহর ছিল, যেটা বহুকাল হল বালির তলায় তলিয়ে গেছে। ফেলুদা বলল যে, কেল্লাটা চারশো বছর আগে রাজা রায় সিং প্রথম তৈরি করতে শুরু করেন। ইনি নাকি আকবরের একজন

বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন।

আমার মনের ভিতরটা কিছুক্ষণ থেকে খচখচ করছে একটা কথা ভেবে। লালমোহনবাবুরা এখনো এলেন না কেন? তাদের কি তাহলে রওনা হতে দেরি হয়েছে? নাকি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে? যাক গে। ওদের কথা ভেবে আশ্চর্য ঐতিহাসিক জিনিস দেখার আনন্দ নষ্ট করব না।

যে জিনিসটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল কেল্লার অস্ত্রাগার। এখানে যে শুধু অস্ত্রই রয়েছে তা নয়, আশ্চর্য সুন্দর একটা রুপোর সিংহাসনও রয়েছে, যার নাম আলম আম্বারি। এটা নাকি মোগল বাদশাহদের উপহার। এ ছাড়া রয়েছে যুদ্ধের বর্ম শিরস্ত্রাণ ঢাল তলোয়ার বল্লম ছোরা আর আরো কত কী! এক একটা তলোয়ার এত বিরাট আর এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো মানুষে হাতে নিয়ে চালাতে পারে। এগুলো দেখে জটায়ুর কথা যেই মনে পড়েছে, অমনি দেখি আমার টেলিপ্যাথির জোরে ভদ্রলোক হাজির। বিরাট কেল্লার বিরাট ঘরের বিরাট দরজার সামনে তাকে আরো খুদে আর আরো হাস্যকর মনে হচ্ছে।

লালমোহনবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চারিদিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'রাজপুতরা কি জায়েন্ট ছিল নাকি মশাই। এ জিনিস তো মানুষের হাতে ব্যবহার করার জিনিস নয়!'

যা ভেবেছিলাম তাই। সত্তর কিলোমিটারের মাথায় ওদের টাক্সির একটা টায়ার পাংচার হয়। ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গের আর দু'জন কোথায়?'

'ওরা বাজারে কী সব কিনতে লেগেছে। আমি আর থাকতে না পেরে ঢুকে পড়লুম।'

আমরা ফুল মহল, গজ মন্দির, শীশ মহল আর গঙ্গা নিবাস দেখে যখন চিনি বুর্জে পৌঁছেছি, তখন মন্দার বোস আর মিস্টার মাহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদের হাতে খবরের কাগজের মোড়ক দেখে বুঝলাম তাঁরা কেনাকাটা করেছেন। মন্দার বোস বললেন, 'ইউরোপে মধ্যযুগের দুর্গটুর্গগুলোতে যে অস্ত্র দেখেছি, আর এখানেও যা দেখলাম, তাতে একটা জিনিসই প্রমাণ করে: মানুষ জাতটা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে আসছে, আর আমার বিশ্বাস সেই সঙ্গে তারা আয়তনেও ছোট হয়ে আসছে।'

'এই আমার মতো বলছেন?' লালমোহনবাবু হেসে বললেন।

'হ্যাঁ। ঠিক আপনারই মতো', মন্দার বোস বললেন, 'আমার বিশ্বাস আপনার ডাইমেনশনের লোক ষোড়শ শতাব্দীর রাজস্থানে একটিও ছিল না। ওহো—বাই দ্য ওয়ে—' মন্দারবাবু ফেলুদার দিকে ফিরলেন, 'আপনার জন্য এইটে এসে পড়েছিল সার্কিট হাউসে রিসেপশন ডেস্কে।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে

টিকিট নেই। বোঝাই যায় কোনো স্থানীয় লোক সেটা দিয়ে গেছে।

ফেলুদা চিঠি খুলতে খুলতে বলল, 'আপনাকে কে দিল ?'

'আমরা যখন বেরোচ্ছি, তখন খাগুরি বলে যে ছোকরাটা রিসেপশনে বসে, সেই দিল। বললে কে কখন রেখে গেছে জানে না।'

ফেলুদা 'এক্সকিউজ মি' বলে চিঠিটা পড়ে আবার খামে পুরে পকেটে রেখে দিল। তাতে কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না।

আরো আধঘন্টা ঘোরার পর ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এবার সার্কিট হাউসে যেতে হয়।' কেল্লাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উপায় নেই।

কেল্লার বাইরে দুটো ট্যাক্সিই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক হল যে এবার আমরা একই সঙ্গে ফিরব। যখন ট্যাক্সিতে উঠছি, তখন ড্রাইভার বলল ডক্টর হাজরারা নাকি সার্কিট হাউসে যাননি। ইয়ো যো লেড়কা থা—ও নাকি বলেছে সার্কিট হাউসে যাবে না।

'তবে কোথায় গেছে ওরা ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তাতে ড্রাইভার বলল, 'ওরা গেছে দেবীকুণ্ডে। সেটা আবার কী জায়গা ? ফেলুদা বলল, ওখানে নাকি রাজপুত যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

পাঁচ মাইল পথ, যেতে লাগল দশ মিনিট। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর, আর তেমনি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভগুলো। পাথরের বেদীর উপর পাথরের থাম, তার উপর পাথরের ছাউনি, আর মাথা থেকে পা অবধি সুন্দর কারুকার্য। এই রকম স্মৃতিস্তম্ভ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা। সমস্ত জায়গাটা গাছপালায় ভর্তি, সেই সব গাছে টিয়ার দল জটলা করছে, এ-গাছ থেকে ও-গাছ ফুরুত ফুরুত করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকছে। এত টিয়া একসঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

কিন্তু ডক্টর হাজরা কোথায় ? আর কোথায়ই বা মুকুল ?

লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি উসখুস করছেন। বললেন, 'ভেরি সাসপিশাস্ অ্যাণ্ড মিস্টিরিয়াস্।'

'ডক্টর হাজরা !' মন্দার বোস হঠাৎ এক হাঁক দিয়ে উঠলেন। তাঁর ভারী গলার চীৎকারে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে পালাল, কিন্তু ডাকের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আমরা ক'জনে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলাম। স্মৃতিস্তম্ভে স্মৃতিস্তম্ভে জায়গাটা প্রায় একটা গোলকধাঁধার মতো হয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ফেলুদাকে দেখলাম ঘাস থেকে দেশলাইয়ের বাক্স কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল।

শেষকালে কিন্তু লালমোহনবাবুই আবিষ্কার করলেন ডক্টর হাজরাকে। তাঁর

চীৎকার শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা আমগাছের ছায়ায় শেওলাধরা বেদীর সামনে মুখ আর হাত পিছন দিকে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে আছেন ডক্টর হাজরা। তাঁর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত অসহায় গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

ফেলুদা হুমড়ি খেয়ে ভদ্রলোকের উপর পড়ে তাঁর হাতের বাঁধন আর মুখের গ্যাগ খুলে দিল। দেখেই মনে হল যেটা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটা একটা পাগড়ি থেকে ছেঁড়া কাপড়।

মন্দার বোস বললেন, 'ব্যাপার কী মশাই, এমন দশা হল কী করে?'

সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর হাজরা জখম হননি। তিনি মাটিতে ঘাসের উপরে বসে কিছুক্ষণ হাঁপালেন। তারপর বললেন, 'মুকুল বলল, সার্কিট হাউসে যাবে না। অগত্যা গাড়ি করে ঘুরতে লাগলাম। এখানে এসে তার জায়গাটা ভালো লেগে গেল। বলল—এগুলো ছত্রী। এগুলো আমি জানি। আমি নেমে দেখব।—নামলাম। ও এদিক ওদিক ঘুরছিল, আমি একটু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে আক্রমণ। হাত দিয়ে মুখটা চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাঁটুটা দিয়ে মাথাটা চেপে রেখে হাত দুটো পিছনে বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে ব্যান্ডেজ।'

'মুকুল কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা।

'জানি না। একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম বটে আমাকে বাঁধবার কিছুক্ষণ পরেই।'

'লোকটার চেহারাটা দেখেননি ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন। 'তবে স্ট্রাগল-এর সময় তার পোশাকের একটা আন্দাজ পেয়েছিলাম। স্থানীয় লোকের পোশাক। প্যান্ট-সার্ট নয়।'

'দেয়ার হি ইজ !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মন্দার বোস।

অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ছত্রীর পাশ থেকে মুকুল আপনমনে একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডক্টর হাজরা একটা হাঁপ ছাড়ার শব্দ করে 'থ্যাঙ্ক গড' বলে মুকুলের দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে মুকুল ?'

কোনো উত্তর নেই।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?'

'ওইটার পিছনে।' মুকুল আঙুল দিয়ে একটা ছত্রীর দিকে দেখাল।

'ওরকম বাড়ি আমি দেখেছি।'

ফেলুদা বলল, 'যে লোকটা এসেছিল তাকে তুমি দেখেছিলে ?'

'কোন লোকটা ?'

ডক্টর হাজরা বললেন, 'ওর দেখার কথা নয়। এখানে এসেই ও দৌড়ে এক্সপ্লোর করতে চলে গেছে। বিকানির এসে এরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে সেটাও ভাবিনি, তাই আমিও ওর জন্য চিন্তা করিনি।'

তা সত্ত্বেও ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখনি লোকটাকে—যে ডক্টর হাজরার হাত-মুখ বাঁধল ?'

'আমি সোনার কেল্লা দেখব।'

বুঝলাম মুকুলকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আর টাইম্ ওয়েস্ট করে লাভ নেই। একদিক দিয়ে ভালোই যে মুকুল আপনার সঙ্গে বা আপনার কাছাকাছি ছিল না। থাকলে হয়ত তাকে নিয়েই উধাও হত লোকটা। যদি সে লোক যোধপুর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে যথেষ্ট স্পীডে গাড়ি চালালে হয়ত এখনো তাকে ধরা যাবে।'

দু' মিনিটের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলাম। লালমোহনবাবু এবার আমাদের সঙ্গে এলেন। বললেন, 'ও লোকগুলো বড্ড ড্রিঙ্ক করে। আমার আবার মদের গন্ধ সহ্য হয় না।'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার হরমিত সিং ষাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল গাড়িতে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে একটা ঘুঘু বসেছিল, সেটা উড়ে পালাতে গিয়ে

আমাদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনে ধাক্কা খেয়ে মরে গেল। আমি আর মুকুল সামনে বসেছিলাম। একবার পিছন ফিরে দেখলাম, লালমোহনবাবু ফেলুদা আর ডক্টর হাজরার মাঝখানে কুঁকড়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হলেও ঠোঁটের কোণে একটা হাসি দেখে বুঝলাম, তিনি অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন; হয়ত তাঁর সামনের গল্পের প্লটও মাথায় এসে গেছে।

খানেক মাইল আসার পর বুঝতে পারলাম যে, শয়তানের গাড়ি ধরতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে গাড়িটাও যে নতুন নয়, আর তাতেও যে স্পীড ওঠে না, একথা ভাবলে চলবে কেন!

যোধপুর যখন পৌঁছলাম, তখন শহরের বাতি জ্বলে উঠেছে। ফেলুদা বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনাকে নিউ রোডে সজে নামিয়ে দেব তো?'

ভদ্রলোক মিহি গলায় বললেন, 'তা তো বটেই—আমার জিনিসপত্তর তো সব সেখানেই রয়েছে; কিন্তু ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া করে যদি আপনাদের ওখানে...মানে...'

'বেশ তো', ফেলুদা আশ্বাসের সুরে বলল, 'জিজ্ঞেস করে দেখব, সার্কিট হাউসে ঘর খালি আছে কিনা। আপনি বরং নটা নাগাদ একটা টেলিফোন করে জেনে নেবেন।'

আমি ভাবছি আজকের ঘটনার কথা। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা, সে কথা বেশ বুঝতে পারছি। এ লোকই কি সেই লাল জামা পরা লোক? যে আজ বিকানির গিয়েছিল নীল জামা পরে? জানি না। এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ফেলুদাও পারছে না। যদি পারত তাহলে ওর মুখের ভাবই অন্য রকম হয়ে যেতো। অ্যাদ্দিন ওর সঙ্গে থেকে আর ওর তদন্তের কায়দাটা দেখে আমি এটা খুব ভালো করেই জেনেছি।

সার্কিট হাউসে পৌঁছে যে যার ঘরের দিকে গেলাম। তিন নম্বরে ঢোকার আগে ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এই কাপড়টা আমার কাছে রাখছি।' ডক্টর হাজরাকে যে কাপড়টা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ফেলুদা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল।

হাজরা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।' তারপর ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন প্রদোষবাবু, ব্যাপার গুরুতর। যেটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেটাই হতে চলেছে। আমি কিন্তু এতটা গোলমাল হবে সেটা অনুমান করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো রয়েছি। আপনি নির্ভয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যান। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আজ দেবীকুণ্ডে না গিয়ে সার্কিট হাউসে যেতেন তাহলে আপনাকে এতটা নাজেহাল হতে হত না।

অবিশ্যি মুকুলকে যে কিডন্যাপ করতে পারেনি লোকটা এটাই ভাগ্য। এবার থেকে আমাদের কাছাকাছি থাকবেন, তাহলে দুর্যোগের ভয়টা অনেক কমবে।'

ডক্টর হাজরার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা গেল না। বললেন, 'আমি কিন্তু আমার নিজের জন্য ভাবছি না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যাপারে অনেক রিস্‌ক নিতে হয়। ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য। আপনারা তো একেবারে বাইরের লোক।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্‌ক নিচ্ছি।'

মুকুল এতক্ষণ বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছিল, ডক্টর হাজরা এবার তাকে ডেকে নিয়ে আমাদের গুড নাইট জানিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকলাম। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা কোকাকোলা আনতে বলে ফেলুদা সোফায় বসে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে চিন্তিতভাবে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখল। তারপর অন্য পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই—যেটা দেবীকুণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছিল। টেক্কা-মার্কা দেশলাই। বাক্স খালি। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই যে রেলে আসতে এতগুলো স্টেশনে এতগুলো পান-সিগারেটওয়ালাকে দেখলি, তাদের কারুর কাছে টেক্কা দেশলাই ছিল কিনা লক্ষ করেছিলি?'

আমি সত্যি কথাটা বললাম। 'না ফেলুদা, লক্ষ করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'পশ্চিম অঞ্চলের কোনো দোকানে টেক্কা দেশলাই থাকার কথা নয়। রাজস্থানে টেক্কা বিক্রি হয় না। এ দেশলাই রাজস্থানের বাইরে থেকে আনা।'

'তার মানে এটা সেই লাল জামা পরা লোকটার নয়?'

'তোর প্রশ্নটা খুবই কাঁচা হল। প্রথমত রাজস্থানী পোশাক পরলেই একটা লোক রাজস্থানী হয় না। ওটা যে-কেউ পরতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ওই লোক ছাড়াও আরো অনেকেই আজ দেবীকুণ্ডে গিয়ে কুকীর্তিটা করার সুযোগ পেয়েছে।'

'তা তো বটেই! কিন্তু তাদের তো কাউকেই আমরা চিনি না, কাজেই ও নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

'এটাও খুব কাঁচা কথা হল। মাথা খাটাতে শিখলি না এখনো তুই। লালমোহন, মন্দার বোস এবং মাহেশ্বরী—এরা কত দেরীতে কেল্লায় পৌঁছেছে সেটা ভেবে দ্যাখ্। আর তারপর ভেবে দ্যাখ্—'

'বুঝেছি, বুঝেছি!'

সত্যিই তো! এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি ওদের আসতে প্রায়

পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হয়েছিল। লালমোহনবাবু বললেন, গাড়ির টায়ার পাংচার হয়েছিল। যদি না হয়ে থাকে? যদি তিনি মিথ্যে কথা বলে থাকেন? কিংবা সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, আর লালমোহনবাবু যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন, মন্দার বোস আর মাহেশ্বরী তো বাজার না করে দেবীকুণ্ডে গিয়ে থাকতে পারেন।

ফেলুদা এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বার করল। সেটা দেখেই হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। এটার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না। এটা সেই মন্দার বোসের দেওয়া চিঠিটা।

'ওটা কার চিঠি ফেলুদা?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জানি না', বলে ফেলুদা চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখি সেটা ইংরিজিতে লেখা চিঠি। মাত্র একটা লাইন—বড় হাতের অক্ষরে ডট পেন দিয়ে লেখা—

'ইফ ইউ ভ্যালু ইয়োর লাইফ—গো ব্যাক টু ক্যালকাটা ইমিডিয়েটলি।'

অর্থাৎ তোমার জীবনের প্রতি যদি তোমার মায়া থাকে, তাহলে এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে যাও।

আমার হাতে চিঠিটা কাঁপতে লাগল। আমি চট করে সেটা টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা করলাম।

'কী করবে ফেলুদা?'

সিলিং-এর ঘুরন্ত পাখাটার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ফেলুদা প্রায় আপন মনেই বলল, 'মাকড়সার জাল...জিয়োমেট্রি....। এখন অন্ধকার...দেখা যাচ্ছে না...রোদ উঠলে জালে আলো পড়বে—চিক্ চিক্ করবে...তখন ধরা পড়বে জালের নকশা!...এখন শুধু আলোর অপেক্ষা...'

॥ ৭ ॥

কাল মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার, তখন সময় ক'টা জানি না, দেখলাম ফেলুদা বেড-সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তার নীল খাতায় কী জানি লিখছে। ও কত রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল জানি না। কিন্তু সকাল সাড়ে ছ'টায় উঠে দেখলাম, ও তার আগেই উঠে দাড়িটাড়ি কামিয়ে রেডি। ও বলে, মানুষের ব্রেন যখন খুব বেশি কাজ করে, তখন ঘুম আপনা থেকেই কমে যায়; কিন্তু তাতে নাকি শরীর খারাপ হয় না। অন্তত ওর তো তাই ধারণা, আর ওর শরীর গত দশ বছরে একদিনের জন্যেও খারাপ হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। আমি জানতাম যে যোধপুরে এসেও ও যোগব্যায়াম বন্ধ করেনি। আজকেও জানি আমার ঘুম ভাঙার আগেই ওর সে-কাজটা সারা হয়ে গেছে।

ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে সকলের সঙ্গেই দেখা হল। লালমোহনবাবু কাল রাত্রেই সার্কিট হাউসে চলে এসেছিলেন। তিনি বারান্দার পশ্চিম অংশটাতে মন্দার বোসের দুটো ঘর পরেই রয়েছেন। ভদ্রলোক ডিমের অমলেট খেতে খেতে বললেন, তাঁর নাকি চমৎকার একটা প্লট মাথায় এসেছে। ডক্টর হাজরা একদম মুষড়ে পড়েছেন ; বললেন যে রাত্রে নাকি তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। একমাত্র মুকুলই দেখলাম নির্বিকার।

মন্দার বোস আজ প্রথম সরাসরি ডক্টর হাজরার সঙ্গে কথা বললেন—

'কিছু মনে করবেন না মশাই, আপনি যে উদ্ভট জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছেন, তাতে এ ধরনের গণ্ডগোল হবেই। যে দেশে কুসংস্কারের এত ছড়াছড়ি, সে দেশে এসব জিনিস বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। শেষকালে দেখবেন, ঘরে ঘরে সব কচি ছোকরারা নিজেদের জাতিস্মর বলে ক্লেম করছে। তলিয়ে দেখলে দেখবেন, ব্যাপারটা আর কিছুই না, তাদের বাপেরা একটু পাবলিসিটি চাইছে, ব্যস। তখন আপনি ঠ্যালা সামলাবেন কী করে ? ক'টা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে বিভুঁইয়ে চরে বেড়াবেন ?'

ডক্টর হাজরা কোনো মন্তব্য করলেন না। লালমোহনবাবু এর-ওর মুখের দিকে চাইলেন, কারণ জাতিস্মর ব্যাপারটা উনি এখনো কিছু জানেন না।

ফেলুদা আগেই বলেছিল যে ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বাজারের দিকে যাবে। আমি জানতাম সেটা নিশ্চয়ই শুধু শহর দেখার উদ্দেশ্যে নয়। পৌনে আটটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দু'জন নয়, তিনজন। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমি এর মধ্যে দু-একবার ভদ্রলোককে দুশমন হিসেবে কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই এত হাসি পেল যে বাধ্য হয়ে সেটা মন থেকে দূর করতে হল।

সার্কিট হাউসের দিকটা নিরিবিলি আর খোলামেলা হলেও শহরটা গিজগিজে। প্রায় সব জায়গা থেকেই পুরানো পাঁচিলটা দেখা যায়। সেই পাঁচিলের গায়ে দোকানের সারি, টাঙ্গার লাইন, লোকের থাকবার বাড়ি আর আরো কত কী। পাঁচশো বছর আগেকার শহরের চিহ্ন আজকের শহরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমরা এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছি। ফেলুদা কিছু একটা খুঁজছে সেটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝলাম না। লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হাজরা কিসের ডাক্তার বলুন তো ? আজ আবার টেবিলে মিস্টার টুটার কী সব বলছিলেন...'

ফেলুদা বলল, 'হাজরা একজন প্যারাসাইকলজিস্ট।'

'প্যারাসাইকলজিস্ট ?' লালমোহনবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। 'সাইকলজির

আগে যে আবার প্যারা বসে সেটা তো জানতুম না মশাই। টাইফয়েডের আগে বসে সেটা জানি। তার মানে কি হাফ-সাইকলজি—প্যারা-টাইফয়েড যেমনি হাফ-টাইফয়েড?'

ফেলুদা বলল, 'হাফ নয়, প্যারা মানে হচ্ছে অ্যাবনরম্যাল। মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা এমনই ধোঁয়াটে; তার মধ্যেও আবার যে দিকটা বেশি ধোঁয়াটে, সেটা প্যারাসাইকলজির আওতায় পড়ে।'

'আর জাতিস্মরের কথা কী যেন বলছিলেন!'

'মুকুল ইজ এ জাতিস্মর। অন্তত তাই বলা হয় তাকে।'

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'আপনি প্লটের অনেক খোরাক পাবেন', ফেলুদা বলল, 'ছেলেটি পূর্বজন্মে দেখা একটা সোনার কেল্লার কথা বলে। আর সে নাকি একটা বাড়িতে থাকত যার মাটিতে গুপ্তধন পোঁতা ছিল।'

'আমরা কি সেই সবের খোঁজে যাচ্ছি নাকি মশাই?' লালমোহনবাবুর গলা খড়খড়ে হয়ে গেছে।

'আপনি যাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমরা যাচ্ছি।'

লালমোহনবাবু রাস্তার মাঝখানে দু-হাত দিয়ে খপ করে ফেলুদার হাত ধরে ফেললেন।

'মশাই—চান্স অফ এ লাইফটাইম! আমায় ফেলে ফস্ করে কোথাও চলে যাবেন না—এইটেই আমার রিকোয়েস্ট।'

'এরপর কোথায় যাবো এখনো কিছুই ঠিক হয়নি।'

লালমোহনবাবু কী জানি ভেবে বললেন, 'মিস্টার ট্রটার কি আপনাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?'

'কেন? আপনার আপত্তি আছে?'

'লোকটা পাওয়ারফুলি সাস্‌পিশাস্!'

রাস্তার একধারে একটা জুতোওয়ালা বসেছে, তার চারিদিকে ঘিরে নাগরার ছড়াছড়ি। এখানকার লোকেরা এই ধরনের নাগরাই পরে। ফেলুদা জুতোওয়ালার সামনে দাঁড়াল।

'পাওয়ারফুল তো জানি। সাস্‌পিশাস্ কেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাকতাল্লা মারছিল। বলে—ট্যাঙ্গানিকায় নাকি নেকড়ে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে। অথচ আমি জানি যে সারা আফ্রিকার কোনো তল্লাটে নেকড়ে জানোয়ারটাই নেই। মার্টিন জনসনের বই পড়েছি আমি—আমার কাছে ধাপ্পা!'

'আপনি কী বললেন?'

'কী আর বলব ? ফস্ করে মুখের ওপর তো লায়ার বলা যায় না। দু' জনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসে আছি। আর লোকটার ছাতি দেখেছেন তো ? কমপক্ষে ফর্টিফাইভ ইঞ্চেজ। আর রাস্তার দু'ধারে দেখছি ইয়া ইয়া মনসার ঝোপড়া—কনট্রাডিক্ট করলুম, আর অমনি কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যদি ওই একটা ঝোপড়ার পেছনে ফেলে দিয়ে চলে যায়—ইন নো টাইম মশাই শকুনির স্কোয়াড্রন এসে ল্যান্ড করে ফিস্টি লাগিয়ে দেবে।'

'আপনার লাশে ক'টা শকুনের পেট ভরবে বলুন তো ?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

ফেলুদা ইতিমধ্যে পায়ের স্যান্ডেল খুলে নাগরা পরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভেরি পাওয়ারফুল শু—কিনছেন নাকি ?'

'একটা পরে দেখুন না,' ফেলুদা বলল।

ভদ্রলোকের পায়ের মাপের মতো ছোট জুতো অবিশ্যি দোকানে ছিল না, তাও তার মধ্যে যে জোড়াটা সবচেয়ে ছোট সেটা পরে তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন।

'এ যে গণ্ডারের চামড়া মশাই ! এ তো গণ্ডার ছাড়া আর কারুর পায়ে সুট করবে না !'

'তাহলে ধরে নিন রাজস্থানের শতকরা নব্বই ভাগ লোক আসলে গণ্ডার।'

দু'জনেই নাগরা খুলে যে যার জুতো পরে নিল। দোকানদারও হাসছিল। সে বুঝেছে শহরের বাবুরা ছোটলোকদের জুতো পায়ে দিয়ে একটু রসিকতা করছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। একটা পানের দোকান থেকে বেদম জোরে রেডিওতে ফিল্মের গানের আওয়াজ বেরোচ্ছে। মনে পড়ে গেল কলকাতার পুজো প্যান্ডেলের কথা। এখানে পুজো নেই, আছে দসেরা। কিন্তু তার এখনো অনেক দেরী।

আরো কিছু দূর এগিয়ে ফেলুদা একটা পাথরের তৈরি জিনিসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দোকানটার চেহারা বেশ ভদ্র. নাম সোলাঙ্কি স্টোর্স। বাইরে কাচের জানালার পিছনে সুন্দর সুন্দর পাথরের ঘটি বাটি গেলাস পাত্র সাজানো রয়েছে। ফেলুদা একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে আছে। দোকানদার দরজার মুখটাতে এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ করল।

ফেলুদা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই বাটিটা একবার দেখতে পারি ?'

দোকানদার জানালার বাটিটা না বার করে ভিতরের একটা আলমারি থেকে ঠিক সেই রকমই একটা বাটি বার করে দিল। সুন্দর হলদে রঙের পাথরের বাটি। আগে কখনো এরকম জিনিস দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

'এটা কি এখানকার তৈরি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

দোকানদার বলল, 'রাজস্থানেরই জিনিস, তবে যোধপুরের নয়।'

'তবে কোথাকার ?'

'জয়সলমীর। এই হলদে পাথর শুধু ওখানেই পাওয়া যায়।'

'আই সী...'

জয়সলমীর নামটা আমি আবছা আবছা শুনেছি। জায়গাটা যে রাজস্থানের ঠিক কোনখানে সেটা আমার জানা ছিল না। ফেলুদা বাটিটা কিনে নিল। সাড়ে নটা নাগাদ টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেয়ে সকালের ডিম-রুটি হজম করে আমরা সার্কিট হাউসে ফিরলাম।

মন্দার বোস বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাদের হাতে প্যাকেট দেখে বললেন, 'কী কিনলেন ?'

ফেলুদা বলল, 'একটা বাটি। রাজস্থানের একটা মেমেন্টো রাখতে হবে তো !'

'আপনার বন্ধু তো বেরোলেন দেখলাম।'

'কে, ডক্টর হাজরা ?'

'নটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে দেখলাম একটা ট্যাক্সি করে।'

'আর মুকুল ?'

'সঙ্গেই গেছে। বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করতে গেছেন। কালকের ঘটনার পর হি মাস্ট বি কোয়াইট শেকন।'

লালমোহনবাবু 'প্লটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে' বলে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে গিয়ে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ বাটিটা কিনলে কেন ফেলুদা?'

ফেলুদা সোফায় বসে বাটিটা মোড়ক থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এটার একটা বিশেষত্ব আছে।'

'কী বিশেষত্ব ?'

'জীবনে এই প্রথম একটা বাটি দেখলাম যেটাকে সোনার পাথরবাটি বললে খুব ভুল বলা হয় না।'

এর পরে আর কোনো কথা না বলে সে ব্র্যাড্‌শর পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি আর কী করি। জানি এখন ঘণ্টাখানেক ফেলুদার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোবে না, বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই অগত্যা বাইরে বেরোলাম।

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি। মন্দারবাবু উঠে গেছেন। দূরে একজন মেমসাহেব বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন। একটা ঢোলকের আওয়াজ ভেসে আসছে। এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল। গেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, দুটো ভিখিরি গোছের লোক—একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—গেট দিয়ে ঢুকে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটা ঢোলক বাজাচ্ছে আর মেয়েটা গান গাইছে। আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

মাঝখানের খোলা জায়গাটায় গিয়ে ইচ্ছে হল একবার দোতলায় যাই। সিঁড়িটা প্রথম দিন থেকেই দেখছি, আর জানি যে উপরে ছাত আছে। উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে।

দোতলার মাঝখানে পাশাপাশি খানচারেক ঘর। সেগুলোর দু-দিকে পুবে আর পশ্চিমে খোলা ছাত। ঘরগুলোতে লোকজন নেই বলেই মনে হল। কিংবা হয়ত যারা আছে তারা বেরিয়েছে।

পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেল্লাটা দারুণ দেখাচ্ছে সেখান থেকে।

নিচে ভিখিরির গান হয়ে চলেছে। সুরটা চেনা চেনা লাগছে। কোথায় শুনেছি এ সুর ? হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মুকুল যে সুরে গুনগুন করে,তার সঙ্গে এর খুব মিল আছে। বার বার একই সুর ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু শুনতে একঘেয়ে লাগছে না। আমি ছাতের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। এদিকটা হচ্ছে সার্কিট হাউসের পিছন দিক।

ওমা, পিছনেও যে বাগান আছে তা তো জানতাম না ! আমাদের ঘরের পিছন দিকে জানালা দিয়ে একটা ঝাউ গাছ দেখা যায় বটে, কিন্তু এতখানি জায়গা জুড়ে এত রকম গাছ আছে এদিকটায় সেটা বুঝতে পারিনি।

ঝলমলে নীল ওটা কী নড়ছে গাছপালার পিছনে ? ওহো—একটা ময়ূর। গাছের পিছনে লুকোনো ছিল শরীরের খানিকটা, তাই বুঝতে পারিনি। এবারে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে। মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে। পোকামাকড় বোধ হয়; ময়ূর তো পোকা খায় বলেই জানি। হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, ময়ূরের বাসা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। তারা বেছে বেছে নাকি অদ্ভুত সব গোপন জায়গা বার করে বাসা তৈরি করে

আস্তে আস্তে পা ফেলে ময়ূরটা এগোচ্ছে, লম্বা গলাটাকে বেঁকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, শরীরটা ঘুরলে সমস্ত লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ময়ূরটা দাঁড়াল। গলাটা ডান দিকে ঘোরালো। কী দেখছে ময়ূরটা ? নাকি কোনো শব্দ শুনেছে ?

ময়ূরটা সরে গেল। কী জানি দেখে ময়ূরটা সরে যাচ্ছে।

একজন লোক। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে। গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় পাগড়ি। খুব বেশি বড় না—মাঝারি। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। একেবারে ওপর থেকে দেখছি বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। খালি পাগড়ি আর কাঁধ। হাত দুটো চাদরের তলায়।

লোকটা পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে। আমি রয়েছি পশ্চিমের ছাতে। পুব দিকে একতলায় আমাদের ঘর।

হঠাৎ ইচ্ছে করল লোকটা কোথায় যায় দেখি।

মাঝের ঘরগুলো দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে উল্টো দিকের ছাতের পিছনের পাঁচিলের কাছে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লাম।

লোকটা এখন আবার আমার ঠিক নিচে। ছাতের দিকে চাইলে আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু দেখল না।

এগিয়ে আসছে সামনের দিকে লোকটা। আমাদের ঘরের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বার করল। কবজির কাছটায় চকচকে ওটা কী ?

লোকটা থেমেছে। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। লোকটা আরেক পা এগোল—

'ক্যাঁ ও য়্যাঁ !'

লোকটা চমকে পিছিয়ে গেল। ময়ূরটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম—

'ফেলুদা !'

পাগড়ি পরা লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমিও দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা দিয়ে এক নিশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দরজার মুখে ফেলুদার সঙ্গে দড়াম করে কলিশন খেয়ে ভ্যাবাচাকা চুপ !

আমাকে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

'ছাত থেকে দেখলাম, একটা লোক...পাগড়ি পরে...তোমার জানালার দিকে আসছে...'

'দেখতে কীরকম ? লম্বা ?'

'জানি না...উপর থেকে দেখছিলাম তো !...হাতে একটা...'

'হাতে কী ?'

'ঘড়ি...'

আমি ভেবেছিলাম ফেলুদা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে কিংবা আমাকে বোকা আর ভীতু বলে ঠাট্টা করবে। কিন্তু তার কোনোটাই না করে ও গম্ভীরভাবে জানালাটার দিকে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল।

দরজায় একটা টোকা পড়ল।

'কাম ইন।'

বেয়ারা কফি নিয়ে ঢুকল।

'সেলাম সা'ব !'

টেবিলের উপর কফির ট্রেটা রেখে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে ফেলুদাকে দিল।

'মেনেজার সা'বনে দিয়া।'

বেয়ারা চলে গেল। ফেলুদা চিঠিটা পড়ে একটা হতাশার ভাব করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল।

'কার চিঠি ফেলুদা ?'

'পড়ে দ্যাখ।'

ডক্টর হাজরার চিঠি। ডক্টর হাজরার নাম লেখা প্যাডের কাগজে ইংরিজিতে লেখা ছোট্ট চার লাইনের চিঠি—'আমার বিশ্বাস আমাদের পক্ষে আর যোধপুরে থাকা নিরাপদ নয়। আমি অন্য আরেকটা জায়গায় চললাম, সেখানে কিছুটা সাফল্যের আশা আছে মনে হয়। আপনি আর আপনার ভাইটি কেন আর মিথ্যা বিপদের মধ্যে জড়াবেন ; তাই আপনাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চললাম। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি।—ইতি এইচ এম হাজরা।'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'অত্যন্ত হেস্টি কাজ করেছেন ভদ্রলোক।'

তারপর কফি না খেয়েই সোজা চলে গেল রিসেপশন কাউন্টারে। আজ একটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন সেখানে। ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর হাজরা কি ফিরবেন বলে গেছেন?'

'না তো। উনি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। ফেরার কথা তো কিছু বলেননি।'

'কোথায় গেছেন সেটা আপনি জানেন?'

'স্টেশনে গেছেন এটাই শুধু জানি।'

ফেলুদা একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর দুয়েক হল ডিরেক্ট লাইন হয়েছে।'

'কখন ট্রেন?'

'রাত দশটা।'

'সকালের দিকে কোনো ট্রেন নেই?'

'যেটা আছে সেটা অর্ধেক পথ যায়, পোকরান পর্যন্ত। সেটা এই আধ ঘণ্টা হল ছেড়ে গেছে। পোকরান থেকে যদি গাড়ির ব্যবস্থা থাকে তা হলে অবিশ্যি এ ট্রেনটাতেও জয়সলমীর যাওয়া যায়।'

'কতটা রাস্তা পোকরান থেকে?'

'সত্তর মাইল।'

'সকালে যোধপুর থেকে অন্য কী ট্রেন আছে?'

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'আটটায় একটা প্যাসেঞ্জার আছে, সেটা বারমের যায়। নটায় আছে রেওয়াড়ি প্যাসেঞ্জার। দ্যাটস্ অল।'

ফেলুদা কাউন্টারের উপর ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কয়েকবার অসহিষ্ণুভাবে টোকা দিয়ে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে প্রায় দু'শো মাইল, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি অনুগ্রহ করে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দেবেন? আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরোতে চাই।'

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন তুললেন।

'কোথায় চললেন আপনারা?'

মন্দার বোস। স্নানটান করে ফিটফাট হয়ে হাতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন ঘর থেকে।

ফেলুদা বলল, 'একটু থর মরুভূমিটা দেখার ইচ্ছে আছে।'

'ও, তার মানে নর্থ-ওয়েস্ট। আমি যাচ্ছি একটু ইস্টে।'

'আপনিও চললেন ?'

'মাই ট্যাক্সি শুড বি হিয়ার এনি মিনিট নাউ। বেশি দিন এক জায়গায় মন টেকে না মশাই। আর আপনারাও যদি চলে যান তা হলে তো সার্কিট হাউস খালি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেও।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'ইট্‌স অ্যারেঞ্জড্।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলল, 'দ্যাখ তো লালমোহনবাবুর দেখা পাস কিনা। বল যে, আমরা এগারোটায় জয়সলমীর যাচ্ছি। যদি উনি আসতে চান আমাদের সঙ্গে, তাহলে যেন ইমিডিয়েটলি তৈরি হয়ে নেন।'

আমি ছুটলাম দশ নম্বর ঘরের দিকে। কী উদ্দেশ্যে যে জয়সলমীর যাচ্ছি জানি না। ফেলুদা অন্য সব জায়গা ফেলে এ জায়গাটা বাছল কেন ? বোধ হয় মরুভূমির কাছে বলে। ডক্টর হাজরাও কি জয়সলমীর গেছেন ? এই কি আমাদের বিপদের শেষ ? না এই সবে শুরু ?

॥ ৮ ॥

যোধপুর থেকে পোকরান প্রায় একশো কুড়ি মাইল রাস্তা। সেখান থেকে জয়সলমীর আবার সত্তর মাইল। সবসুদ্ধ এই দুশো মাইল যেতে আন্দাজ সাড়ে ছয় সাত ঘণ্টা লাগা উচিত। অন্তত আমাদের ড্রাইভার গুরুবচন সিং তাই বলল। বেশ গোলগাল হাসিখুশি শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছিলাম মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দিয়ে শরীরটা পিছন দিকে হেলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গাড়ি অবিশ্যি তখনো চলছে, আর স্টিয়ারিং ঘোরানোর কাজটা সেরে নিচ্ছে ভুঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে। কাজটা অবিশ্যি শুনতে যত কঠিন মনে হয় ততটা নয়, কারণ প্রথমত গাড়ি চলাচল এ রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চলে, আর দ্বিতীয়ত পাঁচ ছ' মাইল ধরে একটানা সোজা রাস্তা এর মধ্যে অনেকবারই লক্ষ করলাম। পথে কোনো গোলমাল না হলে মনে হয় সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ জয়সলমীর পৌঁছে যাব।

যোধপুর ছাড়িয়ে মাইল দশেক পর থেকেই এমন সব দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে যেমন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। যোধপুরের আশেপাশে অনেক পাহাড় আছে, যে সব পাহাড়ের লালচে রঙের পাথর দিয়েই যোধপুরের কেল্লা তৈরি। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে যেন পাহাড় ফুরিয়ে গেছে। তার বদলে আরম্ভ হয়েছে দিগন্ত অবধি গড়িয়ে যাওয়া ঢেউ খেলানো জমি। এই জমির কিছুটা ঘাস, কিছুটা লালচে মাটি, কিছুটা বালি আর কিছুটা কাঁকর। সাধারণ গাছপালাও ক্রমশ

ক্রমে গিয়ে তার বদলে চোখে পড়ছে বাবলা গাছ, আর নাম-না-জানা সব কাঁটা গাছ আর কাঁটা ঝোপ।

আর দেখছি বুনো উট। গরু ছাগলের মতো উট চরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। তার কোনোটার রং মুখ দেওয়া চায়ের মতো, আর কোনোটা আবার ব্ল্যাক কফির কাছাকাছি। একটা উটকে দেখলাম ওই শুকনো কাঁটা গাছই চিবিয়ে খাচ্ছে। ফেলুদা বলল, কাঁটা গাছ খেয়ে নাকি অনেক সময় ওদের মুখের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এটাই ওদের খাদ্য বলে ওরা নাকি সেটা গ্রাহ্যই করে না।

জয়সলমীরের কথাও ফেলুদা বলছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি এই শহর নাকি ভাটি রাজপুতদের রাজধানী ছিল। ওখান থেকে মাত্র চৌষট্টি মাইল দূরে পাকিস্তানের বর্ডার। দশ বছর আগেও নাকি জয়সলমীরে যাওয়া খুব মুশকিল ছিল। ট্রেন তো ছিলই না, রাস্তাও যা ছিল তা অনেক সময়ই বালিতে ঢাকা পড়ে হারিয়ে যেত। জায়গাটা নাকি এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন বৃষ্টি হলেও লোকেরা সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল যে আলাউদ্দীন খিলজি নাকি একবার জয়সলমীর আক্রমণ করেছিল।

সবসুদ্ধ কিলোমিটার বা বাহান্ন মাইলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সির একটি টায়ার পাংচার হয়ে গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে রাস্তার একপাশে কেদরে থেমে গেল। গুরুবচন সিং-এর উপর মনে মনে বেশ রাগ হল। ও বলেছিল টায়ার চেক করে নিয়েছে, হাওয়া দেখে নিয়েছে ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, গাড়িটা বেশ নতুনই।

সর্দারজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাইরে বেরোলাম। টায়ার চেঞ্জ করার হাঙ্গাম আছে, অন্তত পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

চ্যাপটা টায়ারের দিকে চোখ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাংচারের কারণটা বুঝতে পারলাম।

রাস্তার অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র পেরেক। সেগুলো দেখেই বোঝা যায় যে সদ্য কেনা হয়েছে।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সিং সাহেব দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কথা বলল, যেটা অবিশ্যি বইয়ে লেখা যায় না। ফেলুদা কিছুই বলল না, শুধু কোমরে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল। লালমোহনবাবু একটা পুরোনো জাপান এয়ার লাইনসের ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি ধরনের সবুজ খাতা বার করে তাতে খস খস করে পেনসিল দিয়ে কী জানি লিখলেন।

নতুন টায়ার পরিয়ে, ফেলুদার কথামতো রাস্তা থেকে পেরেক সরিয়ে, যখন আবার রওনা হচ্ছি তখন ঘড়িতে পৌনে দুটো। ফেলুদা ড্রাইভারকে বলল—'একটু রাস্তার দিকে নজর রেখে চালাবেন সর্দারজী—আমাদের পেছনে যে দুশমন লেগেছে সে তো বুঝতেই পারছেন।'

এদিকে বেশি আস্তে গেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, কাজেই গুরুবচন সিং ষাট থেকে নামিয়ে চল্লিশে রাখলেন স্পীডোমিটার। সত্যি বলতে কী, রাস্তার উপর চোখ রাখতে গেলে ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশি স্পীড তোলা চলে না।

প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ একশো মাইলের কাছাকাছি এসে সর্বনাশটা আর এড়ানো গেল না।

এবার কিন্তু পেরেক না, এবার পিতলের বোর্ড পিন। আন্দাজে মনে হয় প্রায় হাজার দশেক পিন বিশ-পঁচিশ হাত জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। বুঝতেই পারলাম যে, টায়ার ফাঁসানেওয়ালারা কোনো রিস্ক নিতে চাননি।

অথচ এটাও জানি, গুরুবচন সিং-এর ক্যারিয়ারে আর স্পেয়ার নেই।

চারজনই আবার গাড়ি থেকে নামলাম। সিং সাহেবের ভাব দেখে মনে হল, মাথায় পাগড়ি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মাথা চুলকোতেন।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'পোকরান টাউন হ্যায় ইয়া গাঁও হ্যায়?'

'টাউন হ্যায় বাবু।'

'কিৎনি দূর ইহাঁসে?'

'পচিশ মিল হোগা।'

'সর্বনাশ!...তব্ আভি হোগা ক্যা?'

গুরুবচন সিং বুঝিয়ে দিল যে, এ লাইনে যে ট্যাক্সিই যাক না কেন, সেটা তার চেনা হবেই। এখানে অপেক্ষা করে যদি সে রকম ট্যাক্সি একটা ধরা যায়, ত' হলে তাদের কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়ে তারপর পোকরানে গিয়ে পাংচার সারিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে রকম ট্যাক্সি যাবে কি না, আর গেলেও, সেটা কখন যাবে! কতক্ষণ আমাদের এই ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

পাঁচটা উট আর তার সঙ্গে তিনটি লোকের একটা দল আমাদের পাশ দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। লোকগুলোর প্রত্যেকটার রং একেবারে মিশকালো। তার মধ্যে আবার একজনের ধবধবে সাদা দাড়ি আর গালপাট্টা। তারা আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলেছে দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু একটু ফেলুদার দিক ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

'সব্‌সে নজ্‌দিক কোন্ রেল স্টেশন হ্যায়?' ফেলুদা বোর্ড পিন তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল। আমরাও অন্য গাড়ির কথা ভেবে এই সৎকার্যটায় হাত

লাগিয়েছিলাম।

'সাত আট মিল হোগা রামদেওরা।'

'রামদেওরা...'

রাস্তা থেকে বোর্ড পিন সরানো হলে পর, ফেলুদা তার ঝোলা থেকে ব্রাড্‌শ টাইম টেবল বার করল। একটা বিশেষ পাতা ভাঁজ করা ছিল, সেখানটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'লাভ নেই। তিনটে পঁয়তাল্লিশে যোধপুর থেকে সকালের ট্রেনটা রামদেওরা পৌঁছনোর কথা। অর্থাৎ সে গাড়ি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু রাত্রের দিকে আরেকটা ট্রেন যায় না জয়সলমীর?'

'হুঁ। কিন্তু সেটা রামদেওরা পৌঁছবে ভোর রাত্তিরে—তিনটে তিরিশে। এখান থেকে এখন হাঁটা দিলে রামদেওরা পৌঁছতে আড়া দু'ঘণ্টা। সকালের ট্রেনটা ধরার যদি আশা থাকত, তা হলে হেঁটে যাওয়াতে একটা লাভ ছিল। অন্তত পোকরানটা

পৌঁছানো যেত। এই মাঠের মাঝখানে...'

লালমোহনবাবু এই অবস্থার মধ্যেও হেসে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'যাই বলুন মশাই, এ সব সিচুয়েশন কিন্তু উপন্যাসেই পাওয়া যায়। রিয়েল লাইফেও যে এরকমটা—'

ফেলুদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে থামতে বললেন। চারিদিকে একটাও শব্দ নেই, সারা পৃথিবী যেন এখানে এসে বোবা হয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ আওয়াজ—ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌...

ট্রেন আসছে। পোকরানের ট্রেন। কিন্তু লাইন কোথায়?

শব্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল ধোঁয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টেলিগ্রাফের পোল। জমিটা ঢালু হয়ে গেছে তাই বোঝাই যায় না। পিছনের লাল মাটির সঙ্গে লাল টেলিগ্রাফ পোল মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। আকাশে মাথা উঁচিয়ে থাকলে আগেই চোখে পড়ত।

'দৌড়ো!'

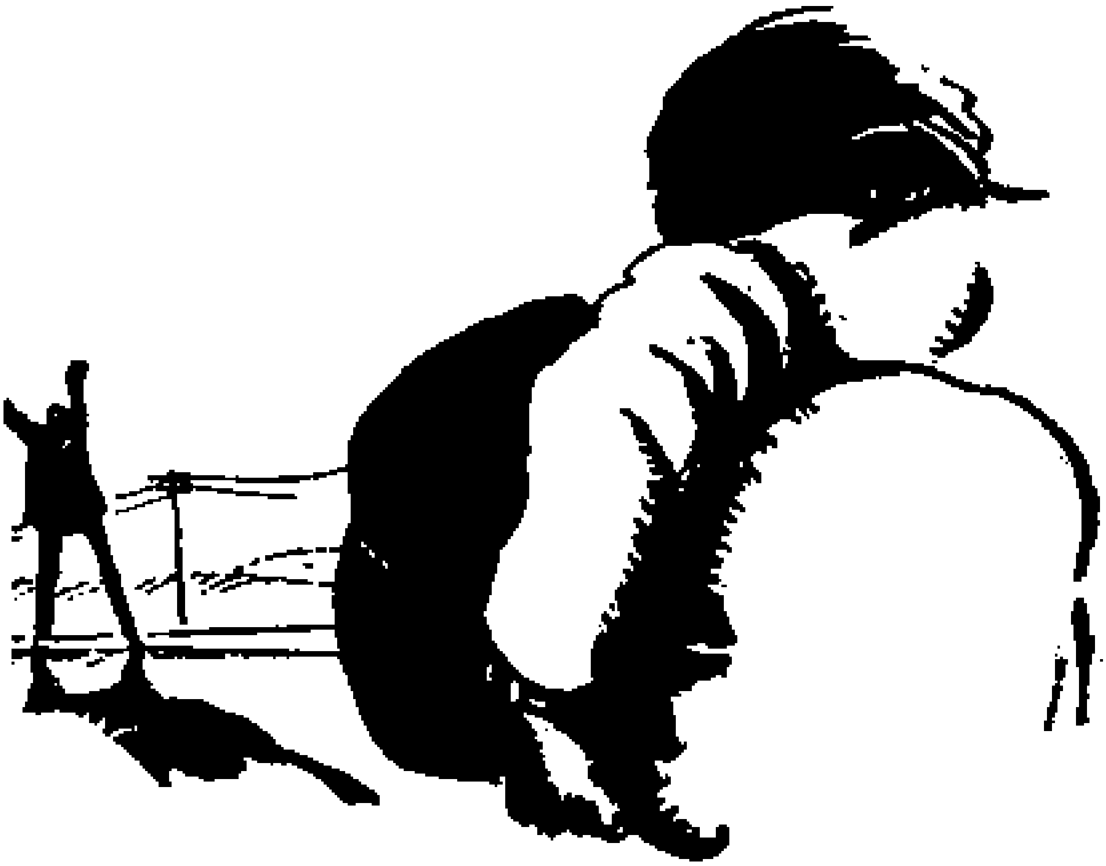

ফেলুদা চীৎকারটা দিয়েই ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আর আমার পিছনে জটায়ু। আশ্চর্য! ভদ্রলোক ওই লিক্‌লিকে শরীর নিয়ে এমন ছুটতে পারেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাকে ছাড়িয়ে প্রায় ফেলুদাকে ধরে ফেলেন আর কী!

পায়ের তলায় ঘাস, কিন্তু সে ঘাসের রং সবুজ নয়—একেবারে তুলোর মতো সাদা। তার উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়ে আমরা ঢালুর নিচে লাইনের ধারে পৌঁছে দেখি, ট্রেনটা আমাদের একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ফেলুদা এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে এক লাফে একেবারে লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দুটো হাত মাথার উপর তুলে হৈ-হৈ করে নাড়তে আরম্ভ করে দিল। ট্রেন এদিকে হুইসল্ দিতে আরম্ভ করেছে, আর সেই হুইসল্ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে জটায়ুর চীৎকার—'রোক্কে, রোক্কে, হল্ট, হল্ট, রোক্কে !...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এ ট্রেন যদিও ছোট, কিন্তু মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের মতো নয় যে, মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখালে বাসের মতো থেমে যাবে। প্রচণ্ড হুইসল্ মারতে মারতে স্পীড বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ট্রেনটা একেবারে হৈ হৈ করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। ফলে ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে লাইন থেকে বাইরে চলে আসতে হল, আর ট্রেনও দিব্যি আমাদের সামনে দিয়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করতে করতে কুচকুচে কালো ধোঁয়ায় সূর্যের তেজ কিছুক্ষণের জন্য কমিয়ে দিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুঃসময়েও মনে হল যে, এমন অদ্ভুত ট্রেন একমাত্র হলিউডের 'ওয়েস্টার্ন' ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনোদিন দেখিনি, দেখব ভাবিওনি।

'শুঁয়োপোকার রোয়াবটা দেখলেন ?' মন্তব্য করলেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ফেলুদা বলল, 'ব্যাড লাক্। ট্রেনটা লেট ছিল। অথচ সেটার সুযোগ নিতে পারলাম না। পোকরানে হয়তো একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যেতে পারত।'

গুরুবচন সিং বুদ্ধি করে আমাদের মালগুলো সব হাতে করে নিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। লাইনের দিকে চেয়ে দেখলাম, এখন আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'বাট হোয়াট অ্যাবাউট ক্যামেলস্ ?' উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ বলে উঠলেন জটায়ু।

'ক্যামেলস্ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ওই তো !'

সত্যিই দেখি, আরেকটা উটের দল আসছে যোধপুরের দিক থেকে।

'গুড আইডিয়া। চলুন !'

ফেলুদার কথায় আবার দৌড়।

'সে রকম খেপে উঠলে নাকি উট টোয়েন্টি মাইলস্ পার আওয়ার ছুটতে পারে'—ছুটতে ছুটতেই বললেন লালমোহনবাবু।

উটের দলকে থামানো হল। এবারে দু'জন লোক আর সাতখানা উট। ফেলুদা প্রস্তাব করল—রামদেওরা যাব, তিনটে উট কত লাগবে বলো। এদের ভাষা আবার হিন্দি নয়; স্থানীয় কোনো একটা ভাষায় কথা বলে। তবে হিন্দি বোঝে, আর ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে। গুরুবচন সিং এসে আমাদের হয়ে কিছুটা কথাবার্তা বলে দিল। দশ টাকায় রাজী হয়ে গেল উট ভাড়া দিতে।

'দৌড়ানে সেকেগা আপকা উট ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'ট্রেন ধরনে হোগা।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আগে তো উঠুন। দৌড়ের কথা পরে।'

'উঠব ?'

এই প্রথম বোধহয় লালমোহনবাবু উটের সামনে পড়ে তার পিঠে ওঠার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেন। আমি জানোয়ারগুলোকে ভালো করে দেখছিলাম। কী বিদঘুটে চেহারা, কিন্তু কী বাহারের সাজ পরিয়েছে তাদের। হাতির পিঠে যেমন ঝালরওয়ালা জাজিম দেখেছি ছবিতে, এদের পিঠেও তাই। একটা কাঠের বসবার ব্যবস্থা রয়েছে, তার নিচে জাজিম। জাজিমে আবার লাল নীল হলদে সবুজ জ্যামিতিক নকশা। উটের গলাও দেখলাম লাল চাদর দিয়ে ঢাকা, আর তাতে আবার কড়ি দিয়ে কাজ করা। বুঝলাম, যতই কুশ্রী হোক, জানোয়ারগুলোকে এরা ভালোবাসে।

তিনটে উট আমাদের জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। আমাদের দুটো সুটকেস, দুটো হোল্ড-অল আর ছোটখাটো যা জিনিস ছিল, সবই গুরুবচন সিং এনে জড়ো করেছে। সে বলে দিল, ট্রেন ধরতে পারলে আমরা যেন পোকরানে অপেক্ষা করি ; আজ রাত্রের মধ্যে সে অবশ্যই পৌঁছে যাবে। মালগুলো অন্য দুটো উটের পিঠে চাপিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলল, 'উটের বসাটা লক্ষ করলেন তো ? সামনের পা দুটো প্রথমে দুমড়ে শরীরের সামনের দিকটা আগে মাটিতে বসছে। তারপর পেছন ; আর ওঠার সময় কিন্তু হবে ঠিক উল্টোটা। আগে উঠবে পিছন দিকটা, তারপর সামনেটা। এই হিসেবটা মাথায় রেখে শরীরটা আগু-পিছু করে নেবেন, তাহলে আর কোনো কেলেঙ্কারি হবে না।'

'কেলেঙ্কারি ?' জটায়ুর গলা কাঠ।

'দেখুন', ফেলুদা বলল, 'আমি আগে উঠছি।'

ফেলুদা উটের পিঠে চাপল। উটওয়ালাদের মধ্যে একজন মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই ঠিক যেরকমভাবে ফেলুদা বলেছিল সেইভাবে উটটা তেড়েবেঁকে ভীষণ একটা ল্যাগব্যাগে ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। এটা বুঝতে পারলাম যে, ফেলুদার বেলা কোনো কেলেঙ্কারি হল না।

'তোপ্‌সে ওঠ। তোরা হালকা মানুষ, তোদের ঝামেলা অনেক কম।'

উটওয়ালারা দেখি বাবুদের কাণ্ড দেখে দাঁত বার করে হাসছে। আমিও সাহস করে উঠে পড়লাম, আর সেই সঙ্গে উটটাও উঠে দাঁড়াল। বুঝলাম যে আসল গোলমালটা হচ্ছে এই যে, পিছনের পা-টা যখন খাড়া হয়, সওয়ারির শরীরটা তখন এক ঝটকায় সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মনে মনে ঠিক

করলাম যে, এর পরে যদি কখনো উঠি তাহলে প্রথম দিকে শরীরটাকে পিছনে হেলিয়ে টান করে রাখব, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক হবে।

'জয় ম্যা—'

লালমোহনবাবুর মা-টা ম্যা হয়ে গেল এই কারণেই যে, তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক ঝটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে তিনি খেলেন এক রামহোঁচট। আর তারপরেই উল্টো হ্যাঁচকায় 'হেঁইক' করে এক বিকট শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার।

গুরুবচন সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিন বেদুইন রামদেওরা স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

'আধা ঘণ্টে মে আট মিল যানা হ্যায়, টিরেন পাকড়ানা হ্যায়', ফেলুদা উটওয়ালাদের উদ্দেশে করে হাঁক দিল। কথাটা শুনে একজন উটওয়ালা আরেকটা উটের পিঠে চড়ে খচমচ খচমচ করে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর অন্য লোকটার মুখ দিয়ে হেঁই হেঁই করে কয়েকটা শব্দ বেরোতেই শুরু হল উটের দৌড়।

নড়বড়ে জানোয়ার, দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝাঁকুনিও খায় রীতিমত, কিন্তু তাও ব্যাপারটা আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না। আর তা ছাড়া বালি আর সাদা ঝলসানো ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি, জায়গাটাও রাজস্থান, সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চই লাগছিল।

ফেলুদা আমার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। লালমোহনবাবু আমার পিছনে। ফেলুদা একবার ঘাড়টা পিছনে ফিরিয়ে হাঁক দিল—

'শিপ অফ দ্য ডেজার্ট কীরকম বুঝছেন মিস্টার গাঙ্গুলী ?'

আমিও একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লালমোহনবাবুর অবস্থাটা। খুব শীত লাগলে লোকে যেমন মুখ করে—তলার ঠোঁট ফাঁক হয়ে দেখা যায় দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে, আর গলার শিরাগুলো সব বেরিয়ে আসে—লালমোহনবাবুর দেখি সেই রকম অবস্থা।

'কী মশাই ?' ফেলুদা হাঁকল, 'কিছু বলছেন না যে ?'

পিছন থেকে এবার পাঁচটা ইনস্টলমেন্টে পাঁচটা কথা বেরোল—'শিপ...অলরাইট...বাট...টকিং...ইম্‌পসিব্‌ল...'

কোনো রকমে হাসি চেপে সওয়ারির দিকে মন দিলাম। আমরা এখন রেল লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। একবার মনে হল, দূরে যেন ট্রেনের ধোঁয়াটা দেখতে পেলাম, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে গেল। সূর্য নেমে আসছে। দৃশ্যও বদলে আসছে। আবার আবছা পাহাড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছি বহু দূরে। ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বালির স্তূপ পড়ল। দেখে বুঝলাম তার উপরে মানুষের পায়ের

ছাপ পড়েনি। সমস্ত বালির গায়ে ঢেউয়ের মতো লাইন।

উটগুলোর বোধহয় একটানা এত দৌড়নো অভ্যাস নেই, তাই মাঝে মাঝে তাদের স্পীড কমে যাচ্ছিল, তারপর পিছন থেকে হেঁই হেঁই শব্দে তারা আবার দৌড়তে শুরু করছিল।

সোয়া চারটে নাগাদ আমরা দূরে লাইনের ধারে চৌকো ঘরের মতো একটা কিছু দেখতে পেলাম। এটা স্টেশন ছাড়া আর কী হতে পারে?

আরো কাছে এলে পর বুঝলাম, আমাদের আন্দাজ ঠিকই। একটা সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে: এটা একটা রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিশ্চয়ই রামদেওরা স্টেশন।

আমাদের উটের দৌড় ঢিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু আর হেঁই হেঁই করার প্রয়োজন হবে না, কারণ ট্রেন এসে চলে গেছে। কতক্ষণের জন্য ট্রেনটা ফসকে গেল জানি না, তবে ফসকে যে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে এখন থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত আমাদের এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এক অজানা জায়গায় একটা নাম-কা-ওয়াস্তে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হবে।

॥ ৯ ॥

স্টেশন বলতে একটা প্ল্যাটফর্ম, আর একটা ছোট্ট কাজ চালাবার মতো টিকিট ঘর। আসলে স্টেশন তৈরির কাজ এখনো চলছে; কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমরা টিকিট ঘরের কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুটকেস আর হোল্ড-অল মাটিতে পেতে তার উপরে বসেছি। এখানে বসার একটা কারণ এই যে, কাছেই কাঠের পোস্টে একটা কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, কাজেই অন্ধকার হলেও সেই আলোতে আমরা অন্তত পরস্পরের মুখটা দেখতে পাব।

স্টেশনের কাছে একটা ছোটখাটো গ্রাম জাতীয় ব্যাপার আছে। ফেলুদা একবার সেদিকটায় ঘুরে এসে জানিয়েছে যে, খাবারের দোকান বলে কিছুই নাকি সেখানে নেই। খাবার বলতে আমাদের এখন যা সম্বল দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে ফ্লাস্কের মধ্যে সামান্য জল আর লালমোহনবাবুর কাছে এক টিন জিভেগজা। বুঝতে পারছি, আজ রাতটা এই গজা খেয়েই থাকতে হবে। মিনিট দশেক হল সূর্য ডুবেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। গুরুবচন সিং আসবে বলে বিশেষ ভরসা হয় না, কারণ আমরা এই যে তিন ঘণ্টা হল এসেছি, তার মধ্যে একটি গাড়িও যায়নি রাস্তা দিয়ে—না যোধপুরের দিকে, না জয়সলমীরের দিকে। রাত তিনটে পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

ফেলুদা ওর সুটকেসটার উপর বসে রেলের লাইনের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ওকে এর মধ্যে বার দু-তিন দেখেছি বাঁ হাতের তেলোর চাপে ডান হাতের আঙুল মটকাতে। বেশ বুঝেছি ওর ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব রয়েছে, আর তাই ও কথাও বলছে না বেশি।

দালদার টিনটা খুলে একটা জিভেগজা বার করে তাতে একটা কামড় দিয়ে লালমোহনবাবু বললেন, 'কী থেকে কী হয়ে যায় মশাই। আগ্রা থেকে যদি এক কামরায় সীট না পড়ত, তা হলে কি আর এভাবে আমার হলিডের চেহারাটা পালটে যেতো?'

'আপনার কি আপসোস হচ্ছে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বলেন কী মশাই!' ফেলুদার প্রশ্নটা ভদ্রলোক হেসেই উড়িয়ে দিলেন। 'তবে কী জানেন, ব্যাপারটা যদি আমার কাছে আরেকটু ক্লিয়ার হত, তা হলে মজাটা আরো জমত।'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'কিছুই তো জানি না মশাই। খালি শাট্‌লককের মতো এদিকে থাবড়া খেয়ে ওদিকে যাচ্ছি, আর ওদিকে থাবড়া খেয়ে এদিকে আসছি। এমনকি আপনি যে আসলে কে—হিরো না ভিলেন—তাই তো বুঝতে পারছি না, হে হে।'

'কী হবে জেনে?' ফেলুদা মুচকি হেসে বলল। 'আপনি যখন উপন্যাস লেখেন, সব জিনিস কি আগে থেকে বলে দেন? এই রাজস্থানের অভিজ্ঞতাটাকেও একটা উপন্যাস বলে ধরে নিন না। গল্পের শেষে দেখবেন সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'আমি আস্ত থাকব তো গল্পের শেষে? জ্যান্ত থাকব তো?'

'ঠেকায় পড়লে আপনি যে দৌড়িয়ে খরগোশকেও হার মানাতে পারেন সেটা তো চোখেই দেখলাম। এটা কি কম ভরসার কথা?'

একটা লোক এসে কখন জানি কেরোসিনের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম স্থানীয় পোশাক পরা দুটো পাগড়িধারী লাঠি ঠক ঠক্ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা এসে আমাদের ঠিক চার-পাঁচ হাত দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল। লোক দুটোর একটা ব্যাপার দেখে আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তাদের দু'জনেরই গোঁফ জোড়া অন্তত চার বার পাক খেয়ে গালের দু' পাশে দুটো ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো হয়ে রয়েছে। মনে হয়, টেনে সোজা করলে এক এক দিকে অন্তত হাত দেড়েক লম্বা হবে। লালমোহনবাবুরও দেখি চক্ষুস্থির।

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'ব্যান্ডিটস্।'

'বলেন কী ?' লালমোহনবাবু ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খেলেন।
'নিঃসন্দেহে।'

লালমোহনবাবু এবার দালদার টিনটা বন্ধ করতে গিয়ে ঢাকনাটা হাত থেকে ফসকে ফেলে একটা বিশ্রী খ্যানখেনে শব্দ করে নিজেই আরো বেশি নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

লোকগুলোর গায়ের রং একেবারে সদ্য কালি দিয়ে বুরুশ করা নতুন জুতোর মতো চকচকে। দুটোর মধ্যে একটা লোক এবার একটা সিগারেট বার করে মুখে পুরল, তারপর পকেট খাবড়ে খুবড়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বার করে সেটা খালি দেখে ট্রেনের লাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খচ করে একটা শব্দ শুনে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, সে তার লাইটারটা জ্বালিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা প্রথমে একটু অবাক, তারপর মুখ বাড়িয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলুদার কাছ থেকে লাইটারটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এখানে-সেখানে টিপে ফস করে সেটাকে জ্বালাল। লালমোহনবাবু কী জানি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোল না। লোকটা আরো তিনবার লাইটারটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সেটা ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিল। লালমোহনবাবু এবার ঢাকনা লাগানো টিনটা সুটকেসে ভরতে গিয়ে পুরো টিনটাই হাত থেকে ফেলে গতবারের চেয়ে আরো চারগুণ বেশি শব্দ করে বসলেন। ফেলুদা সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তার থলি থেকে নীল খাতাটা বার করে এই টিমটিমে আলোতেই সেটা উলটে-পালটে দেখতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ করলাম টিকিট ঘরের পিছনে কিছুটা দূরে একটা কাঁটা ঝোপের উপর কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে পড়েছে।

আলোটা বাড়ছে ; এবার একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। জয়সলমীরের দিক থেকে আসছে গাড়িটা। যাক্ বাবা ! মনে হচ্ছে গুরুবচনের সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে।

গাড়িটা হুস্ করে নাকের সামনে দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা।

ফেলুদা খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুর দিকে চাইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা লালমোহনবাবু, আপনি তো গল্পটল্প লেখেন, বলুন তো ফোসকা জিনিসটা কী এবং ফোসকা কেন পড়ে ?'

'ফোসকা ?... ফোসকা ?...' লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে গেছেন। 'কেন পড়ে মানে, এই ধরুন আপনি সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগল—'

'সে তো বুঝলাম—কিন্তু ফোসকা পড়বে কেন ?'

'কেন ? ও—আই সী—কেন...'

'ঠিক আছে। এবার বলুন তো একটা লোককে মাথার উপর থেকে দেখলে তাকে বেঁটে মনে হয় কেন?'

লালমোহনবাবু চুপ করে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আবছা আলোয় দেখলাম তিনি হাত কচলাচ্ছেন। পাশের লোক দুটো এক সুরে একভাবে গল্প করে চলেছে। ফেলুদা একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লালমোহনবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'আমাকে এসব, মানে, কোশ্চেন—'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে লালমোহনবাবু—এটার উত্তর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

লালমোহনবাবু নির্বাক। ফেলুদা যেন তাঁকে হিপ্‌নোটাইজ করে ফেলেছে।

'আজ সকালে আপনি সার্কিট হাউসের পিছনের বাগানে আমার জানলার কাছে কী করছিলেন?'

লালমোহনবাবু এক মুহূর্ত পাথর। তারপরেই তিনি একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে উঠলেন।

'আরে মশাই—আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলুম! আপনারই কাছে! এমন সময় ময়ূরটা এমন চেঁচিয়ে উঠল—আর তারপর একটা চীৎকার শুনলাম—কেমন জানি নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে...'

'আমার ঘরে যাবার কি অন্য রাস্তা ছিল না? আর আমার কাছে আসার জন্য মাথায় পাগড়ি আর গায়ে চাদর দিতে হয়?'

'আরে মশাই, গায়ের চাদর তো বিছানার চাদর, আর পাগড়ি তো সার্কিট হাউসের তোয়ালে। একটা ডিজগাইজ না হলে লোকটার উপর স্পাইং করব কী করে?'

'কোন্ লোকটা?'

'মিস্টার ট্রটার! ভেরি সাস্‌পিশাস্! ভাগ্যে গেসলুম। কী পেলুম দেখুন না, ওর জানলার বাইরে ঘাসের উপর। সিক্রেট কোড! এইটেই তো আপনাকে দিতে যাচ্ছিলুম, আর ঠিক এই সময় ময়ূরটা চেঁচামেচি লাগিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি লক্ষ করছিলাম লালমোহনবাবুর ঘড়িটা। সত্যি, এই ঘড়িটাই তো দেখেছিলাম ছাত থেকে।

লালমোহনবাবু সুটকেস খুলে তার খাপ থেকে একটা কোঁকড়ানো কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদাকে দিল। বুঝলাম কাগজটাকে দলা পাকানো হয়েছিল, সেটা আবার সোজা করা হয়েছে।

ফেলুদার পাশে গিয়ে কেরোসিনের আলোতে দেখলাম কাগজটায় পেনসিল দিয়ে লেখা আছে—

IP 1625+U

U—M

ফেলুদা ভীষণভাবে ভুরু কুঁচকে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। আমি এই অ্যালজেব্রার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, যদিও লালমোহনবাবু দুবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হাইলি সাস্‌পিশাস্।'

ফেলুদা ভাবছে, আর ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করছে—

'ষোল শ' পঁচিশ...ষোল শ' পঁচিশ...এই সংখ্যাটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেন্টলি ?...'

'ট্যাক্সির নম্বর ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উহু...ষোল শ' পঁচিশ...সিক্সটিন টোয়েন্টি ফা—'

ফেলুদা কথাটা শেষ না করে এক ঝটকায় থলে থেকে ব্র্যাড্‌শ টাইম টেবলটা বার করল। পাতা ভাঁজ করা জায়গাটা খুলে পাতার উপর থেকে নিচের দিকে আঙুল চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল।

'ইয়েস। সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ্যাল।'

'কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পোকরানে।'

বললাম, 'তা হলে তো Pটা পোকরান হতে পারে। পোকরানে সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ। আর বাকিটা ?'

'বাকিটা...বাকিটা...আই পি আবার প্লাস ইউ।'

'তলার Mটা কিন্তু ভালো লাগছে না মশাই,' লালমোহনবাবু বললেন। 'M বললেই কিন্তু মার্ডার মনে পড়ে।'

'দাঁড়ান মশাই—আগে ওপরেরটার পাঠোদ্ধার করি।'

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'মার্ডার...মিস্ট্রি...ম্যাসাকার মনস্টার...'

ফেলুদা কোলের উপর কাগজটা খোলা রেখে ভাবতে লাগল।

লালমোহনবাবু গজার টিনটা বার করে আমাদের আবার অফার করলেন। আমি একটা নেবার পর ফেলুদার দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ভালো কথা—আমিই যে আপনার জানালার কাছে গিয়েছিলুম, সেটা কী করে বুঝলেন স্যার ? আপনি কি আমায় দেখে ফেলেছিলেন নাকি ?'

ফেলুদা একটা গজা তুলে নিয়ে বলল, 'পাগড়িটা খোলার পর বোধহয় চুলটা আঁচড়াননি। ঘটনাটার কিছুক্ষণ পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আপনার চুলের অবস্থাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার আপনাকে কিন্তু সেন্ট-পারসেন্ট গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা এবার তার একটা কার্ড বার করে লালমোহনবাবুকে দিল। লালমোহনবাবুর দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ!—প্রদোষ সি মিটার! এটা কি আপনার রিয়্যাল নাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহের কোনো কারণ আছে কি?'

'না, মানে ভাবছিলাম কী অদ্ভুত নাম!'

'অদ্ভুত?'

'অদ্ভুত নয়? দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে।—প্রদোষ—প্র হচ্ছে প্রফেশনাল, দোষ হচ্ছে ক্রাইম আর সি হচ্ছে—টু সি—অর্থাৎ দেখা—অর্থাৎ ইনভেস্টিগেট। অর্থাৎ প্রদোষ সি ইজ ইকুয়্যাল টু প্রফেশনাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর!'

'সাধু সাধু!—আর মিটার?'

'মিটারটা একটু ভেবে দেখতে হবে,' লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন।

'কিস্যু ভাবার দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি। ট্যাক্সি মিটার জানেন তো? সেই মিটার—অর্থাৎ ইন্ডিকেটর। তার মানে শুধু ইনভেস্টিগেশন নয়, অলসো ইনডিকেশন। ক্রাইমের তদন্তই শুধু নয়, ক্রিমিন্যাল বার করে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ। হল তো?'

লালমোহনবাবু 'ব্রাভো' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ফেলুদা কিন্তু আবার সিরিয়াস। আরেকবার হাতের কাগজটার দিকে দেখে সেটাকে সার্টের বুক-পকেটে গুঁজে রেখে সিগারেটটা বার করে বলল, 'I এবং U-এর অবিশ্যি খুব সহজ মানে হতে পারে। I অর্থাৎ আমি এবং U অর্থাৎ তুমি, কিন্তু প্লাস ইউ-টা গোলমেলে; আর দ্বিতীয় লাইনটার কোনো কিনারাই করা যাচ্ছে না।...তোপসে, তুই বরং হোল্ড-অলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়। আপনিও—লালমোহনবাবু। এখনো তো সাড়ে সাত ঘণ্টা দেরি ট্রেন আসতে। আমি আপনাদের ঠিক সময়ে তুলে দেবো।'

কথাটা মন্দ বলেনি ফেলুদা। শুধু স্ট্র্যাপ দুটো খুলে হোল্ড-অলটাকে বিছিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে পড়লাম। চিত হওয়ামাত্র আকাশের দিকে চোখ গেল, আর তক্ষুনি বুঝতে পারলাম যে, একসঙ্গে এত তারা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। মরুভূমিতে কি আকাশটা তা হলে একটু বেশি পরিষ্কার থাকে? তাই হবে।

আকাশ দেখতে দেখতে ক্রমে চোখটা ঘুমে বুজে এল। একবার শুনলাম লালমোহনবাবু বলছেন, 'উটে চড়লে গাঁটে বেশ ব্যথা হয় মশাই।' আরেকবার যেন বললেন, 'এম্ ইজ মার্ডার।' এর পর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ফেলুদার ঝাঁকানিতে।

'তোপসে—উঠে পড়—গাড়ি আসছে।'

তড়াক করে উঠে হোল্ড-অল বেঁধে ফেলতে ফেলতে ট্রেনের হেড-লাইট দেখা গেল।

॥ ১০ ॥

মিটার গেজের প্যাসেঞ্জার গাড়ি। কামরাগুলো তাই খুবই ছোট। যাত্রীও বেশি নেই, তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াতে খুব একটা অবাক লাগল না।

কামরা অন্ধকার ; হাতড়িয়ে সুইচ বার করে টিপে কোনো ফল হলো না। লালমোহনবাবু বললেন, 'সভ্য দেশেই রেলের বাল্‌ব লোপাট হয়ে যায়, ডাকাতের দেশে তো ওটা আশা করাই ভুল।'

ফেলুদা বলল, 'তোরা দু'জন দু'দিকের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আমি মাঝখানের মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে ম্যানেজ করছি। ঝাড়া ছ' ঘণ্টা সময় আছে হাতে, দিব্যি গড়িয়ে নেওয়া যাবে।'

লালমোহনবাবু একবার একটু আপত্তি করেছিলেন—'আপনি আবার ফ্লোরে কেন মশাই, আমাকে দিন না'—কিন্তু ফেলুদা একটু কড়া করে 'মোটেই না' বলাতে ভদ্রলোক বোধহয় গাঁটের ব্যথার কথা ভেবেই বেঞ্চিতে হোল্ড-অল খুলে পেতে নিলেন।

গাড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম পেরোনোর এক মিনিটের মধ্যেই কে একজন আমাদের দরজার পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল। লালমোহনবাবু হেসে বলে উঠলেন, 'আরে বাবা, গাড়ি রিজার্ভ হ্যায়। জেনানা কাম্‌রা হ্যায়!'

এবারে ঝড়াক্‌ করে আমাদের দরজাটা খুলে গেল, আর একটা উজ্জ্বল টর্চের আলো জ্বলে উঠে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

সেই আলোতেই দেখলাম, একটা হাত আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর সে হাতে চকচক করছে একটা লোহার নলওয়ালা জিনিস।

আমাদের তিনজনেরই হাত মাথার উপর উঠে গেল।

'এবার উঠুন তো বাবুরা! দরজা খোলা আছে, একে একে নেমে পড়ুন তো বাইরে!'

এ যে মন্দার বোসের গলা!

'গাড়ি যে চলছে!'—কাঁপা গলায় বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'শাট্‌ আপ!' মন্দার বোস গর্জন করে দু'পা এগিয়ে এলেন। টর্চের আলোটা অনবরত আমাদের তিনজনের উপর ঘোরাফেরা করছে। 'ন্যাকামো হচ্ছে? কলকাতায় চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে ওঠানামা করা হয় না? উঠুন উঠুন—'

কথাটা শেষ হতে না হতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল, যেটা আমি জীবনে

কোনোদিন ভুলব না। ফেলুদার ডান হাতটা একটা বিদ্যুতের শিখার মতো নেমে এসে তার নিজের শতরঞ্চির সামনের দিকটা খামচে ধরে মারল একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান—আর তার ফলে মন্দার বোসের পা দুটো সামনের দিকে হড়কে ছটকে শূন্যে উঠে গিয়ে উপরের শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়াম করে লাগল কামরার দেয়ালে। আর সেই সঙ্গে তার ডান হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল লালমোহনবাবুর বেঞ্চিতে আর বাঁ হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ফসকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

মন্দার বোসের পুরো শরীরটা মাটিতে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলুদা—তার হাতে কোটের ভিতর থেকে বার করা তার নিজের রিভলভার।

'গেট আপ!' ফেলুদা মন্দার বোসকে উদ্দেশ করে গর্জিয়ে উঠল।

মিটার গেজের গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে মন্দারবাবুর রিভলভারটা তাঁর জাপান এয়ার লাইনস্-এর ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

'উঠুন বলছি!' ফেলুদা আবার গর্জিয়ে উঠল।

টর্চটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ বুঝতে পারছি সেটা মন্দার বোসের উপর ফেলা উচিত—নইলে লোকটা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটা গোলমাল করতে পারে। এই কথাটা ভেবে টর্চটা তুলতে গিয়েই হয়ে গেল সর্বনাশ; আর সেটা এমনই সর্বনাশ যে সেটার কথা ভাবতে এখনো আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মন্দার বোসের শরীরের উপর দিকটা ছিল আমার বেঞ্চির দিকে। আমি যেই টর্চটা তুলতে নিচু হয়েছি, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা আচমকা ঝাঁপ দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে আমাকে সুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। তার ফলে মন্দার বোস আর ফেলুদার মাঝখানে পড়ে গেলাম আমি। এই চরম বিপদের সময়েও মনে মনে লোকটার শয়তানি বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, ফেলুদা প্রথম রাউণ্ডে আশ্চর্য ভাবে জিতলেও, দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেকায়দায় পড়ে গেছে। এটাও বুঝলাম যে এই অবস্থাটার জন্য দায়ী একমাত্র আমি।

মন্দার বোস আমাকে পিছন থেকে খাঁকড়ে ধরে সামনের দিকে রেখে খোলা দরজাটার দিকে পিছোতে লাগলেন। কাঁধের কাছটায় কী যেন একটা ফুটছে। বুঝলাম সেটা মন্দার বোসের হাতের একটা নখ। নীলুর হাতের যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে গেল।

ক্রমে বুঝলাম দরজার খুব কাছে এসে গেছি। কারণ বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার বাঁ কাঁধটায় লাগছে।

আরো এক পা পিছোলেন মন্দার বোস। ফেলুদা রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে

কিন্তু কিছু করতে পারছে না। জ্বলন্ত টর্চটা এখনো ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আমি ফেলুদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আর তার পরেই একটা শব্দ পেলাম যাতে বুঝলাম যে, মন্দার বোস চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। তিনি বাঁচলেন কী মরলেন, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

ফেলুদা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ফিরে এল। তারপর যথাস্থানে রিভলভারটাকে চালান দিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল,

'দু-একটা হাড়গোড় অন্তত না ভাঙলে খুব আক্ষেপের কারণ হবে।'

লালমোহনবাবু যেন একটু অতিরিক্ত জোরেই হেসে উঠে বললেন,

'বলেছিলাম না মশাই, লোকটা সাসপিশাস্‌ !'

আমি এর মধ্যে ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়েছি। বুকের ধড়ফড়ানিটা আস্তে আস্তে কমছিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। কী ভীষণ একটা ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল, সেটা যেন এখনো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না।

ফেলুদা বলল, 'শ্রীমান হুঁশিয়ার ছিলেন বলে লোকটা এ-যাত্রা পার পেয়ে গেল, নইলে বন্দুকটা নাকের সামনে ধরে ওর পেট থেকে সব বার করে নিতাম। অবিশ্যি—'

ফেলুদা থামল। তারপর বলল, 'খুব বড় বিপদের সামনে পড়লেই দেখেছি আমার মাথাটা বিশেষ রকম পরিষ্কার হয়ে যায়। ওই সংকেতের মানেটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'বলেন কী!' বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা বলল, 'আসলে খুবই সহজ। আই হচ্ছে আমি, পি হচ্ছে পোকরান, ইউ হচ্ছে তুমি, আর এম্‌ হচ্ছে মিত্তির—প্রদোষ মিত্তির।'

'আর প্লাস-মাইনাস?'

'আই পি ১৬২৫-ইউ। অর্থাৎ আমি পোকরান পৌঁচচ্ছি বিকেল চারটে পঁচিশে, তুমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও।'

'আর ইউ মাইনাস এম্‌?'

'আরো সহজ—তুমি মিত্তিরকে কাটাও।'

'কাটাও!' ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। 'তার মানে মাইনাস হচ্ছে মার্ডার?'

'মার্ডারের প্রয়োজন কী? মাঝপথে চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে এক তো জখম হবার সম্ভাবনা ছিলই, তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত পরের ট্রেনের জন্য। তার মধ্যে ওদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যেত। দরকারটা ছিল আমাদের জয়সলমীর থেকে মাইনাস করা। সেই জন্যেই তো রাস্তায় এত পেরেকের ছড়াছড়ি। সেটায় কাজ হয়নি বুঝতে পেরে শেষটায় ট্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা।'

এতক্ষণে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করলাম। ফেলুদাকে বললাম, 'চুরুটের গন্ধ পাচ্ছি ফেলুদা।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা লোকটা কামরায় ঢোকামাত্র পেয়েছি। সার্কিট হাউসেও কোনো ব্যক্তি যে চুরুট খাচ্ছেন সেটা আগেই বুঝেছি। মুকুলের হাতের সেই রাংতাটা চুরুটেই জড়ানো থাকে।'

'আর ভদ্রলোকের একটা নখ ভীষণ বড়ো। আমার কাঁধটা বোধহয় নীপুর

হাতের মতোই হয়ে গেছে।'

'কিন্তু যিনি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন সেই আই-টি কিনি?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'সার্কিট হাউসে পাওয়া ইংরিজিতে লেখা হুমকি চিঠির সঙ্গে এই সংকেতের লেখা মিলিয়ে তো একটি লোকের কথাই মনে হয়।'

'কে?' আমরা দু'জনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'ডক্টর হেমাঙ্গমোহন হাজরা।'

রাত্রে সবসুদ্ধ বোধহয় ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে রোদ। ফেলুদাকে দেখলাম মেঝে থেকে উঠে আমার বেঞ্চির এক কোণে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার কোলে রয়েছে তার নীল খাতা, আর হাতে রয়েছে দু'খানা চিঠি—একটা সেই ইংরিজিতে হুমকি আর অন্যটা ডক্টর হাজরার লেখা চিঠি। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। লালমোহনবাবু এখনো দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। খিদে পাচ্ছিল ভীষণ, কিন্তু গজা খেতে আর মন চাইছিল না। জয়সলমীর পৌঁছবে প্রায় ন'টায়। বুঝলাম এই দু ঘণ্টা সময় খিদেটাকে কোনোরকমে চেপে রাখতে হবে।

বাইরের দৃশ্য অদ্ভুত। মাইলের পর মাইল অল্প ঢেউ-খেলানো জমি দেখা যাচ্ছে দু'দিকে—তার মধ্যে একটা বাড়ি নেই, একটা লোক নেই, একটা গাছ পর্যন্ত নেই। অথচ মরুভূমি বলা যায় না, কারণ, বালি মাঝে মাঝে থাকলেও, বেশির ভাগটাই শুকনো সাদা ঘাস, লালচে মাটি আর লাল-কালো পাথরের কুচি। এরপরেও যে আবার একটা শহর থাকতে পারে সেটা ভাবলে বিশ্বাস হতে চায় না।

একটা স্টেশন এল—কোঠা চন্দন। আমি ব্র্যাডশ খুলে দেখলাম এটার পর থাইয়াৎ হামিরা, আর তার পরেই জয়সলমীর। স্টেশনে দোকান-টোকান নেই, লোকজন নেই, কুলি নেই, ফেরিওয়ালা নেই। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পৃথিবীর কোনো একটা অনাবিষ্কৃত জায়গায় এই ট্রেনটা কেমন করে জানি এসে পড়েছে—ঠিক যেমনি করে রকেট গিয়ে হাজির হয় চাঁদে।

এবার গাড়ি ছাড়ার মিনিটখানেক পরেই লালমোহনবাবু উঠে পড়ে বিরাট একটা হাই তুলে বললেন, 'ফ্যানটাসটিক স্বপ্ন দেখলুম মশাই। একদল ডাকাত, গোঁফগুলো সব ভেড়ার শিঙের মতো প্যাঁচানো—তাদের আমি হিপনোটাইজ করে নিয়ে চলেছি একটা কেল্লার ভিতর দিয়ে। সেই কেল্লায় একটা সুড়ঙ্গ। তাই দিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে পৌঁছলুম। জানি সেখানে গুপ্তধন আছে, কিন্তু গিয়ে দেখি একটা উট মেঝেতে বসে জিভেগজা খাচ্ছে।'

'গন্ধ পাচ্ছে সেটা জানলেন কী করে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। 'হাঁ করে দেখাল ?'

'আরে না মশাই। স্পষ্ট দেখলুম আমার দালদার টিনটা খোলা পড়ে আছে উটের ঠিক সামনে।'

থাইরৎ হামিরা স্টেশন পেরোনোর কিছুক্ষণ পরেই দূরে আবছা একটা পাহাড় চোখে পড়ল। এ-ও সেই রাজস্থানী চ্যাপটা টেব্‌ল মাউন্টেন। আমাদের ট্রেনটা মনে হল সেই পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।

আটটা নাগাদ মনে হল পাহাড়টার উপর একটা কিছু রয়েছে।

ক্রমে বুঝতে পারলাম, সেটা একটা কেল্লা। সমস্ত পাহাড়ের উপরটা জুড়ে মুকুটের মতো বসে আছে কেল্লাটা—তার উপর সোজা গিয়ে পড়েছে ঝকঝকে পরিষ্কার সকালের ঝলমলে রোদ। আমার মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—

'সোনার কেল্লা!'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক বলেছিস। এটাই হল রাজস্থানের একমাত্র সোনার কেল্লা। বাটিটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর গাইডবুক দেখে কনফার্মড হলাম। বাটিটা যে পাথরের তৈরি, কেল্লাও সেই পাথরেরই তৈরি—ইয়েলো স্যান্ডস্টোন। মুকুল যদি সত্যি করেই জাতিস্মর হয়ে থাকে, আর পূর্বজন্ম বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনে হয় ও এখানেই জন্মেছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ডক্টর হাজরা কি সেটা জানেন ?'

ফেলুদা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে কেল্লার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জানিস তোপ্‌সে—অদ্ভুত এই সোনালি আলো। মাকড়সার জালের নকশাটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আলোয়।'

॥ ১১ ॥

জয়সলমীর স্টেশনে নেমে প্রথমেই যেটা করলাম সেটা হচ্ছে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে চা আর একটা নতুন রকমের মিষ্টি খেয়ে খিদেটাকে মিটিয়ে নিলাম। ফেলুদা বলল—মিষ্টি জিনিসটা নাকি দরকার—ওতে গ্লুকোজ থাকে—সামনে পরিশ্রম আছে—গ্লুকোজে এনার্জি দেবে।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম গাড়িটাড়ির কোনো বালাই নেই। একটা জীপ আছে দাঁড়িয়ে, তবে সেটা যে ভাড়ার নয়, সেটা দেখেই বোঝা যায়। টাঙ্গা এক্কা সাইকেল-রিক্শা ট্যাক্সি কিছু নেই। আমরা যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন একটা কালো অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম; এখন দেখছি সে

গাড়িটাও নেই। ফেলুদা বলল, 'জায়গাটা ছোট সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব বেশি নয় নিশ্চয়ই। ডাকবাংলো একটা আছে সেটা গাইড-বুকে লিখেছে। আপাতত সেটার খোঁজ করা যাক।'

যে যার মালপত্তর হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই একটা পেট্রোল স্টেশনে একটা লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে রাস্তা বাতলে দিল। বুঝলাম যে ডাকবাংলোয় যাবার জন্য পাহাড়ে উঠতে হবে না, সেটা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে সমতল জমির উপরেই। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার বালির উপর টায়ারের দাগ দেখে ফেলুদা বলল, 'অ্যাম্বাসাডরটাও এই রাস্তাতেই গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা একতলা বাড়ির সামনে কাঠের ফলকে লেখা দেখে বুঝলাম আমরা ডাকবাংলোয় এসে গেছি। বাংলোর সামনেই দেখি কালো অ্যাম্বাসাডরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই বোধহয় একটা খাকি সার্ট খাটো ধুতি আর পাকানো পাগড়ি পরা বুড়ো লোক পাশের একটা আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল সে চৌকিদার কিনা। লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তার চাউনি দেখে বুঝলাম যে আমাদের আসাটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত, আর ব্যাপারটা সে একটু সন্দেহের চোখে দেখছে, কারণ পারমিশন ছাড়া বাংলোয় থাকতে দেয় না এটা আমি জানি।

ফেলুদা বাংলোয় থাকার প্রশ্নটাই তুলল না। সে বলল যে আপাতত সে শুধু মালগুলো রেখে যেতে চায়, তারপর পারমিশনের চেষ্টা দেখবে। চৌকিদার বলল সেটার জন্য রাজার সেক্রেটারির কাছে যেতে হবে। রাজবাড়ি কোনদিকে সেটাও সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল। দূরে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে হলদে পাথরের তৈরি প্যালেসের খানিকটা অংশও দেখতে পেলাম।

চৌকিদার মালগুলো রাখতে দিতে কোনো আপত্তি করল না। তার একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, ফেলুদা ইতিমধ্যে তার হাতে একটা কড়কড়ে দু' টাকার নোট গুঁজে দিয়েছে।

একটা ঘরের মধ্যে সুটকেস বিছানা রেখে ফ্লাস্কগুলোতে জল ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করা হল কেল্লায় যেতে হলে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ফোর্ট?'

প্রশ্নটা এল বারান্দার ও-মাথা থেকে। একটি ভদ্রলোক ওদিকের একটা ঘর থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছেন। ফর্সা রং, বয়স চল্লিশের বেশি নয়, খুব মন দিয়ে ছাঁটা সরু একটা গোঁফ ঠোঁটের নাকের নিচে। এবার আরেকটু বেশি বয়সের

আরেকটি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ালেন। এঁর হাতে একটা লাঠি—যেমন লাঠি আমরা যোধপুরের বাজারে দেখেছি—আর গায়ে কেমন যেন একটা বেখাপ্পা কালো স্যুট। এরা দু'জনে কোন্ দেশী সেটা বোঝা গেল না। লক্ষ করলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন, আর সেই জন্যেই বোধহয় তার লাঠির দরকার হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ফোর্টটা একবার দেখতে পারলে মন্দ হত না।'

'কাম অ্যালঙ্গ উইথ আস্—উই আর গোয়িং দ্যাট ওয়ে।'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কী জানি ভেবে যেতে রাজী হয়ে গেল।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। দ্যাট ইজ ভেরি কাইন্ড অফ ইউ।'

আমরা গাড়ির দিকে যাবার সময় লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'এরা আবার চলন্ত মোটরগাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইবে না তো?'

গাড়ি কেল্লার দিকে রওনা দিল। লাঠিওয়ালা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ।'

বাঁ দিকে বালির উপর দূরে দেখলাম দেবীকুণ্ডের মতো কতগুলো স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। ফেলুদা বলল ও জিনিসটা নাকি রাজস্থানের সব শহরেই রয়েছে।

আমাদের গাড়ি ক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করল।

মিনিটখানেক ওঠার পর পিছন থেকে আরেকটা গাড়ির শব্দ পেলাম। গাড়িটা ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। অথচ আমরা যে খুব আস্তে চলছিলাম তাও নয়। তাহলে লোকটা বার বার হর্ন দিচ্ছে কেন?

ফেলুদা দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনে বসেছিল। সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'রোককে, রোককে!'

আমাদের গাড়ি রাস্তার এক পাশে থামতেই আমাদের ডান পাশে এসে দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি—তার স্টিয়ারিং ধরে হাসিমুখে বসে আমাদের সেলাম জানাচ্ছেন গুরুবচন সিং।

আমরা তিনজনেই নেমে পড়লাম। ফেলুদা ভদ্রলোক দু'জনকে ইংরিজিতে বলল—আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমাদের নিজেদের ট্যাক্সিটা পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—সেটা এসে পড়েছে।

গুরুবচন বলল ভোর সাড়ে ছটায় নাকি একটা চেনা ট্যাক্সি জয়সলমীর থেকে ফিরছিল—তার কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়েছে। নব্বই মাইল রাস্তা নাকি সে দু' ঘণ্টায় এসেছে। এখানে এসে পেট্রোল স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কালো অ্যাম্বাসাডরটার ভিতর আমাদের দেখতে পায়।

আরো খানিকটা পথ যেতেই আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। চারদিকে দোকানপাট গিজগিজ করছে, লাউডস্পীকারে হিন্দী ফিল্মের গান হচ্ছে, একটা ছোট্ট সিনেমা হাউসের বাইরে আবার হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপনও রয়েছে।

'আপলোগ কিল্লা দেখনে মাংতা ?' গুরুবচন সিং জিজ্ঞেস করল। ফেলুদা হ্যাঁ বলতে গুরুবচন সিং ট্যাক্সি থামাল। 'ইয়ে হ্যায় কিল্লেকা গেট।'

ডান দিকে চেয়ে দেখি এক পেল্লায় ফটক—তারপর পাথরে বাঁধানো রাস্তা চড়াই উঠে গেছে আরেকটা ফটকের দিকে। বুঝলাম, এটা বাইরের গেট আর ভেতরেরটা আসল গেট। দ্বিতীয় গেটের পিছন থেকেই পাহাড় উঠে গেছে জয়সলমীরের সোনার কেল্লা।

গেটের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখলেই প্রহরী বলে বোঝা যায়। ফেলুদা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সকালের দিকে কোনো বাঙালী ভদ্রলোক একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে কেল্লা দেখতে এসেছিলেন কিনা। ফেলুদা হাত দিয়ে মুকুলের হাইটটাও বুঝিয়ে দিল।

—আয়া থা, কিন্তু এখন নেই, চলে গেছে।

—কখন ?

—আধ ঘণ্টা হবে।

—গাড়িতে এসেছিল ?

—হাঁ—এক টেক্সি থা।

—কোন্ দিকে গেছে বলতে পার ?

প্রহরী পশ্চিম দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। আমরা সেই রাস্তা ধরে অলিগলি দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম। লালমোহনবাবু সামনে বসেছেন গুরুবচনের পাশে, আমি আর ফেলুদা পিছনে। কিছুক্ষণ চলার পর ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনার অস্ত্রটা আনেননি তো সঙ্গে ?'

লালমোহনবাবু অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ প্রশ্ন শুনে চমকে বললেন, 'ভোপালি ? ইয়ে-মানে-গিয়ে-আপনার—ভোজালি ?'

'হ্যাঁ। আপনার নেপালী ভোজালি।'

'সে তো সুটকেসে স্যার।'

'তাহলে আপনার পাশে রাখা জাপান এয়ার লাইন্‌সের ব্যাগ থেকে মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে কোটের তলায় বেল্টের মধ্যে গুঁজুন—যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়।'

লালমোহনবাবুর নড়াচড়া থেকে বুঝলাম তিনি ফেলুদার আদেশ পালন করছেন। এই সময় তাঁর মুখটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

'কিচ্ছু না,' ফেলুদা বলল, 'গোলমাল দেখলে স্রেফ ট্যাঁক থেকে ওটি বার করে

সামনের দিকে পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'আর পে-পেছন দিয়ে যদি—'

'পেছনে কিছু হচ্ছে বুঝলে আপনি নিজে ঘুরে যাবেন, তখনই সেটা সামনে হয়ে যাবে।'

'আর আপনি ? আপনি বুঝি আজ, মানে, নন-ভায়োলেন্ট ?'

'সেটা প্রয়োজন বুঝে।'

ট্যাক্সিটা বাজার ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। আমরা এর মধ্যে আরো দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে অন্য ট্যাক্সিটা কোন পথে গেছে জেনে নিয়েছি। তাছাড়া রাস্তার বালির উপর মাঝে মাঝে টায়ারের দাগ দেখতে পাচ্ছি আর তাতেই বুঝতে পারছি যে আমরা হেমাঙ্গ হাজরার রাস্তাতেই চলেছি।

গুরুবচন সিং বলল, 'ইয়ে হ্যায় মোহনগড় জানেকা রাস্তা। আউর এক মিল জানা সেকতা। উসকে বাদ রাস্তা বহুৎ খারাপ হ্যায়। জীপ ছোড়কে দুসরা গাড়ি নেহি যাতা।'

এক মাইলও অবিশ্যি যেতে হল না। কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলাম রাস্তার এক ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ডান দিকে খানিকটা দূরে রয়েছে একসঙ্গে অনেকগুলো পরিত্যক্ত একতলা ছাত ছাড়া খুপরির মতো পাথরের বাড়ি। বুঝলাম, এটাও হচ্ছে একটা প্রাচীন গ্রাম, যেমন গ্রাম আমরা এর আগে আরো দু-একটা দেখেছি। এসব গ্রাম থেকে লোকজন নাকি বহুকাল আগে চলে গেছে; শুধু দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি বলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

গুরুবচন সিংকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বাড়িগুলোর দিকে এগোলাম। সর্দারজী দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল—বোধহয় জাতভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে।

চারিদিক থমথম করছে। পিছন দিকে চাইলে দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায় জয়সলমীরের কেল্লা। রাস্তার উলটো দিকে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড়। তার ঠিক পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা জুড়ে মাটিতে পোঁতা শিল-নোড়ার মতো হলদে পাথরের সারি। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'যোদ্ধাদের কবর।'

লালমোহনবাবু খসখসে মিহি গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু আবার লো ব্লাড প্রেশার।'

'কিচ্ছু ভাববেন না', ফেলুদা বলল, 'দেখতে দেখতে হাই হয়ে যেমনটি চাই তেমনটি হয়ে যাবে।'

বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছি। সারি সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। বেশ বুঝলাম এ গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামের মতো নয়। এর মধ্যে

একটা সহজ জ্যামিতিক প্ল্যান আছে।

কিন্তু ট্যাক্সির যাত্রীরা কোথায়? মুকুল কোথায়? ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা কোথায়?

মুকুলের কিছু হয়নি তো?

হঠাৎ খেয়াল হল কানে একটা শব্দ আসছে—এখনো খুবই আস্তে—কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়। খট্—খট্—খট্...

অত্যন্ত সাবধানে একটুও শব্দ না করে আরো কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, একটা চৌরাস্তায় এসে পড়েছি। আমরা এখনো দুটো রাস্তার ক্রসের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছি। ডান দিক দিয়ে শব্দটা আসছে। রাস্তার দু'দিকে দশ-বারোটা বাড়ির সারি—তাদের দেয়াল আর দরজার ফাঁকগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম।

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলল, 'রিভলভার'—আর সেই সঙ্গে তার নিজের হাতটাও চলে গেল কোটের ভিতর। আড়চোখে দেখলাম লালমোহনবাবুর হাতেও রিভলভার এসে গেছে, আর সেটা অসম্ভব কাঁপছে।

হঠাৎ একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম, আর তার পরমুহূর্তেই দেখলাম রাস্তার শেষ মাথায় বাঁ দিকের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে মুকুল দৌড়ে বেরিয়ে এল—তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে আরো দ্বিগুণ জোরে ছুটে এসে ফেলুদার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছে, তার মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে।

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কী হয়েছে, কিন্তু ফেলুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমার কথা বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করে 'একে একটু দেখুন' বলে মুকুলকে লালমোহনবাবুর জিম্মায় রেখে ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল যেখান থেকে মুকুল বেরিয়েছে সেই দিকে। আমিও চললাম তার পিছন পিছন।

এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বাড়ছে। মনে হয় কে যেন পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—খট্—খটাং—খুট্—খুট্...

বাড়িটার কাছে পৌঁছে দেয়ালের দিকটায় ঘেঁষে গেল ফেলুদা।

আর তিন পা বাড়াতেই দরজার হাঁ করা ফাঁকটা দিয়ে দেখলাম ডক্টর হাজরাকে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিঠ করে পাগলের মতো একটা ভাঙা পাথরের স্তূপ থেকে একটার পর একটা পাথর তুলে এক পাশে ফেলছেন। আমরা যে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি, সেটা তাঁর খেয়াল নেই।

আরেক পা সামনে এগোল ফেলুদা—তার হাতে রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে উঁচোনো।

হঠাৎ উপর দিক থেকে একটা ঝটপট শব্দ।

একটা ময়ূর পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

মাটিতে পড়েই তীরবেগে ছুটে গিয়ে ময়ূরটা উপুড় হওয়া ডক্টর হাজরার বাঁ কানের ঠিক নিচে একটা সাংঘাতিক ঠোকর মারল। ডক্টর হাজরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে হাত দিয়ে ঠোকরানোর জায়গাটা চেপে ধরতেই তার সাদা সার্টের আস্তিনটা লাল হয়ে উঠল।

এদিকে ময়ূরটা ঠোক্কর মেরেই চলেছে। তার মধ্যেই ডক্টর হাজরা পালাতে গিয়ে আমাদের সামনে দেখে ভূত দেখার মতো ভাব করলেন। আমরা দরজা ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়ালাম, আর ময়ূর তাকে ঠুকরে ঘর থেকে বার করে দিল।

'গুপ্তধনের জায়গায় যে ময়ূরের বাসা থাকবে, আর তার মধ্যে যে ডিম থাকবে—এটা বোধহয় আপনি ভাবতে পারেননি—তাই না ?'

ফেলুদার গলার স্বর ইস্পাত, তার রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে তাগ করা। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ডক্টর হাজরাই শয়তান, আর তার শাস্তিও হয়েছে চমৎকার, কিন্তু অন্য অনেক কিছুই এখনো এত ধোঁয়াটে রয়েছে যে মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। ডক্টর হাজরা মাটিতে উপুর হয়ে আছেন। তার ঘাড়টা আস্তে আস্তে ফেলুদার দিকে ফিরল, তাঁর বাঁ হাতটা এখন একটা রক্তাক্ত রুমাল সমেত ক্ষতের উপর চাপা।

ফেলুদা বলল, 'আর কোনো আশা নেই জানেন ! এবার আপনার দু-দিকের রাস্তাই বন্ধ।'

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই ডক্টর হাজরা হঠাৎ চোখের পলকে দাঁড়িয়ে উঠে একটা উন্মাদ দৌড় দিলেন উল্টো দিকে। ফেলুদা রিভলভারটা নামিয়ে নিল—কারণ সত্যিই পালাবার কোনো পথ নেই। উল্টো দিক থেকে আমাদের দু'জন চেনা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। যার হাতে লাঠি নেই, তিনি খপ করে ক্রিকেট বল লোফার মতো ডক্টর হাজরাকে বগলদাবা করে নিলেন।

এবারে লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকটি ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা রিভলভারটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন ডক্টর হাজরা।'

অ্যাঁ ! ইনিই ডক্টর হাজরা ?

ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আপনিই তো বোধহয় প্রদোষ মিত্তির ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাগরা পরার দরুন ফোসকাটা এখনো সারেনি বলে মনে হচ্ছে...'

আসল ডক্টর হাজরা হেসে বললেন, 'পরশু সুধীরবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলাম। উনিই বললেন আপনি এসেছেন। যা বর্ণনা দিলেন তা থেকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর রাঠোর।'

'আর উনি ?' ফেলুদা হাত-কড়া পরা মাথা হেঁট-করা ময়ূরের ঠোক্কর-খাওয়া ভদ্রলোকটির দিকে দেখাল। 'উনিই বুঝি ভবানন্দ ?'

'ইয়েস', বললেন ডক্টর হাজরা, 'ওরফে অমিয়নাথ বর্মণ, ওরফে দ্য গ্রেট বারম্যান—উইজার্ড অফ দ্য ইস্ট।'

॥ ১২ ॥

ভবানন্দ এখন রাজস্থানী পুলিশের জিম্মায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরাকে খুন করার চেষ্টা, তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়া, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ হাজরার ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে উটের দুধ দেওয়া কফি খাচ্ছি। মুকুল সামনের বাগানে দিব্যি ফুর্তিতে খেলে বেড়াচ্ছে, কারণ সে জানে আজই সে কলকাতা রওনা হবে। সোনার কেল্লা দেখার পর তার আর রাজস্থানে থাকার ইচ্ছে নেই।

ফেলুদা আসল ডক্টর হাজরার দিকে ফিরে বলল, 'ভবানন্দ শিকাগোতে সত্যিই ভণ্ডামি করছিল তো? কাগজে যা বেরিয়েছিল তা সত্যি তো?'

হাজরা বললেন, 'ষোল আনা সত্যি। ভবানন্দ আর তার সহকারী মিলে যে

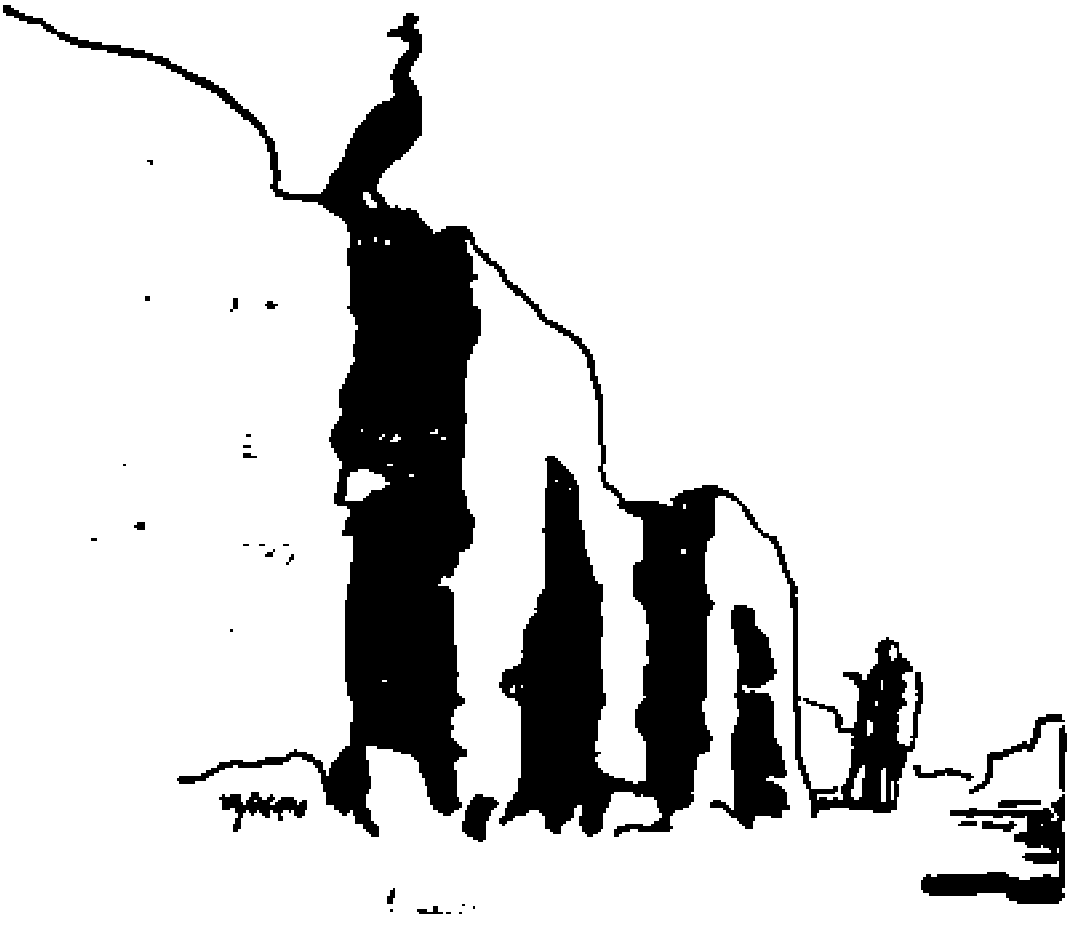

কত দেশে কত কুকীর্তি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া শিকাগোর আরো ব্যাপার আছে। নিজের ভণ্ডামির সঙ্গে সঙ্গে আমার মিথ্যে বদনাম রটাচ্ছিল, আমার কাজের বিস্তর অসুবিধা করছিল। কাজেই শেষটায় বাধ্য হয়ে স্টেপ নিতে হল। অবিশ্যি এ হল চার বছর আগের কথা। ওরা কবে দেশে ফিরেছে জানি না। আমি ফিরেছি মাত্র তিন মাস হল। সুধীরবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম, সেখানে তার ছেলের কথা শুনে তাকে দেখতে যাই। তার পরের ব্যাপার তো আপনি জানেনই। আমি যখন মুকুলকে নিয়ে রাজস্থানে আসা স্থির করলাম, তখন কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে আমার পিছনে লোক লাগবে।'

'এক ঢিলে দুই পাখি কে না মারতে চায় বলুন?' ফেলুদা বলল। 'একে গুপ্তধনের আশা, তার উপর আপনার উপর প্রতিশোধ।...তা, এদের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়নি আপনার?'

'মোটেই না। প্রথম দেখা হয় একেবারে বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট

রুমে। আমি আগ্রায় একদিন থেকে না গেলে ট্রেনে ওদের সঙ্গে দেখা হত না। ভদ্রলোকেরা নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।'

'আপনি চিনতে পারলেন না?'

'কী করে চিনব? শিকাগোতে তো এরা ছিলেন একেবারে শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত মহাঋষি মহেশ!'

'তারপর?'

'তারপর আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলো, ম্যাজিক দেখিয়ে মুকুলের সঙ্গে ভাব জমালো, একই ট্রেনে একই কামরায় উঠল। কিষণগড়ে নেমে মুকুলকে কেল্লা দেখাব সেটা আগেই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এরাও যে আমার পিছু পিছু নেমেছে সেটা জানতে পারিনি। আমি কেল্লায় যাবার কিছু পরেই এরাও পৌঁছেছে। জনমানবশূন্য জায়গা, চোরের মতো এসেছে, আড়ালে আড়ালে তাকে তাকে থেকেছে, সুযোগ পেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গড়াতে গড়াতে শ' খানেক ফুট নিচে গিয়ে একটা ঝোপড়ায় আটকে পড়ে বেঁচে গেলাম। জামা খুললে দেখবেন সর্বাঙ্গ ছড়ে গেছে। যাই হোক—এই ঝোপড়ার পাশে ঘণ্টাখানেক ওইভাবেই রয়ে গেলাম। আমি চাইছিলাম যে ওরা আপদ গেছে ভেবে নিশ্চিন্তে মুকুলকে নিয়ে চলে যায়। যখন স্টেশনে পৌঁছালাম ততক্ষণে আটটার মারোয়াড়ের ট্রেন চলে গেছে। আর তাতে করেই চলে গেছে মুকুল, এবং আমার যাবতীয় মালপত্র সমেত ওই দুই ধুরন্ধর। তার মানে লোকের কাছে আমার সঠিক পরিচয়টা দেবার রাস্তাটাও তারা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।'

'মুকুল ওদের সঙ্গে যেতে আপত্তি করল না?'

ডক্টর হাজরা হাসলেন: 'মুকুলকে চিনতে পারেননি এখনো? নিজের বাপ-মায়ের ওপরই যখন ওর টান নেই, তখন দু'জন অচেনা লোকের মধ্যে ও পার্থক্য করবে কেন? ভবানন্দ বলেছে ওকে সোনার কেল্লা দেখাবে—ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। যাই হোক—হাল তো ছাড়লামই না, বরং জিদ চেপে গেল। মানি-ব্যাগটা সঙ্গেই ছিল। নিজের ছেঁড়া জামাকাপড় পুঁটলির মধ্যে নিয়ে নতুন পোশাক কিনে রাজস্থানী সাজলাম। নাগরা পরা অভ্যেস নেই, পায়ে ফোসকা পড়ে গেল। পরদিন কিষণগড়ে আপনাদের কামরায় উঠলাম। মারওয়াড় থেকেও একই ট্রেনে যোধপুর এলাম। রঘুনাথ সরাইয়ে উঠলাম। চেনা লোক ছিল শহরে—প্রফেসর ত্রিবেদী—তাকে গোড়ায় কিছু জানালাম না। বেশি হৈ-হল্লা হলে ওরা পালাতে পারে, কিংবা মুকুল ভয় পেয়ে বেঁকে বসতে পারে। আমি নিজে আঁচ করেছিলাম জয়সলমীরই আসল জায়গা, এখন খালি অপেক্ষা—কবে ভবানন্দও মুকুলকে নিয়ে জয়সলমীরে পাড়ি দেয়। তার আগে পর্যন্ত আমার কাজ হবে ভবানন্দ ও মুকুলকে চোখে চোখে রাখা।'

'সেদিন সার্কিট হাউসের বাইরে তো আপনিই ঘুরছিলেন ?'

'হ্যাঁ। আর তাতেও তো এক ফ্যাসাদ। মুকুল দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে। অন্তত সেরকম একটা ভাব করেই গেট থেকে বেরিয়ে সোজা আমার দিকে চলে আসছিল।'

'তারপর আপনি ভবানন্দকে ফলো করে পোকরানের গাড়িতে উঠলেন ?'

'হ্যাঁ। আর সবচেয়ে মজা—ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম আপনারা গাড়ি থামাতে চেষ্টা করছেন।'

'সেটা নিশ্চয় ভবানন্দও দেখেছিল, আর তাই জেনে গিয়েছিল রামদেওরাতেই হয়ত আমরা ট্রেন ধরব।'

ডক্টর হাজরা বলে চললেন, 'ট্রেনে ওঠার আগে ত্রিবেদীকে ফোন করে জয়সলমীরে পুলিশকে খবর দিতে বলে দিয়েছিলাম। তার আগেই অবশ্য ওর বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফোন করে আপনার আসার খবর পেয়েছি, আর ত্রিবেদীর কাছ থেকে একটি স্যুট ধার করে ভদ্রলোক সেজেছি।'

ফেলুদা বলল, 'পোকরানে গিয়ে বোধহয় দেখলেন ভবানন্দের অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যাক্সি নিয়ে হাজির, তাই না ?'

'ওইখানেই তো গণ্ডগোল হয়ে গেল। আই লস্ট সেম। দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে আবার রাত্রের ট্রেন ধরতে হল। সে গাড়িতে যে আপনি আছেন তা তো জানি না। আপনাদের প্রথম দেখলুম এই ডাকবাংলোতে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি কখন প্রথম ভবানন্দকে সন্দেহ করলেন ?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'ভবানন্দকে সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল বলা হবে। করেছিলাম ডক্টর হাজরাকে। যোধপুরে নয়, বিকানিরে। দেবীকুণ্ডে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। তার ঠিক আগেই একটা দেশলাই কুড়িয়ে পাই—টেক্কা মার্কা। এটা রাজস্থানে বিক্রি হয় না। তারপর ভদ্রলোককে ওই বেগতিক অবস্থায় দেখে মনে হল যে-লোক এই কুকর্মটি করেছে তারই হয়ত দেশলাই। কিন্তু তারপর দেখলাম বাঁধনেও গণ্ডগোল। একজন লোকের হাত-পা এক সঙ্গে বেঁধে দিলে সে লোক অসহায় হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে শুধু হাত দুটো পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে একটু বুদ্ধি থাকলেই পা দুটোকে ভাঁজ করে তার তলা দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বাঁধন খুলে ফেলা যায়। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক নিজেই নিজেকে বেঁধেছেন। এটা বুঝেও কিন্তু ভাবছি, ডক্টর হাজরাই আসল কালপ্রিট। শেষটায় চোখ খুলে গেল আজ সকালে ট্রেনে—আপনার প্যাডে লেখা ভবানন্দর একটা চিঠির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে।'

'কীরকম ?'

সকলে হেসে ফেটে পড়ার ঠিক আগে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে দাঁত বার করে জটায়ু বললেন, 'ফর মাই কালেকশন—অ্যান্ড আজ এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান ! থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

বাক্স রহস্য

॥ ১ ॥

ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু অভিযানের বিষয়ে একটা দারুণ লোমখাড়া-করা বই এই সবে শেষ করেছি, আর তার এত অল্প দিনের মধ্যেই যে বরফের দেশে গিয়ে পড়তে হবে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি বরফের দেশ বলতে কেউ যেন আবার নর্থ পোল সাউথ পোল ভেবে না বসে। ওসব দেশে কোনও মামলার তদন্ত বা রহস্যের সমাধান করতে ফেলুদাকে কোনওদিন যেতে হবে বলে মনে হয় না। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা আমাদেরই দেশের ভিতর; কিন্তু যে সময়টায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে বরফ, আর সে বরফ আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নীচে নেমে এসে মাটিতে পুরু হয়ে জমে, আর রোদ্দুরে সে বরফের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়, আর সে বরফ মাটি থেকে মুঠো করে তুলে নিয়ে বল পাকিয়ে ছোঁড়া যায়।

আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের শুরু হয় গত মার্চ মাসের এক বিষ্যুদবারের সকালে। ফেলুদার এখন গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নাম হয়েছে, তাই ওর কাছে মক্কেলও আসে মাঝে মাঝে। তবে ভাল কেস না হলে ও নেয় না। ভাল মানে যাতে ওর আশ্চর্য বুদ্ধিটা শানিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় এমন কেস। এবারের কেসটা প্রথমে শুনে তেমন আহামরি কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ফেলুদার বোধহয় একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যার ফলে ও সেটার মধ্যে কীসের জানি গন্ধ পেয়ে নিতে রাজি হয়ে গেল। অবিশ্যি এও হতে পারে যে মক্কেল ছিলেন বেশ হোমরা-চোমরা লোক, আর তাই ফেলুদা হয়তো একটা মোটা রকম দাঁও মারার সুযোগ দেখে থাকতে পারে। পরে ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ও এমন কট্মট্ করে আমার

দিকে চাইল যে আমি একেবারে বেমালুম চুপ মেরে গেলাম।

মক্কেলের নাম দীননাথ লাহিড়ী। বুধবার সন্ধ্যাবেলা ফোন করে পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় আসবেন বলেছিলেন, আর ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পেলাম আমাদের তারা রোডের বাড়ির সামনে। গাড়ির হর্নটা অদ্ভুত ধরনের, আর সেটা শোনামাত্র আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ফেলুদা একটা ইশারা করে আমায় থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'অত আদেখ্‌লামো কেন? বেলটা বাজুক।'

বেল বাজার পর দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল তার গাড়িটার দিকে। এমন পেল্লায় গাড়ি আমি এক রোল্‌স রয়েস ছাড়া আর কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের নিজের চেহারাটাও বেশ চোখে পড়ার মতো, যদিও সেটা তার সাইজের জন্য নয়। টক্‌টকে ফরসা গায়ের রং, বয়স আন্দাজ পঞ্চান্নর কাছাকাছি, পরনে কোঁচানো ফিন্‌ফিনে ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, আর পায়ে সাদা শুঁড় তোলা নাগরা। এ ছাড়া বাঁ হাতে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো হাতলওয়ালা ছড়ি আর ডান হাতে রয়েছে একটা নীল চৌকো অ্যাটাচি কেস। এ রকম বাক্স আমি ঢের দেখেছি। আমাদের বাড়িতেই দুটো আছে—একটা বাবার, একটা ফেলুদার। এয়ার ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের এই বাক্স বিনি পয়সায় দেয়।

ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে সবচেয়ে ভাল আর্ম চেয়ারটায় বসতে দিয়ে ফেলুদা তার উল্টোমুখে সাধারণ চেয়ারটায় বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আমিই কাল টেলিফোন করেছিলাম। আমার নাম দীননাথ লাহিড়ী।

ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল, 'আপনি আর কিছু বলার আগে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'এক নম্বর—আপনার চায়ে আপত্তি আছে?'

ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিস্টার মিত্তির, অসময়ে কিছু খাওয়ার অভ্যাসটা আমার একেবারেই নেই। তবে আপনি নিজে খেতে চাইলে স্বচ্ছন্দে খেতে

পারেন।'

'ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনার গাড়িটা কি হিস্পানো সুইজা?'

'ঠিক ধরেছেন। এ জাতের গাড়ি বেশি নেই এদেশে। থার্টি ফোরে কিনেছিলেন আমার বাবা। আপনি গাড়িতে ইন্টারেস্টেড?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমি অনেক ব্যাপারেই ইন্টারেস্টেড। অবিশ্যি সেটা খানিকটা আমার পেশার খাতিরেই।'

'আই সি। তা যাই হোক্—যে জন্য আপনার কাছে আসা। আপনার কাছে ব্যাপারটা হয়তো তুচ্ছ বলে মনে হবে। আপনার রেপুটেশন আমি জানি, সুতরাং আপনাকে আমি জোর করতে পারি না, কেবলমাত্র অনুরোধ করতে পারি যে, কেসটা আপনি নিন।'

ভদ্রলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ঢঙে বনেদি ভাব থাকলেও, হাম্‌বড়া ভাব একটুও নেই। বরঞ্চ রীতিমত ঠাণ্ডা আর ভদ্র।

'আপনার কেসটা কী সেটা যদি বলেন...'

মিস্টার লাহিড়ী মৃদু হেসে সামনে টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'কেসও বলতে পারেন, আবার অ্যাটাচি কেসও বলতে পারেন...হেঁহেঁ। এই বাক্সটাকে নিয়েই ঘটনা।'

ফেলুদা বাক্সটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এটা বার কয়েক বিদেশে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ট্যাগগুলো ছেঁড়া হলেও, ইলাস্টিক ব্যান্ডগুলো এখনও দেখছি হাতলে লেগে রয়েছে। এক, দুই, তিন...'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমারটার হাতলেও ঠিক ওইরকম রয়েছে।'

'আপনারটার...? তার মানে এই বাক্সটা আপনার নয়?'

'আজ্ঞে না,' মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'এটা আরেকজনের। আমারটার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।'

'আই সী...তা কীভাবে হল বদল? ট্রেনে না প্লেনে?'

'ট্রেনে। কালকা মেলে। দিল্লি থেকে ফিরছিলাম। একটা ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চারজন যাত্রী ছিলাম। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।'

'কার সঙ্গে হয়েছে সেটা জানা নেই বোধহয়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে না। সেটা জানা থাকলে বোধ হয় আপনার কাছে আসার প্রয়োজন হত না।'

'বাকি তিনজনের নামও অবশ্যই জানা নেই?'

'একজন ছিলেন বাঙালি। নাম পাকড়াশী। দিল্লি থেকে আমারই সঙ্গে উঠলেন।'

'নামটা জানলেন কী করে?'

'অন্য আরেকটি যাত্রীর সঙ্গে তাঁর চেনা বেরিয়ে গেল। তিনি, হ্যালো মিস্টার পাকড়াশী বলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। কথাবার্তায় দুজনকেই বিজনেসম্যান বলে মনে হল। কনট্রাক্ট, টেন্ডার ইত্যাদি কথা কানে আসছিল।'

'যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার নামটা জানতে পারেননি?'

'আজ্ঞে না। তবে তিনি অবাঙালি, যদিও বাংলা জানেন, আর মোটামুটি ভালই বলেন। কথায় বুঝলাম তিনি সিমলা থেকে আসছেন।'

'আর তৃতীয় ব্যক্তি?'

'তিনি বেশির ভাগ সময় বাঙ্কের উপরেই ছিলেন, কেবল লাঞ্চ আর ডিনারের সময় নেমেছিলেন। তিনিও বাঙালি নন। দিল্লি থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তিনি আমায় একটা আপেল অফার করে বলেছিলেন সেটা নিজের বাগানের। আন্দাজে মনে হয় তিনিও হয়তো সিমলাতেই থাকেন, আর সেখানেই তাঁর অরচার্ড।'

'আপনি খেয়েছিলেন আপেলটা?'

'হ্যাঁ, কেন খাব না। দিব্যি সুস্বাদু আপেল।'

'তা হলে ট্রেনে আপনি আপনার অসময়ের নিয়মটা মানেন না বলুন!' ফেলুদার ঠোঁটের কোণে মিচকি হাসি।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, 'সর্বনাশ! আপনার দৃষ্টি এড়ানো তো ভারী কঠিন দেখছি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন। চলন্ত ট্রেনে সময়ের নিয়মগুলো মন সব সময় মানতে চায় না।'

'এক্সকিউজ মি', ফেলুদা বলল, 'আপনারা কে কোথায়

বসেছিলেন সেটা জানতে পারলে ভাল হত।'

'আমি ছিলাম একটা লোয়ার বার্থে। আমার উপরের বার্থে ছিলেন মিস্টার পাকড়াশী; উল্টোদিকের আপার বার্থে ছিলেন আপেলওয়ালা, আর নীচে ছিলেন অবাঙালি বিজনেসম্যানটি।'

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর হাত কচলে আঙুল মট্‌কে বলল, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—আমি একটু চা বলছি। ইচ্ছে হলে খাবেন, না হয় না। তোপ্‌সে, তুই যা তো চট করে।'

আমি এক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে শ্রীনাথকে চায়ের কথা বলে আবার বৈঠকখানায় এসে দেখি, ফেলুদা অ্যাটাচি কেসটা খুলেছে।

'চাবি দেওয়া ছিল না বুঝি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। আমারটাতেও ছিল না। কাজেই যে নিয়েছে সে অনায়াসে খুলে দেখতে পারে ভেতরে কী আছে। এটার মধ্যে অবিশ্যি সব মামুলি জিনিস।'

সত্যিই তাই। সাবান চিরুনি বুরুশ টুথব্রাশ টুথপেস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, দুটো ভাঁজ করা খবরের কাগজ, একটা পেপার ব্যাক বই—এই সব ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না।

'আপনার বাক্সে কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

দীননাথবাবু বললেন, 'নাথিং। এ বাক্সে যা দেখছেন, তার চেয়েও কম মূল্যবান। কেবল একটা লেখা ছিল—একটা হাতের লেখা রচনা—ভ্রমণকাহিনী—সেটা ট্রেনে পড়ব বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম। বেশ লাগছিল পড়তে। তিব্বতের ঘটনা।'

'তিব্বতের ঘটনা?' ফেলুদার যেন খানিকটা কৌতূহল বাড়ল।

'হ্যাঁ। ১৯১৭ সালের লেখা। লেখকের নাম শম্ভুচরণ বোস। যা বুঝছি, লেখাটা আসে আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। কারণ ওটা আমার জ্যাঠামশাইকে উৎসর্গ করা। আমার জ্যাঠামশাই হলেন সতীনাথ লাহিড়ী, কাঠমুণ্ডুতে থাকতেন। রাণাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউটারি করতেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্রায় অথর্ব অবস্থায় দেশে ফেরেন—পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। তার কিছুদিন পরেই মারা যান। ওর সঙ্গেই জিনিসপত্তরের মধ্যে একটা নেপালি

বাক্স ছিল। আমাদের বাড়ির বক্সরুমের একটা তাকের কোনায় পড়ে থাকত। ওটার অস্তিত্বই জানতাম না। সম্প্রতি বাড়িতে আরশোলা আর ইঁদুরের উপদ্রব বড্ড বেড়েছিল বলে পেস্ট কন্ট্রোলের লোক ডাকা হয়। তাদের জন্যই বাক্সটা নামাতে হয় আর এই বাক্সটা থেকেই লেখাটা বেরোয়।'

'কবে?'

'এই তো—আমি দিল্লি যাবার আগের দিন।'

ফেলুদা অন্যমনস্ক। বিড় বিড় করে বলল, 'শম্ভুচরণ...শম্ভুচরণ...'

'যাই হোক', মিস্টার লাহিড়ী বললেন, 'ওই লেখার মূল্য আমার কাছে তেমন কিছু নয়। সত্যি বলতে কী, আমি বাক্সটা ফেরত পাবার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ বোধ করছিলাম না। আর এই যে বাক্সটা দেখছেন, এটারও মালিককে পাওয়া যাবে এমন কোনও ভরসা না দেখে এটা আমার ভাইপোকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কাল রাত থেকে হঠাৎ মনে হতে লাগল—এসব জিনিস দেখতে তেমন জরুরি মনে না হলেও, এর মালিকের কাছে এর কোনও কোনওটার হয়তো মূল্য থাকতেও পারে। যেমন ধরুন এই রুমাল। এতে নকশা করে G লেখা রয়েছে। কে জানে কার সূচিকর্ম এই G? হয়তো মালিকের স্ত্রীর। হয়তো স্ত্রী আর জীবিত নেই! এই সব ভেবে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, তাই আজ আমার ভাইপোর ঘর থেকে বাক্সটা তুলে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, আমারটা ফেরত পাই না-পাই তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু এ বাক্স মালিকের কাছে পৌঁছে দিলে আমি মনে শান্তি পাব।'

চা এল। ফেলুদা আজকাল চায়ের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছে। এ চা আসে কার্শিয়ঙের মকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে। পেয়ালা সামনে এনে রাখলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ বেরোয়। চায়ে একটা নিঃশব্দ চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'বাক্সটা কি অনেকবার খোলার দরকার হয়েছিল ট্রেনে?'

'মাত্র দু'বার। সকালে দিল্লিতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা বার করে নিই, আর রাত্রে ঘুমোবার আগে আবার ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখি।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। দীননাথবাবু সিগারেট খান না। দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'আপনি চাইছেন—এ বাক্স তাকে ফেরত দিয়ে আপনার বাক্সটা আপনার কাছে এনে হাজির করি—এই তো?'

'হতাশ হলেন নাকি? ব্যাপারটা বড্ড নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে?'

ফেলুদা তার ডান হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিয়ে বলল, 'না। আপনার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। যে ধরনের সব কেস আমার কাছে আসে সেগুলোর তুলনায় এই কেসটার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।'

দীননাথবাবু যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। একটা লম্বা হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'আপনার রাজি হওয়াটা আমার কাছে অনেকখানি।'

ফেলুদা বলল, 'আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব। তবে বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, এবার আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিতে চাই।'

'বলুন।'

ফেলুদা চট করে উঠে পাশেই তার শোবার ঘর থেকে তার বিখ্যাত সবুজ নোট বইটা নিয়ে এল। তারপর হাতে পেনসিল নিয়ে তার প্রশ্ন আরম্ভ করল।

'কোন্ তারিখে রওনা হন দিল্লি থেকে?'

'পাঁচই মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ছটায় দিল্লি ছেড়েছি। কলকাতায় পৌঁছেছি পরদিন সকাল সাড়ে নটায়।'

'আজ হল ৯ই। অর্থাৎ গত তরশু। আর কাল রাত্রে আপনি আমাকে টেলিফোন করেছেন।'

ফেলুদা অ্যাটাচি কেসটার ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের কোডাক ফিল্মের কৌটো বার করে তার ঢাকনার প্যাঁচটা খুলতেই তার থেকে কয়েকটা সুপুরি বেরিয়ে টেবিলের উপর পড়ল। তার একটা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ব্যাগে এমন কিছু ছিল যা থেকে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে?'

'যতদূর মনে পড়ে, কিছুই ছিল না।'

'হুঁ... এবার আপনার তিনজন সহযাত্রীর মোটামুটি বর্ণনা লিখে নিতে চাই। আপনি যদি একটু হেল্‌প করেন।'

দীননাথবাবু মাথাটাকে চিতিয়ে সিলিং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পাকড়াশীর বয়স আমার চেয়ে বেশি। ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। গায়ের রং মাঝারি। ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, কণ্ঠস্বর কর্কশ।'

'বেশ।'

'যিনি আপেল দিলেন তাঁর রং ফরসা। রোগা একহারা চেহারা, টিকোলো নাক, চোখে সোনার চশমা, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় টাক, কেবল কানের পাশে সামান্য কাঁচা চুল। ইংরেজি উচ্চারণ প্রায় সাহেবদের মতো। সর্দি হয়েছিল। বার বার টিসুতে নাক ঝাড়ছিল।'

'বাবা, খাঁটি সাহেব! আর তৃতীয় ভদ্রলোক?'

'আদৌ মনে রাখার মতো চেহারা নয়। তবে হ্যাঁ—নিরামিষাশী। উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভেজিটেবল থালি নিলেন ডিনার এবং লাঞ্চে।'

ফেলুদা সব ব্যাপারটা খাতায় নোট করে চলেছে। শেষ হলে পর খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, 'আর কিছু?'

দীননাথবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আর তো কিছু বলার মতো দেখছি না। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়ই আমার মন ছিল ওই লেখাটার দিকে। রাত্রে ডিনার খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ট্রেনে সচরাচর এত ভাল ঘুম হয় না। ঘুম ভেঙেছে একেবারে হাওড়ায় এসে, আর তাও মিস্টার পাকড়াশী তুলে দিলেন বলে।'

'তার মানে আপনিই বোধ হয় সব শেষে কামরা ছেড়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর তার আগেই অবিশ্যি আপনার ব্যাগ অন্যের হাতে চলে গেছে।'

'তা তো বটেই।'

'ভেরি গুড।' ফেলুদা খাতা বন্ধ করে পেনসিলটা শার্টের পকেটে

গুঁজে দিয়ে বলল, 'দেখি আমি কী করতে পারি!'

দীননাথবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার যা পারিশ্রমিক তা তো দেবই, তা ছাড়া আপনার কিছু ঘোরাঘুরি আছে, তদন্তের ব্যাপারে আরও এদিক ওদিক খরচ আছে, সেই বাবদ আমি কিছু ক্যাশ টাকা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।'

ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন, আর ফেলুদাও দেখলাম বিলিতি কায়দায় 'ওঃ—থ্যাঙ্কস' বলে সেটা দিব্যি পেনসিলের পিছনে পকেটে গুঁজে দিল।

দরজা খুলে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টরিতেই পাবেন। কিছু খবর পেলেই কাইন্ডলি জানাবেন; এমনকী সটান আমার বাড়িতে চলেও আসতে পারেন। সন্ধে নাগাদ এলে নিশ্চয়ই দেখা পাবেন।'

হলুদ রঙের হিস্পানো সুইজা তার গম্ভীর শাঁখের মতো হর্ন বাজিয়ে রাস্তায় জমা হওয়া লোকদের অবাক করে দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে চলে গেল। আমরা দুজনে বৈঠকখানায় ফিরে এলাম। যে চেয়ারে ভদ্রলোক বসেছিলেন, সেটায় বসে ফেলুদা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আড় ভেঙে বলল, 'এই ধরনের বনেদি মেজাজের লোক আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আর থাকবে না।'

বাক্সটা টেবিলের উপরই রাখা ছিল। ফেলুদা তার ভিতর থেকে একটা একটা করে সমস্ত জিনিস বার করে বাইরে ছড়িয়ে রাখল। অতি সাধারণ সব জিনিস। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ টাকার মাল হবে কি না সন্দেহ। ফেলুদা বলল, 'তুই একে একে বলে যা, আমি খাতায় নোট করে নিচ্ছি।' আমি একটা একটা করে জিনিস টেবিলের ওপর থেকে তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম, আর ফেলুদা লিখে যেতে লাগল। সব শেষে লিস্টটা দাঁড়াল এই রকম—

১। দু' ভাঁজ করা দুটো দিল্লির ইংরিজি খবরের কাগজ—একটা Sunday Statesman আর একটা Sunday Hindusthan Times.

২। একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া বিনাকা টুথপেস্ট। টিউবের তলার খালি অংশটা পেঁচিয়ে ওপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে

৩। একটু সবুজ রঙের বিনাকা টুথব্রাশ

৪। একটা গিলেট সেফটি রেজার

৫। একটা প্যাকেটে তিনটে থিন গিলেট ব্লেড

৬। একটা প্রায় শেষ-হয়ে-যাওয়া ওল্ড স্পাইস শেভিং ক্রিম

৭। একটা শেভিং ব্রাশ

৮। একটা নেলক্লিপ—বেশ পুরনো

৯। একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে অ্যাসপ্রোর বড়ি

১০। একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপ—খুললে প্রায় চার ফুট বাই পাঁচ ফুট

১১। একটা কোডাক ফিল্মের কৌটোর মধ্যে সুপুরি

১২। একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই—আনকোরা নতুন

১৩। একটা ভেনাস মার্কা লাল-নীল পেনসিল

১৪। একটা ভাঁজ করা রুমাল, তার এককোণে সেলাই করা নকশায় লেখা G

১৫। একটা মোরাদাবাদি ছুরি বা পেন নাইফ

১৬। একটা মুখ-মোছা ছোট তোয়ালে

১৭। একটা সেফটি পিন, মর্চে ধরা

১৮। তিনটে জেম ক্লিপ, মর্চে ধরা

১৯। একটা সার্টের বোতাম

২০। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস—এলেরি কুইনের 'দ্য ডোর বিটউইন'

লিস্ট তৈরি হলে পর ফেলুদা উপন্যাসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, 'হুইলার কোম্পানির নাম রয়েছে, কিন্তু যিনি কিনেছেন তাঁর নাম নেই। পাতা ভাঁজ করে পড়ার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের। দুশো ছত্রিশ পাতার বই, শেষ ভাঁজের দাগ রয়েছে দুশো বারো পাতায়। আন্দাজে মনে হয় ভদ্রলোক বইটা পড়ে শেষ করেছিলেন।'

ফেলুদা বই রেখে রুমালের দিকে মন দিল।

'ভদ্রলোকের নাম কিংবা পদবির প্রথম অক্ষর হল G। সম্ভবত নাম, কারণ সেটাই আরও স্বাভাবিক।'

এবার ফেলুদা কলকাতার ম্যাপটা খুলে টেবিলের ওপর পাতল।

ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। 'লাল পেনসিলের দাগ...হুঁ...এক, দুই, তিন, চার...পাঁচ জায়গায়...হুঁ...চৌরঙ্গি... পার্ক স্ট্রিট...হুঁ...ঠিক আছে। তোপ্‌সে একবার টেলিফোন ডিরেক্টরিটা দে তো আমায়।'

ম্যাপটা আবার ভাঁজ করে বাক্সে রেখে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফেলুদা বলল, 'ভাগ্য ভাল যে নামটা পাকড়াশী।' তারপর 'পি' অক্ষরে এসে একটা পাতায় একটুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সবসুদ্ধ মাত্র ষোলটা পাকড়াশীর বাড়িতে টেলিফোন—তার মধ্যে আবার দুজনে ডাক্তার। সে দুটো অবশ্যই বাদ দেওয়া যেতে পারে।'

'কেন?'

'ট্রেনে তার পরিচিত লোকটি পাকড়াশীকে মিস্টার বলে সম্বোধন করেছিল, ডক্টর নয়।'

'ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।'

ফেলুদা টেলিফোন তুলে ডায়ালিং শুরু করে দিল। প্রতিবারই নম্বর পাবার পর ও প্রশ্ন করল, 'মিস্টার পাকড়াশী কি দিল্লি থেকে ফিরেছেন?' পর পর পাঁচবার উত্তর শুনে 'সরি' বলে ফোনটা রেখে দিয়ে আবার অন্য নম্বর ডায়াল করল। ছ' বারের বার বোধহয় ঠিক লোককে পাওয়া গেল, কারণ কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল। তারপর 'ধন্যবাদ' বলে ফোন রেখে ফেলুদা বলল, 'পাওয়া গেছে। এন সি পাকড়াশী। নিজেই কথা বলল। পরশু সকালে দিল্লি থেকে ফিরেছেন কালকা মেলে। সব কিছু মিলে যাচ্ছে, তবে এঁর কোনও বাক্স বদল হয়নি।'

'তা হলে আবার বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে কেন?'

'অন্য যাত্রীদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে পারে তো। লোকটার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, যদিও ফেলু মিত্তির তাতে ঘাবড়াবার পাত্র নন। তোপ্‌সে, চ' বেরিয়ে পড়ি।'

'সে কী, বিকেলে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'তার আগে একবার সিধু জ্যাঠার কাছে যাওয়া দরকার।'

॥ ২ ॥

সিধু জ্যাঠার সঙ্গে আসলে আমাদের কোনও আত্মীয়তা নেই। বাবা যখন দেশের বাড়িতে থাকতেন—আমার জন্মের আগে—তখন পাশের বাড়িতে এই সিধু জ্যাঠা থাকতেন। তাই উনি বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠা। ফেলুদা বলে, সিধু জ্যাঠার মতো এত বিষয়ে এত জ্ঞান, আর এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি, খুব কম লোকের থাকে।

ফেলুদা যে কেন এসেছে সিধু জ্যাঠার কাছে সেটা তার প্রশ্ন শুনে প্রথম জানতে পারলাম—

'আচ্ছা, শম্ভুচরণ বোস বলে বছর ষাটেক আগের কোনও ভ্রমণ-কাহিনী লেখকের কথা আপনি জানেন? ইংরিজিতে লিখতেন তিনি।'

সিধু জ্যাঠা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলো কী হে ফেলু—তার লেখা তেরাইয়ের কাহিনী পড়নি?'

'ঠিক ঠিক', ফেলুদা বলল, 'এখন মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের নামটা চেনাচেনা লাগছিল। কিন্তু বইটা হাতে আসেনি কখনও।'

'Terrors of Terai' ছিল বইয়ের নাম। ১৯১৫ সালে লন্ডনের কীগ্যান পল কোম্পানি সে বই ছেপে বার করেছিল। দুর্দান্ত শিকারি ও পর্যটক ছিলেন শম্ভুচরণ। তবে পেশা ছিল ডাক্তারি। কাঠমুণ্ডুতে প্র্যাকটিশ করত। ওখানে তখন রাজা-টাজা হয়নি। রাণারাই ছিল সর্বেসর্বা। রাণা ফ্যামিলির অনেকের কঠিন রোগ সারিয়ে দিয়েছিল শম্ভুচরণ। ওর বইয়ে এক রাণার কথা আছে। বিজয়েন্দ্র শমশের জঙ্গ বাহাদুর। শিকারের খুব শখ, অথচ ঘোর মদ্যপ। এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে মদের বোতল নিয়ে মাচায় বসত। অথচ জানোয়ার সামনে পড়লেই হাত স্টেডি হয়ে যেত। কিন্তু একবার হয়নি। গুলি বাঘের গায়ে লাগেনি। বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল মাচার ওপর। পাশের মাচায় ছিলেন শম্ভুচরণ। তারই বন্দুকের অব্যর্থ গুলি শেষটায় রাণাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। অবিশ্যি রাণাও তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একটি মহামূল্য রত্ন উপহার দিয়ে। থ্রিলিং গল্প। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে পড়ে দেখো। বাজারে চট

করে পাবে না।'

'আচ্ছা উনি কি তিব্বতও গিয়েছিলেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'গিয়েছিল বইকী। মারা যায় টোয়েন্টিওয়ানে। আমি তখন সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছি। কাগজে একটা অবিচুয়ারি বেরিয়েছিল। তাতে লিখেছিল, শম্ভুচরণ রিটায়ার করবার পর তিব্বত যায়। তবে মারা যায় কাঠমুণ্ডুতে।'

'হুঁ...'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কথাগুলো খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বলল, 'আচ্ছা ধরুন, আজ যদি হঠাৎ জানা যায় যে, তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তার একটা অপ্রকাশিত বড় লেখা রয়েছে, ইংরিজিতে, তা হলে সেটা দামি জিনিস হবে না কি?'

'ওরেব্বাবা!' সিধু জ্যাঠার চক্চকে টাক উত্তেজনায় নেচে উঠল। 'কী বলছ ফেলু—টেরাই পড়ে লন্ডন টাইমস কী উচ্ছ্বাস করেছিল সে তো মনে আছে আমার! আর শুধু কাহিনী নয়, শম্ভুচরণের ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি রংদার। একেবারে স্ফটিকের মতো। ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে নাকি?'

'হয়তো আছে।'

'যদি তোমার হাতে আসে, আমাকে একবারটি দেখিয়ো, আর যদি অকশনে বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে বলে খবর পাও, তা হলেও জানিয়ো। আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত বিড করতে রাজি আছি।...'

সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গরম কোকো খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ফেলুদাকে বললাম, 'মিস্টার লাহিড়ীর বাক্সে যে একটা এত দামি জিনিস রয়েছে সেটা তো উনি জানেনই না। ওকে জানাবে না?'

ফেলুদা বলল, 'অত তাড়া কীসের? আগে দেখি না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আর কাজের ভারটা তো আমি এমনিতেই নিয়েছি, কেবল উৎসাহটা একটু বেশি পাচ্ছি, এই যা।'

নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর বাড়িটা হল ল্যান্সডাউন রোডে। দেখলেই বোঝা যায় অন্তত চল্লিশ বছরের পুরনো বাড়ি। ফেলুদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে একটা বাড়ির কোন্ কোন্ জিনিস থেকে তার বয়সটা আন্দাজ করা যায়। যেমন, পঞ্চাশ বছর আগে একরকম

জানালা ছিল যেটা চল্লিশ বছর আগের বাড়িতে আর দেখা যায় না। তা ছাড়া বারান্দার রেলিং-এর প্যাটার্ন, ছাতের পাঁচিল, গেটের নকশা, গাড়িবারান্দার থাম—এই সব থেকেও বাড়ির বয়স আন্দাজ করা যায়। এ বাড়িটা নির্ঘাত উনিশশো কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে তৈরি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির সামনে প্রথমেই চোখে পড়ল গেটের ওপর লটকানো কাঠের ফলক, 'কুকুর হইতে সাবধান।' ফেলুদা বলল, 'কুকুরের মালিক হইতে সাবধান কথাটাও লেখা উচিত ছিল।' গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে পৌঁছতেই

দারোয়ানের দেখা পেলাম, আর ফেলুদা তার হাতে দিয়ে দিল তার ভিজিটিং কার্ড, যাতে লেখা আছে Pradosh C. Mitter, Private Investigator. মিনিট খানেকের মধ্যেই দরোয়ান ফিরে এসে বলল, মালিক আমাদের ভিতরে ডাকছেন।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো ল্যান্ডিং পেরিয়ে প্রায় দশ ফুট উঁচু দরজার পর্দা ফাঁক করে আমরা যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা

বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড ঘরের তিনদিকে উঁচু উঁচু বইয়ের আলমারিতে ঠাসা বই। এ ছাড়া ফার্নিচার, কার্পেট, দেয়ালে ছবি, আর মাথার উপরে ঝাড় লণ্ঠন—এসবও আছে। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা অগোছালো অপরিষ্কার ভাব। এ বাড়িতে ঝাড়পোঁছ জিনিসটার যে বিশেষ বালাই নেই সেটা সহজেই বোঝা যায়।

মিস্টার পাকড়াশীকে পেলাম বৈঠকখানার পিছনদিকের ঘরটায়। দেখে বুঝলাম এটা তাঁর আপিস—বা যাকে বলে স্টাডি। টাইপ করার শব্দ আগেই পেয়েছিলাম, ঢুকে দেখলাম ভদ্রলোক একটা সবুজ রেক্সিনে ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের প্রকাণ্ড টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছে। টেবিলটা রয়েছে ঘরের ডান দিকে। বাঁ দিকে রয়েছে একটা আলাদা বসবার জায়গা। তিনটে কৌচ, আর তার সামনে একটা নিচু গোল টেবিল। এই টেবিলের উপর আবার রয়েছে ঘুটি সাজানো একটা দাবার বোর্ড, আর তার পাশেই একটা দাবার বই। সব শেষে যেটা চোখে পড়ল সেটা হল টেবিলের পিছন দিকে কার্পেটের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া একটা জাঁদরেল কুকুর।

ভদ্রলোকের নিজের চেহারা দীননাথবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কেবল একটা নতুন জিনিস হচ্ছে তার মুখে বাঁকানো পাইপটা।

আমরা ঘরে ঢুকতে টাইপিং বন্ধ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কোনটি মিস্টার মিত্তির, আপনি না ইনি?'

প্রশ্নটা হয়তো মিস্টার পাকড়াশী ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, কিন্তু ফেলুদা হাসল না। সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'আজ্ঞে আমি। এটি আমার কাজিন।'

পাকড়াশী বললেন, 'কী করে জানব? গানবাজনা অ্যাকটিং ছবি-আঁকা মায় গুরুগিরিতে পর্যন্ত যদি বালকদের এত ট্যালেন্ট থাকতে পারে, তা হলে গোয়েন্দাগিরিতেই বা থাকবে না কেন? যাকগে, এবারে বলুন—এই সাতে-নেই-পাঁচে-নেই মানুষটিকে এভাবে জ্বালাতে এলেন কেন।'

ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলে বলেছিল লোকটার মেজাজ রুক্ষ। আমার মনে হল, খিটখিটেমোর জন্য কম্পিটিশন থাকলে ইনি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন হতেন।

'কে আপনাকে পাঠিয়েছে বললেন?' মিস্টার পাকড়াশী প্রশ্ন করলেন।

'মিস্টার লাহিড়ীর কাছ থেকে আপনার নামটা জানি। দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে কলকাতায় এসেছেন তিনদিন আগে।'

'অ। তারই বাক্স হারিয়েছে বলছে?'

'আরেকজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।'

'কেয়ারলেস ফুল। তা সেই বাক্স উদ্ধারের জন্য ডিটেকটিভ লাগাতে হল কেন? কী এমন ধনদৌলত ছিল তার মধ্যে শুনি?'

'বিশেষ কিছু না। একটা পুরনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল। ভ্রমণ-কাহিনী। সেটার আর কপি নেই।'

আসল কারণটা বললে পাকড়াশী মশাই মোটেই ইমপ্রেসড হতেন না বলেই বোধহয় ফেলুদা লেখার কথাটা বলল।

'ম্যানুস্ক্রিপ্ট?' পাকড়াশীর যেন কথাটা বিশ্বাস হল না।

'হ্যাঁ। শম্ভুচরণ বোসের লেখা একটা ভ্রমণকাহিনী। ট্রেনে উনি লেখাটা পড়েছিলেন। সেটা ওই বাক্সতেই ছিল।'

'শুধু ফুল নয়—হি সীমস টু বি এ লায়ার টু। খবরের কাগজ আর বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কিস্যু পড়েনি লোকটা। আমার সিট যদিও ছিল ওর ওপরের বাঙ্কে, দিনের বেলাটা আমি নীচেই বসেছিলাম, ওর সিটেরই একটা পাশে। উনি কী পড়ছিলেন না-পড়ছিলেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে।'

ফেলুদা চুপ। ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন, 'আপনি গোয়েন্দা হয়ে কী বুঝছেন জানি না; আপনার মুখে সামান্য যা শুনলাম তাতে ব্যাপারটা বেশ সাসপিশাস বলে মনে হচ্ছে। এনিওয়ে আপনি বুনো হাঁস ধাওয়া করতে চান করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনও হেল্প পাবেন না। আপনাকে তো টেলিফোনেই বললুম, ওরকম এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ আমার বাড়িতে গোটা তিনেক পড়ে

আছে কিন্তু এবারে সঙ্গে সে ব্যাগ ছিল না—সো আই কান্ট হেল্প ইউ।'

'যাত্রী চারজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বোধহয় আপনার চেনা বেরিয়ে গেসল-— তাই না?'

'কে—বৃজমোহন? হ্যাঁ। তেজারতির কারবার আছে। আমার সঙ্গে এক কালে কিছু ডিলিংস হয়েছে।'

তেজারতির কারবার মানে সুদে টাকা খটানোর ব্যবসা, সেটা ফেলুদা আমাকে পরে বলে দিয়েছিল।

ফেলুদা বলল, 'এই বৃজমোহনের কাছে কি ওইরকম একটা ব্যাগ থেকে থাকতে পারে?'

'সেটা আমি কী করে জানব, হ্যাঁ?'

এর পর থেকে ভদ্রলোক ফেলুদাকে আপনি বলা বন্ধ করে তুমিতে চলে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'এই ভদ্রলোকের হদিসটা দিতে পারেন?'

'ডিরেক্টরি দেখি নিয়ো', মিস্টার পাকড়াশী বললেন, 'এস এম কেদিয়া এন্ড কোম্পানি। এস এম হল বৃজমোহনের বাবা। ধরমতলায়—থুড়ি, লেনিন সরণিতে আপিস। তবে তুমি যে বলছ একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল, তা নয়; আসলে তিনজনের মধ্যে দুজনকে চিনতুম আমি।'

ফেলুদা যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, 'অন্যজনটি কে?'

'দীননাথ লাহিড়ী। এককালে রেসের মাঠে দেখতুম ওকে। আলাপ হয়েছিল একবার। আগে খুব লায়েক ছিল। ইদানীং নাকি সভ্যভব্য হয়েছে। দিল্লিতে নাকি এক গুরু বাগিয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে জানি না।'

'আর অন্য যে যাত্রীটি ছিলেন?'

বুঝতে পারলাম ফেলুদা যতদূর পারে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে নিচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে।

'এটা কি জেরা হচ্ছে?' ভদ্রলোক পাইপ কামড়ানো অবস্থাতেই তাঁর বত্রিশ পাটি দাঁত খিঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না', ফেলুদা বলল, 'আপনি বাড়িতে বসে একা একা দাবা

খেলেন, আপনার মাথা পরিষ্কার, আপনার স্মরণশক্তি ভাল—এই সব ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

পাকড়াশী মশাই বোধহয় একটু নরম হলেন। গলাটা একবার খাকরে নিয়ে বললেন, 'চেস্‌টা আমার একটা অদম্য নেশা। খেলার যে সঙ্গীটি ছিলেন তিনি গত হয়েছেন, তাই এখন একাই খেলি।'

'রোজ?'

'ডেইলি। তার আরেকটা কারণ আমার ইনসম্‌নিয়া। রাত তিনটে পর্যন্ত চলবে এই খেলা।'

'ঘুমের বড়ি খান না?'

'খাই—তবে বিশেষ কাজ দেয় না। তাতে যে শরীর কিছু খারাপ হচ্ছে তা নয়। তিনটেয় ঘুমোই, আটটায় উঠি। এ বয়সে পাঁচঘণ্টা ইজ এনাফ।'

'টাইপিংটাও কি আপনার একটা নেশা?' ফেলুদা তার এক-পেশে হাসি হেসে বলল।

'না। ওটা মাঝে মাঝে করি। সেক্রেটারি রেখে দেখেছি—এক ধার থেকে সব ফাঁকিবাজ। যাই হোক—আপনি অন্য যাত্রীটির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?—সার্প চেহারা, মাথায় টাক, বাঙালি নয়, ইংরিজি উচ্চারণ ভাল, আমায় একটা আপেল অফার করেছিলেন, খাইনি। আর কিছু? আমার বয়স তিপ্পান্ন, আমার কুকুরের বয়স সাড়ে তিন। ওটা জাতে বক্সার হাউন্ড। বাইরের লোক আমার ঘরে এসে আধঘণ্টার বেশি থাকে সেটা ও পছন্দ করে না। কাজেই—'

'ইন্টারেস্টিং লোক', ফেলুদা মন্তব্য করল।

আমরা ল্যানসডাউন রোডে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর দিকে কেন চলেছি, আর পাশ দিয়ে দুটো খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফেলুদা কেন সেগুলোকে ডাকল না, তা আমি জানি না। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, সেটা ফেলুদাকে না বলে পারলাম না—

'আচ্ছা, দীননাথবাবু যে বলেছিলেন পাকড়াশীর বয়স ষাটের

উপর, অথচ পাকড়াশী নিজে বললেন তিপ্পান্ন। আর ভদ্রলোককে দেখেও পঞ্চাশের খুব বেশি বলে মনে হয় না। এটা কীরকম হল?'

ফেলুদা বলল, 'তাতে শুধু এইটেই প্রমাণ হয় যে, দীননাথবাবুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ নয়।'

আরও মিনিট দুয়েক হাঁটতেই আমরা লোয়ার সারকুলার রোডে পড়লাম। ফেলুদা বাঁ দিকে ঘুরল। আমি বললাম, 'সেই ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছ বুঝি?' তিনদিন আগেই খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে, লোয়ার সারকুলার রোডে হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের কাছেই একটা গয়নার দোকানে তিনজন মুখোশ-পরা রিভলভারধারী লোক ঢুকে বেশ কিছু দামি পাথরটাথর নিয়ে বেয়াড়াভাবে দুমদাম রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার করে পালিয়েছে। ফেলুদা খবরটা পড়ে বলেছিল, 'এই ধরনের একটা বেপরোয়া ক্রাইমের তদন্ত করতে পারলে মন্দ হত না।' কিন্তু দুঃখের বিষয় কেসটা ফেলুদার কাছে আসেনি। তাই আমি ভাবলাম, ও হয়তো নিজেই একটু খোঁজখবর করতে যাচ্ছে।

ফেলুদা কিন্তু আমার প্রশ্নটায় কানই দিল না। ওর ভাব দেখে মনে হল, ও যেন ওয়াকিং এক্সারসাইজ করতে বেরিয়েছে, তাই হাঁটা ছাড়া কোনওদিকে মন নেই। কিন্তু মিনিটখানেক হাঁটার পরে ও হঠাৎ রাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে সোজা গিয়ে ঢুকল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের গেটের ভিতর, আর আমিও ঢুকলাম তার পেছন পেছন।

সটান রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এখানে ৬ই মার্চ সকালে সিমলা থেকে কোনও গেস্ট এসেছিলেন কি—যার নামের প্রথম অক্ষর G?

প্রশ্নটা শুনে আমার এই প্রথম খেয়াল হল যে বৃজমোহন বা নরেশ পাকড়াশী কারুরই নামের প্রথম অক্ষর G নয়। কাজেই এখন বাকি রয়েছেন শুধু আপেলওয়ালা।

রিসেপশনের লোক খাতা দেখে বলল, 'দুজন সাহেবের নাম পাচ্ছি G দিয়ে—জেরাল্ড প্রাট্লি এবং জ্রি আর হোমস। দুজনেই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ', বলে ফেলুদা বিদায় নিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নেওয়া হল। 'পার্ক হোটেল চলিয়ে' বলে ড্রাইভারকে একটা হুকুম দিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা বলল, 'ম্যাপের উপর লাল দাগগুলো ভাল করে লক্ষ করলে দেখতিস যে সেগুলো সব একেকটা হোটেলের জায়গায় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কলকাতায় এসে ভদ্রলোকের হোটেলে ওঠাই স্বাভাবিক। ভাল হোটেল বলতে এখন গ্র্যান্ড, হিন্দুস্থান ইনটারন্যাশনাল, পার্ক, গ্রেট ইস্টার্ন আর রিটজ কনটিনেন্টাল। দাগও ছিল ঠিক এই পাঁচ জায়গায়। আমাদের রাস্তায় প্রথম পড়ছে পার্ক হোটেল, কাজেই সেটা হবে আমাদের গন্তব্যস্থল।'

পার্ক হোটেলে ছ' তারিখে নামের প্রথম অক্ষর G দিয়ে কেউ আসেনি, কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে ভাল খবর পাওয়া গেল। একজন বাঙালি রিসেপ্‌শনিস্টের সঙ্গে দেখলাম ফেলুদার চেনাও রয়েছে। এই ভদ্রলোক—নাম দাশগুপ্ত—খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন যে ৬ই মার্চ সকালে পাঁচজন এ হোটেলে এসে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনই ভারতীয়, আর তিনি সিমলা থেকে এসেছিলেন, আর তাঁর নাম জি সি ধমীজা।

'এখনও আছেন কি ভদ্রলোক?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'নো স্যার। গতকাল সকালে তিনি চেক-আউট করে গেছেন।'

আমার মনে একটা আশার আলো জ্বলেছিল, সেটা আবার দপ্‌ করে নিভে গেল।

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। কিন্তু সে তবু প্রশ্ন করতে ছাড়ল না।

'কত নম্বর ঘরে ছিলেন?'

'দুশো ষোলো।'

'সে ঘর কি এখন খালি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় একজন গেস্ট আসছেন, তবে এখন খালি।'

'সেই ঘরের বেয়ারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'সার্টেনলি। আমি সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, ও-ই আপনাকে রুম-বয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।'

লিফট দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকটা

হেঁটে গিয়ে তারপর দুশো যোলো নম্বর ঘর। রুম-বয়ের দেখা পেয়ে তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফেলুদা। তারপর এদিক ওদিক দু-একবার পায়চারি করে, প্রশ্ন করল—

'গতকাল সকালে যে ভদ্রলোক চলে গেছেন তাকে মনে পড়ছে?'

'হাঁ সাহাব।'

'ভাল করে মনে করে দেখ তো—তার সঙ্গে জিনিসপত্তর কী কী ছিল।'

'একঠো বড়া সুটকেশ থা, কালা, আউর এক ছোটা ব্যাগ।'

'নীল রঙের ব্যাগ কি?'

'হাঁ সাহাব। হাম্ যব্ ফিলাস্‌কমে পানি লেকর্ কামরেমে আয়া, তব্ সাহাবকো দেখা উন্নে ছোট ব্যাগ খোলকর্ সব চিজ বাহার নিকালকে বিস্তার-পর রাখ্‌খা। মেরা মালুম হুয়া সাহাব কুছ্ ঢুঁড় রাহা।'

'ভেরি গুড। বাবুর সঙ্গে আপেল ছিল কি না মনে আছে?'

'হাঁ বাবু। তিন আপিল থা; বাহার নিকালকে পিলেটমে রাখ্‌খা।'

এর পরে বাবুর চেহারা কীরকম ছিল জিজ্ঞেস করাতে বয় যা বলল, সেরকম চেহারার লোক কলকাতায় অন্তত লাখখানেক আছে।

যাই হোক—গ্র্যান্ড হোটেলে এসে মস্ত কাজ হয়েছে। দীননাথবাবুর বাক্স যার সঙ্গে বদল হয়েছে তার নাম ঠিকানা দুটোই পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা মিস্টার দাশগুপ্ত একটা কাগজে লিখে রেখেছিলেন। যাবার সময় সেটা ফেলুদার হাতে দিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

G. C. Dhameeja,

'The Nook,'

Wild Flower Hall,

Simla.

'কাকা একটু বেরিয়েছেন। সাতটা নাগাত ফিরবেন।'

ইনিই তা হলে দীননাথবাবুর ভাইপো।

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনের দোকান থেকে মিঠে পান কিনে আমরা সোজা চলে এসেছি রডন স্ট্রিটে দীননাথবাবুর বাড়িতে। কারণটা হল আজকের ঘটনার রিপোর্ট দেওয়া। বাড়ির গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে পর পর চারটে গ্যারাজ, তার তিনটে খালি, আর একটাতে রয়েছে আরেকটা অদ্ভুত ধরনের পুরনো গাড়ি। ফেলুদা বলল ওটা নাকি ইটালিয়ান গাড়ি, নাম লাগন্ডা।

দারোয়ানের হাতে কার্ড দেবার এক মিনিটের মধ্যেই এই ইয়াং ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন। বয়স মনে হয় ত্রিশের নীচে, মাঝারি হাইট, দীননাথবাবুর মতোই ফরসা রং, উসকোখুস্কো চুলের পিছন দিক বেশ লম্বা, আর কানের দু'পাশে লম্বা ঝুলপি, যে রকম ঝুলপি আজকাল অনেকেই রাখছে। ভদ্রলোক একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন।

ফেলুদা বলল, 'আমরা একটু বসতে পারি কি? একটু দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে।'

'আসুন...'

ভদ্রলোক আমাদের ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। দেয়ালে আর মেঝেতে বাঘ ভাল্লুকের ছালের ছড়াছড়ি, সামনের দরজার ওপরে একটা প্রকাণ্ড বাইসনের মাথা। দীননাথবাবুর জ্যাঠামশাইও কি তা হলে শিকারি ছিলেন? হয়তো শিকারের সূত্রেই শম্ভুচরণের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব।

'কাকা বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোন। এইবার আসবেন।'

ভদ্রলোকের গলার স্বর একটু বেশি রকম পাতলা। একেই কি দীননাথবাবু ধর্মীজার বাক্সটা দিয়েছিলেন?

'আপনিই কি ফেলু মিত্তির—যিনি সোনার কেল্লার রহস্য সলভ্ করেছিলেন?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

ফেলুদা হ্যাঁ বলে বেশ মেজাজের সঙ্গে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটু পিছন দিকে হেলে আরাম করে বসল। আমার কেন জানি ভদ্রলোকের মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, যদিও কারণটা বুঝতে পারছিলাম না। শেষটায় ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? জিজ্ঞেস করলাম—

'আপনি কি কোনও ফিল্মে অ্যাকটিং করেছেন?'

ভদ্রলোক একটা গলা খাকরানি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। "অশরীরী"। থ্রিলার। ভিলেনের পার্ট করেছি। অবিশ্যি ছবিটা এখনও রিলিজ হয়নি।'

'কী নাম বলুন তো আপনার?'

'আসল নাম প্রবীর লাহিড়ী। ফিল্মের নাম অমরকুমার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—অমরকুমার—মনে পড়েছে।'

কোনও একটা ফিল্মের পত্রিকায় ভদ্রলোকের ছবি দেখেছি। এত পাতলা গলার স্বরে কীরকম ভিলেন হবে কে জানে।

'অ্যাকটিং কি আপনার পেশা?'

এবার প্রশ্নটা ফেলুদার। ভদ্রলোক চেয়ারে না বসে কেন যে দাঁড়িয়ে আছেন জানি না।

'কাকার প্লাস্টিকের কারখানায় বসতে হয়। কিন্তু আমার আসল ঝোঁক অ্যাকটিং-এর দিকে।'

'কাকা কী বলেন?'

'কাকার...উৎসাহ নেই।'

'কেন?'

'কাকা ওইরকমই।'

অমরকুমারের মুখ গোমড়া। বুঝলাম কাকার সঙ্গে ফিল্মের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

'একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করার আছে।' লোকটার মধ্যে একটা রাগি রাগি ভাব আছে বলেই ফেলুদা বোধহয় এত নরম করে কথা বলছে।

অমরকুমার বললেন, 'আপনার কথার জবাব দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাকার কনস্ট্যান্ট খোঁচানোটা...'

'আপনার কাকা আপনাকে একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ দিয়েছিলেন কি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা দেখছি কে যেন ঝেড়ে দিয়েছে। আমাদের একটা নতুন চাকর— '

ফেলুদা হেসে হাত তুলে প্রবীরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না, কোনও নতুন চাকর আপনার ব্যাগ ঝেড়ে দেয়নি। ওটা রয়েছে আমার কাছে।'

'আপনার কাছে?' প্রবীরবাবু অবাক।

'হ্যাঁ। আপনার কাকাই হঠাৎ ডিসাইড করেন ওটা যার ব্যাগ তাকে ফেরত দেওয়া উচিত। সে কাজের ভারটা আমাকে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, ওর ভেতর থেকে আপনি কোনও জিনিস বার করে নিয়েছেন কি?'

'ন্যাচারেলি। এই তো—'

প্রবীরবাবু পকেট থেকে একটা ডট পেন বার করে দেখালেন। তারপর বললেন, 'ব্লেড আর শেভিং ক্রিমটাও ইউজ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে তো চান্সই হল না।'

'কিন্তু বুঝতেই পারছেন প্রবীরবাবু, বাক্সটা ফেরত দিতে হলে সব জিনিসপত্তর সমেত ফেরত দিতে হবে তো—একেবারে ইনট্যাক্ট!'

'ন্যাচারেলি!'

প্রবীরবাবু ডট পেনটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে সেটা পকেটে পুরে নিল। কিন্তু কাকার উপরে প্রবীরবাবুর রাগটা এখনও পড়েনি। বললেন, 'জিনিসটা যখন দিয়েই দিয়েছিলেন তখন সেটা নেবার সময় একবার—'

প্রবীরবাবুর কথা শেষ হল না। দীননাথের গাড়ির গম্ভীর হর্নের আওয়াজ পাওয়া মাত্র ফিল্মের ভিলেন অমরকুমার সুড়সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'এহে—আপনারা এসে বসে আছেন?'

দীননাথবাবু ঘরে ঢুকে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন,

'বসুন বসুন—প্লিজ।...আপনাদের অসময়ে চা খেতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই। ওরে—কে আছিস—'

চাকরকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফায় বসে বললেন, 'বলুন, কী খবর।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ব্যাগ বদল হয়েছে আপেলওয়ালার সঙ্গে—নাম জি সি ধমীজা।'

দীননাথবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'আপনি এর মধ্যে এই একদিনেই নামটা বের করে ফেললেন? একি ম্যাজিক নাকি মশাই!'

ফেলুদা তার ছোট্ট একপেশে হাসিটা হেসে তার রিপোর্ট দিয়ে চলল, 'ভদ্রলোক থাকেন সিমলায়, ঠিকানাও জোগাড় হয়েছে। গ্র্যান্ড হোটেলে এসে ছিলেন, তিনদিন থাকার কথা ছিল, দুদিন থেকে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?' দীননাথবাবু যেন একটু হতাশভাবেই প্রশ্নটা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হোটেল থেকে চলে গেছেন, তবে সিমলা গেছেন কি না বলতে পারি না। সেটা অবিশ্যি ওঁর সিমলার ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করলেই জানতে পারবেন।'

দীননাথবাবু কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন। টেলিগ্রাম অবিশ্যি আমি আজই করছি, কিন্তু ধরুন জানতে পারলাম তিনি সিমলা ফিরেছেন এবং তাঁর কাছে আমার বাক্সটা রয়েছে—তা হলেই তো আর কাজটা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তাঁর ব্যাগটা তো তাঁকে ফেরত দিতে হবে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা তো বটেই। তা ছাড়া ওই ভ্রমণকাহিনীটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহলও রয়েছে, কাজেই আপনার বাক্সটাও ফেরত আনতে হবে।'

'ভেরি গুড। আমার প্রস্তাব হচ্ছে—আমি আপনাকে সব খরচ দিচ্ছি, আপনি চট করে সিমলাটা ঘুরে আসুন। আমি বলি কী, আপনার এই ভাইটিকেও নিয়ে যান। সিমলায় এ সময় বরফ—জানেন তো? হাতের কাছে বরফ দেখেছ কখনও খোকা?'

অন্য সময়ে হলে খোকা বলাতে আমার রাগই হত, কিন্তু সিমলায় যাবার চান্স আছে বুঝতে পেরে ওটা আর গায়েই করলাম না। আমার বুকের ভেতর ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফেলুদার পরের কথাটা শুনে কিন্তু আমার বেশ বিরক্তই লাগল। ও বলল, 'একটা জিনিস ভেবে দেখুন মিস্টার লাহিড়ী—আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে এখন যে-কোনও লোককেই সিমলা পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওঁর বাক্সটা ফেরত দিয়ে আপনারটা নিয়ে আসা—এ ছাড়া তো কোনও কাজ নেই! কাজেই—'

'না না না', লাহিড়ী মশাই বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। 'আপনার মতো রিলায়েবল লোক আর পাচ্ছি কোথায়? আর শুরুটা যখন আপনাকে দিয়ে হয়েছে, শেষটাও আপনিই করুন।'

'কেন, আপনার ভাইপো—'

দীননাথবাবু মুষড়ে পড়লেন। 'ওর কথা আর বলবেন না। ওর দায়িত্বজ্ঞানটা বড়ই কম। কোথায় যেন এক বাংলা সিনেমায় নাম লিখিয়ে অ্যাকটিং করে এসেছে। ভাবুন তো দিকি! ওর কোনও মতিস্থির নেই। না না—ও ভাইপো-টাইপো দিয়ে হবে না। আপনিই যান। আমার চেনা ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে—আপনাদের টিকিটপত্তর সব করে দেবে। দিল্লি পর্যন্ত প্লেন, তারপর ট্রেন। যান—গিয়ে কাজটা সেরে, দিন চারেক থেকে আরাম করে আসুন। আপনার মতো গুণী লোককে এই সুযোগটুকু দিতে পারলে আমারই আনন্দ। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যা করলেন—সত্যিই রিমার্কেবল্।'

চা এসে গিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কিছু খাবার জিনিসও। ফেলুদা এক টুকরো চকোলেট কেক তুলে নিয়ে বলল, 'একটা জিনিস দেখার ভারী কৌতূহল হচ্ছে। যে নেপালি বাক্সটার মধ্যে লেখাটা পেয়েছিলেন, সেই বাক্সটা। হাতের কাছে আছে কি?'

'সে তো খুব সহজ। আমি বলে দিচ্ছি।'

যে চাকর চা এনেছিল, সে-ই নেপালি বাক্সটা এনে দিল। এক হাত লম্বা, ইঞ্চি দশেক উঁচু প্রায়-চৌকো কাঠের বাক্সের গায়ে তামার পাত আর লাল-নীল-হলদে পাথরের কাজ করা। ডালাটা খুলতেই একটা গন্ধ পেলাম যেটা আজই আরেকবার পেয়েছি, এই কিছুক্ষণ

আগেই। নরেশ পাকড়াশীর আপিসঘরের ধুলো, পুরনো ফার্নিচার আর পুরনো পর্দার কাপড় মিলিয়ে ঠিক এই একই গন্ধ।

দীননাথবাবু বললেন, 'এই যে দুটো তাক দেখছেন, এর উপরটাতেই ছিল খাতাটা—একটা নেপালি কাগজের মোড়কের ভেতর।'

'বাক্স যে দেখছি জিনিসে ঠাসা', ফেলুদা মন্তব্য করল।

দীননাথবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছোটখাটো কিউরিও শপ বলতে পারেন। যা নোংরা, ঘেঁটে দেখার প্রবৃত্তি হয়নি আমার।'

ফেলুদা ওপরের তাকটা বাইরে বার করে ভিতরের জিনিসগুলো দেখছিল। পাথরের মালা, তামা ও পিতলের কাজ করা চাকতি, রোল করা তেলচিটে তাখো, কয়েকটা অচেনা ওষুধের খালি বোতল, দুটো মোমবাতি, একটা ছোট ঘণ্টা, একটা কীসের জানি হাড়, ছোট ছোট দু-তিনটে বাটি, কিছু শিকড় বাকল জাতীয় জিনিস, একটা শুকনো ফুল—সব মিলিয়ে সত্যিই একটা কিউরিওর দোকান।

ফেলুদা বলল, 'এ বাক্স আপনার জ্যাঠামশাইয়ের কি?'

'ওঁর সঙ্গেই তো এসেছিল, কাজেই...'

'কাঠমুণ্ডু থেকে কবে আসেন আপনার জ্যাঠামশাই?'

'টোয়েন্টিথ্রিতে। সে বছরই মারা যান। আমার বয়স তখন সাত।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং' বলে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা উঠে পড়ে বলল, 'আপনি যখন বলছেন তখন আমরা সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম। কাল হবে না, কারণ আমাদের দুজনেরই গরম কাপড় লন্ড্রি থেকে আনতে হবে। পরশু কালকা মেলে বেরোনো যেতে পারে। তবে আপনি ধমীজাকে কাল টেলিগ্রাম করতে ভুলবেন না।'

প্রায় সাড়ে আটটার সময় দীননাথবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি জটায়ু বসে আছেন, তাঁর হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট। আমাদের দেখেই একগাল হেসে বললেন, 'বায়স্কোপ দেখে ফিরলেন বুঝি?'

॥ ৪ ॥

জটায়ু হল স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী লেখক লালমোহন গাঙ্গুলীর ছদ্মনাম। সোনার কেল্লা অভিযানে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের দেখে হাসি পায়। লালমোহনবাবু হলেন সেই ধরনের লোক। হাইটে ফেলুদার কাঁধের কাছে, পায়ে পাঁচ নম্বরের জুতো, শরীরটা চিমড়ে হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে বাঁ হাত দিয়ে কোটের আস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে দেখেন, আবার পরমুহূর্তেই পাশের ঘর থেকে

আচমকা হাঁচির শব্দ শুনে আঁতকে ওঠেন।

'আপনার আর শ্রীমান তপেশের জন্য আমার লেটেস্ট বইটা নিয়ে এলুম।'

ভদ্রলোক প্যাকেটটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। সোনার কেল্লার ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক মাসে অন্তত তিনবার করে আমাদের বাড়িতে আসেন।

'এটা কোন্ দেশ নিয়ে লেখা?' ফেলুদা প্যাকেট খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল।

'এটা প্রায় গোটা ওয়ার্লডটা কভার করিচি। ফ্রম সুমাত্রা টু সুমেরু।'

'এবারে আর কোনও তথ্যের গণ্ডগোল নেই তো?' ফেলুদা বইটা উল্টেপাল্টে দেখে আমার হাতে দিয়ে দিল। এর আগে ওঁর 'সাহারায় শিহরণ' বইতে উটের জল খাওয়া নিয়ে একটা আজগুবি কথা লিখে বসেছিলেন লালমোহনবাবু, পরে ফেলুদা সেটা শুধরে দিয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'নো স্যার! আমাদের গড়পার রোডে বদন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে ফুল সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া রয়েছে। প্রত্যেকটি ফ্যাক্ট দেখে মিলিয়ে নিয়েছি।'

ফেলুদার 'ব্রিটানিয়া না দেখে ব্রিটানিকা দেখলে আরও নিশ্চিন্ত হতাম'—কথাটায় কান না দিয়ে লালমোহনবাবু বলে চললেন, 'একটা ক্লাইমেক্স আছে পড়ে দেখবেন—আমার হিরো প্রখর রুদ্রের সঙ্গে জলহস্তীর ফাইট।'

'জলহস্তী?'

'কীরকম থ্রিলিং ব্যাপার পড়ে দেখবেন।'

'কোথায় হচ্ছে ফাইটটা?'

'কেন, নর্থ পোলে! জলহস্তী বলচি না?'

'নর্থ পোলে জলহস্তী?'

'সে কী মশাই—ছবি দেখেননি? খ্যাংরা কাঠির মতো লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, দুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসা মুলোর মতো দাঁত, থ্যাপ থ্যাপ করে বরফের ওপর দিয়ে—'

'সে তো সিন্ধুঘোটক। যাকে ইংরিজিতে বলে ওয়লরাস। জলহস্তী

তো হিপোপটেমাস—আফ্রিকার জন্তু।'

জটায়ুর জিভ লজ্জায় লাল হয়ে দু' ইঞ্চি বেরিয়ে এল।

'এঃ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। ব্যাড মিসটেক। ঘোড়া আর হাতিতে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জল আর সিন্ধু তো প্রায় একই জিনিস হল কিনা! ইংরিজিটা কারেক্ট জানা ছিল, জানেন। এবার থেকে গল্পগুলো ছাপার আগে একবার আপনাকে দেখিয়ে নেব।'

'আমি আসছি' বলে ফেলুদা তার ঘরে চলে যাবার পর আমাকে একা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার দাদাকে একটু গম্ভীর দেখছি। কোনও কেস-টেস এসেছে নাকি?'

আমি বললাম, 'সেরকম কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সিমলা যেতে হচ্ছে।'

'সিমলা? কবে?'

'বোধ হয় পরশু।'

'লং টুর?'

'না। দিন চারেক।'

'ইস, ওদিকটা দেখা হয়নি' বলে ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ফেলুদা ফিরে এলে পর ভদ্রলোক আবার নড়েচড়ে বসলেন। 'আপনারা সিমলা যাচ্ছেন শুনলাম। কোনও তদন্ত আছে নাকি?'

'ঠিক তদন্ত নয়। রাম-শ্যামের বাক্স অদল-বদল হয়ে গেছে। শ্যামের বাক্স রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে ফেরত দিয়ে, শ্যামের কাছ থেকে রামের বাক্স নিয়ে রামকে ফেরত দিতে হবে।'

'আরেব্বাস রে—বাক্স-রহস্য?'

'রহস্য কি না এখনও বলতে পারি না, তবে সামান্য দু-একটা খটকার ব্যাপার—'

'দেখুন স্যার', জটায়ু বাধা দিয়ে বললেন, 'এই ক'মাসে আপনাকে আমি খুব থরোলি চিনেছি। আমার ধারণা, একটা কিছু ইয়ে না থাকলে আপনি কক্ষনও কেসটা নিতেন না। ঠিক করে বলুন তো ব্যাপারটা কী।'

ফেলুদার কথায় বুঝলাম সে এই স্টেজে লালমোহনবাবুকে তেমন

খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছে না। বলল, 'কে সত্যি কথা বলছে, আর কে সত্য গোপন করছে, আর কে মিথ্যে বলছে—এগুলো পরিষ্কার না-জানা অবধি কিছু খুলে বলা সম্ভব নয়। তবে গণ্ডগোল যে একটা রয়েছে সেটা—'

'ব্যাস ব্যাস—এনাফ!' জটায়ুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে। 'তা হলে বলুন—আপনার অনুমতি পেলেই আপনাদের সঙ্গে লটকে পড়ি।'

'ঠাণ্ডা সয় ধাতে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'ঠাণ্ডা? দার্জিলিং গেছি লাস্ট ইয়ারে।'

'কোন মাসে?'

'মে।'

'সিমলায় এখন বরফ পড়ছে।'

জটায়ু উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'বলেন কী, বর—ফ? গতবার ডেজার্ট আর এবার স্নো? ফ্রম দি ফ্রাইং প্যান টু দি ফ্রিজিডেয়ার? এ তো ভাবাই যাচ্ছে না মশাই।'

'মোটা খরচের ধাক্কা কিন্তু।'

ফেলুদা যদিও এসব কথা বলে জটায়ুকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছিল, ভদ্রলোক সহজে দমবার পাত্র নন। খ্যাক খ্যাক করে ভিলেনের মতো একটা হাসি হেসে বললেন, 'খরচের ভয় কী দেখাচ্ছেন মশাই—একুশখানা রোমাঞ্চ উপন্যাস, প্রত্যেকটা কমপক্ষে পাঁচটা করে এডিশন, তিনখানা বাড়ি হয়ে গেছে কলকেতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে। এসব ব্যাপারে খরচকে কেয়ার করি না মশাই। যত দেখব, তত প্লট আসবে মাথায়, তত বইয়ের সংখ্যা বাড়বে। আর সবাই তো ফেলু মিত্তির নয় যে জলহস্তী আর সিন্ধুঘোটকের তফাত ধরবে। যা লিখব তাই গিলবে, আর যত গিলবে ততই আমার লাভ। আমার লাভের রাস্তা আটকায় এমন কার সাধ্যি আছে মশাই? অবিশ্যি আপনি যদি সোজাসুজি নিষেধ করেন, তা হলে অবিশ্যি...'

ফেলুদা নিষেধ করল না। লালমোহনবাবু যাবার আগে আমরা কবে যাচ্ছি, ক'দিনের জন্য যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি জেনে

নিয়ে একটা খাতায় নোট করে নিয়ে বললেন, 'একটা গরম গেঞ্জি, দুটো পুলোভার, একটা তুলোর কোট আর তার ওপর একটা ওভার কোট চাপালে শীত মানবে না বলছেন, অ্যাঁ?'

ফেলুদা বলল, 'তার সঙ্গে এক জোড়া দস্তানা, একটা মাঙ্কি ক্যাপ, এক জোড়া গোলোস জুতো, গরম মোজা আর ফ্রস্ট-বাইটের ওষুধ নিলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।'

ইস্কুলে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভাল লাগে না, কিন্তু ফেলুদার কাছে যে পরীক্ষাটা দিতে হয় তাতে আমার কোনওই আপত্তি নেই। সত্যি বলতে কী, তার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে, আর সেই মজার সঙ্গে মাথাটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদা তার খাটে উপুড় হয়ে বুকে বালিশ নিয়ে শুয়েছে, আর আমি তার পাশে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। অর্থাৎ, এই নতুন কেসটার বিষয়ে ওর নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রথম প্রশ্ন হল—'এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।'

'প্রথম দীননাথ লাহিড়ী।'

'বেশ। লোকটাকে কেমন মনে হয়?'

'ভালই তো। তবে বই-টই সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখে না। আর, এই যে এতগুলো টাকা খরচ করে আমাদের সিমলা পাঠাচ্ছেন, এই ব্যাপারে যেন একটু খটকা...'

'যে লোকটা দু' দুটো ওরকম ডাকসাইটে গাড়ি মেনটেন করতে পারে, তার আর যাই হোক, টাকার অভাব নেই। তা ছাড়া ফেলু মিত্তিরকে এমপ্লয় করা তো একটা প্রেসটিজের ব্যাপার—সেটা ভুললেও তো চলবে না।'

'তাই যদি হয় তা হলে আর খটকার কিছু নেই। দ্বিতীয় আলাপ—নরেশচন্দ্র পাকড়াশী। তিরিক্ষি মেজাজ।'

'কিন্তু স্পষ্টবক্তা। সেটা একটা গুণ। সকলের থাকে না।'

'কিন্তু সব কথা সত্যি বলেন কি? দীননাথবাবু কি সত্যিই

এককালে লায়েক ছিলেন? মানে, রেসের মাঠে-টাঠে যেতেন?'

'এক কালে কেন, এখনও আছেন। তবে তার মানেই যে লোকটা খারাপ, এমন কোনও কথা নেই।'

'তারপর অমরকুমার। মানে প্রবীর লাহিড়ী। কাকাকে পছন্দ করেন না।'

'স্বাভাবিক। কাকা তার অ্যাম্বিশনে বাধা দিচ্ছে, তাকে একটা বাক্স দিয়ে আবার নিয়ে নিচ্ছে, রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।'

'প্রবীরবাবুর শরীরটা বেশ মজবুত বলে মনে হল।'

'হ্যাঁ। হাতের কব্জি চওড়া। তাই গলার আওয়াজটা আরও বেমানান লাগে।...এবার বল কালকা মেলের ফার্স্ট ক্লাসের ডি কম্পার্টমেন্টের বাকি দু'জন যাত্রীর কী নাম।'

'একজন হল বৃজমোহন। পদবি...পদবি...'

'কেদিয়া। মাড়োয়ারি।'

'হ্যাঁ। সুদের ব্যবসা। সাধারণ চেহারা। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে আগেই চেনা।'

'ভদ্রলোকের লেনিন সরণিতে সত্যিই আপিস আছে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নাম দেখেছি।'

'অন্যজন জি সি ধমীজা। সিমলায় থাকে। আপেলের চাষ আছে।'

'সেটার কোনও প্রমাণ নেই; সুতরাং বলা যেতে পারে যে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।'

'কিন্তু ধমীজার সঙ্গেই যে দীননাথবাবুর বাক্সটা বদল হয়ে গেছে সেটা তো ঠিক?

বাক্সটা ফেলুদার পাশেই খাটের ওপর রাখা ছিল। সেটার ঢাকনা খুলে ভিতরের জিনিসপত্তরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা প্রায় বিড় বিড় করে বলল, 'হুঁ...ওই একমাত্র ব্যাপার যেটা সম্বন্ধে বোধ হয়...'

বাক্সের ভিতরে যে ভাঁজ করা দুটো দিল্লির খবরের কাগজ ছিল, সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ফেলুদা ঠিক সেই ভাবেই বিড় বিড় করে বলল, 'এই কাগজগুলো নিয়েই, বুঝেচিস, কী রকম যেন...মনের মধ্যে একটা...'

ফেলুদার বিড়বিড়োনি থামাতে হল, কারণ টেলিফোন বেজে উঠেছে। আগে টেলিফোনটা বৈঠকখানায় থাকত। এখনও থাকে, কিন্তু ফেলুদা সুবিধের জন্য একটা এক্সটেনশন টেলিফোন নিজের খাটের পাশে বসিয়ে নিয়েছে।

'হ্যালো—'

'কে—মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদার হাতে টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও, রাত্তির বলেই বোধ হয় অন্য দিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

'বলুন মিস্টার লাহিড়ী—'

'শুনুন, মিস্টার ধমীজার কাছ থেকে একটা খবর আছে।'

'এর মধ্যেই টেলিগ্রামের—?'

'না না। টেলিগ্রাম নয়। টেলিগ্রামের উত্তর কালকের আগে আসবে না। একটা টেলিফোন পেয়েছি এই মিনিট পাঁচেক আগে। ব্যাপারটা বলছি। ধমীজা নাকি রেলওয়ে আপিসে খোঁজ নিয়ে রিজার্ভেশন লিস্ট দেখে আমার নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল। হঠাৎ চলে যেতে হয় বলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, কিন্তু ওঁর এক চেনা লোকের কাছে আমার বাক্সটা রেখে গেছেন। তার কাছে ধমীজার বাক্সটা নিয়ে গিয়ে ফেরত দিলেই উনি আমার বাক্সটা দিয়ে দেবেন। এই লোকটিই আমাকে ফোন করেছিল। অতএব, বুঝতেই পারছেন।...'

'ম্যানুস্ক্রিপ্টটা রয়েছে কি না জিজ্ঞেস করেছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।'

'বাঃ, এ তো ভাল খবর। আপনার সমস্ত ল্যাঠা চুকে গেল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব অপ্রত্যাশিতভাবে। আমি মিনিট পাঁচেকে বেরিয়ে পড়ছি। আপনার বাড়ি থেকে ধমীজার বাক্সটা পিকআপ করে নিয়ে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে চলে যাব।'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি মিস্টার লাহিড়ী?'

'বলুন।'

'আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কেন? সিমলাই যখন যাচ্ছিলাম, তখন প্রিটোরিয়া স্ট্রিটেই বা যেতে অসুবিধে কী? আমি বলি কী,

বাক্সটা আমিই নিয়ে আসি। ওটা আজকের রাতটা আমার কাছে থাক; আমি একবার শম্ভুচরণের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিই। এটাই হবে আমার পারিশ্রমিক। কাল সকালে গিয়ে লেখা সমেত বাক্স আপনাকে ফেরত দিয়ে আসব, কেমন?'

'ভেরি গুড। আমার তাতে কোনওই আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার পুরি, ঠিকানা ফোর বাই টু প্রিটোরিয়া স্ট্রিট।'

'ধন্যবাদ!—অলসস্ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল!'

ফেলুদা টেলিফোন রেখে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইল। আমার যে কী মনের অবস্থা তা আর বলে লাভ কী? সিমলা যাওয়া ফসকে গেল, ফসকে গেল, ফসকে গেল—মাথার মধ্যে এই কথাটাই খালি বার বার ঘুরছে, আর বুকের ভিতরটা কীরকম খালি খালি লাগছে, আর বরফের দেশে যেতে যেতে যাওয়া হল না বলে মার্চ মাসের কলকাতাটা অসহ্য গরম লাগছে। কী আর করি? অন্তত এই শেষ ঘটনার সময় ফেলুদার সঙ্গে থাকা উচিত। তাই বললাম, 'আমি তৈরি হয়ে নিই ফেলুদা? দু' মিনিট লাগবে।'

'যা, চট করে যা।'

জামা ছেড়ে তৈরি হয়ে মিস্টার ধমীজার ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিটের কিছু বেশি। প্রিটোরিয়া স্ট্রিটটা লোয়ার সারকুলার রোড থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়ে রাইট অ্যাঙ্গেলে ডাইনে গিয়ে আবার রাইট অ্যাঙ্গেলে বাঁয়ে ঘুরে থিয়েটার রোডে—থুড়ি, শেক্সপিয়ার সরণিতে গিয়ে পড়েছে। এমনিতেই রাস্তাটা নির্জন, রাতও হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারোটা, তার উপরে আজ বোধ হয় অমাবস্যা-টমাবস্যা হবে। আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে ঢুকে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা ট্যাক্সি চালিয়ে বুঝলাম গাড়ি থেকে বাড়ির নম্বর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শেক্সপিয়র সরণির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলুদা পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে বলল, 'নম্বরটা খুঁজে বার করতে হবে সর্দারজি—আপনি একটু দাঁড়ান; এই বাক্সটা একটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

সর্দারজি বেশ অমায়িক লোক, কোনও আপত্তি করল না। আমরা

রাস্তায় নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাঁ দিকে পাঁচিলের ওপাশে বাইশতলা বিড়লা বিল্ডিং বুক চিতিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। ফেলুদা বলে, রাত্তির বেলা কলকাতার সবচেয়ে থমথমে জিনিস হচ্ছে এই আকাশ-ছোঁয়া আপিসের বিল্ডিংগুলো। কেবল ধড় আছে, প্রাণ নেই। 'দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেছিস কখনও? ওই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে তাই।'

খানিক দূর হাঁটার পর রাস্তার ডান দিকে একটা গেট পড়ল যার গায়ে লেখা আছে চার। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি পরের বাড়ির নম্বর পাঁচ। তা হলে দুই বাড়ির মধ্যে যে গলিটা রয়েছে তাতেই হবে চারের দুই। কী নিঝুম রাস্তা রে বাবা। টিমটিম করে দু' একটা আলো জ্বলছে, সে আলো শুধু ল্যাম্প পোস্টের তলাটুকু আলো করেছে, বাকি রাস্তা অন্ধকার থেকে গেছে। আমরা গলিটা ধরে এগোতে লাগলাম।

খানিকটা গিয়েই আরেকটা গেট চোখে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই চারের এক। চারের দুই কি তা হলে আরও ভেতরে ওই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে? ওদিকে তো কোনও বাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে না। আর থাকলেও, সে বাড়িতে যে একটাও আলো জ্বলছে না তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গলির দুদিকে পাঁচিল; পাঁচিলের পিছনে বাড়ির বাগান থেকে গাছের ডালপালা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। একটা ক্ষীণ গাড়ি চলাচলের শব্দ বোধ হয় লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে আসছে। একটা গির্জায় ঘড়ি বেজে উঠল দূর থেকে। সেন্ট পলসের ঘড়ি। সাড়ে এগারোটা বাজল। কিন্তু এসব শব্দে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের অস্বাভাবিক থমথমে ভাব বাড়ছে বই কমছে না। কাছাকাছি কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—

'ট্যাক্সি! সর্দারজি! সর্দারজি!'

চিৎকারটা আপনা থেকেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

একটা লোক ডান দিকের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে ফেলুদার ওপর পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। ফেলুদার হাতের বাক্সটা আর হাতে নেই। সে হাত খালি করে এক ঝটকায় ঘাড় থেকে প্রথম লোকটাকে

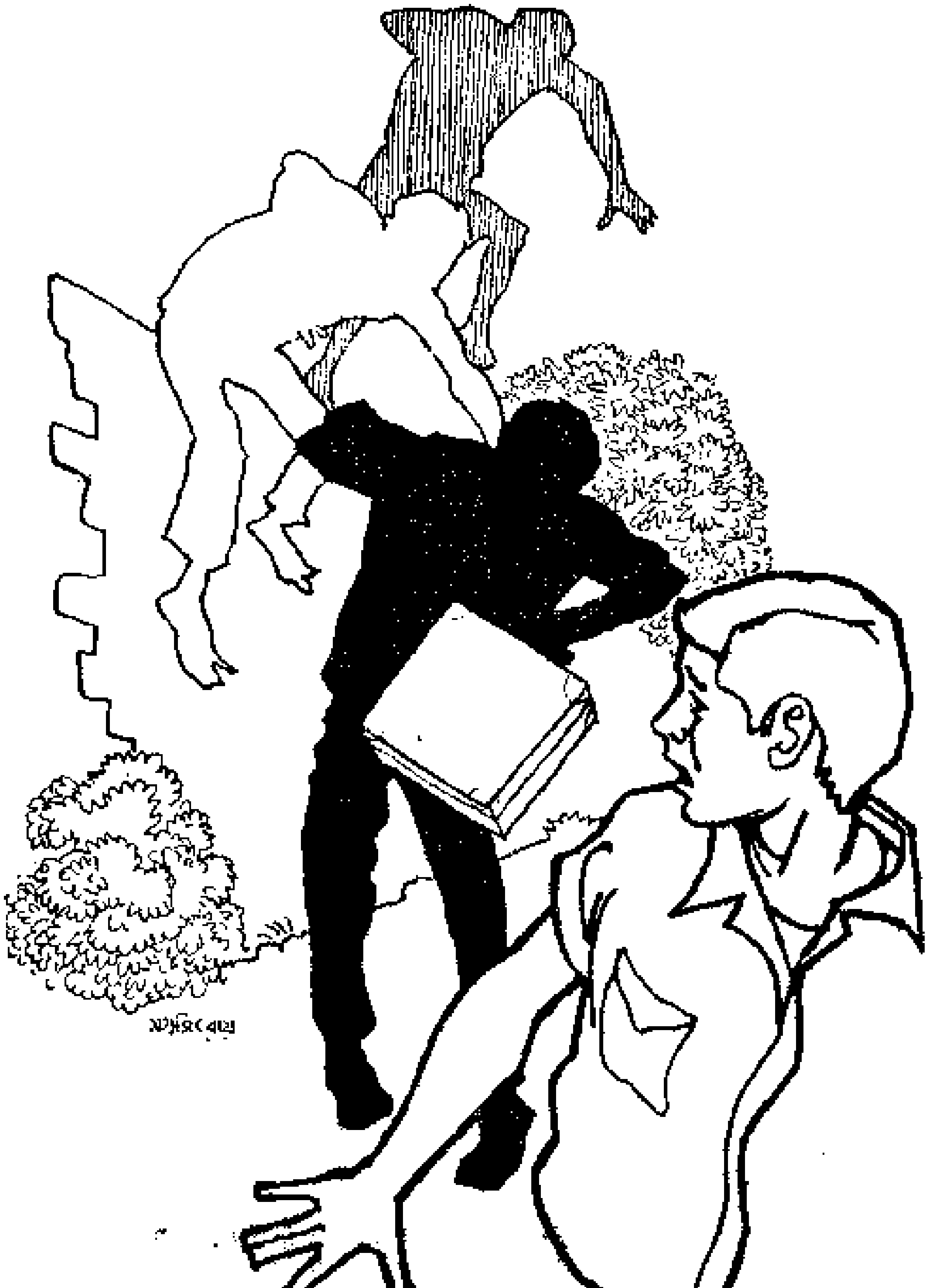

ফেলে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এটা বুঝতে পারছি একটা প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি হাতাহাতি চলেছে, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক কী যে হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই। বাক্সটা চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে আছে। আমি সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছি, আর ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় লোকটা মুহূর্তের মধ্যে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে এক ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গলির মুখটার দিকে দৌড় দিল। এদিকে বাঁ পাশে অন্ধকারে হুটোপাটি চলেছে, কিন্তু লোকটাকে ফেলুদা কেন যে ঠিক কবজা করতে পারছে না সেটা বুঝতে পারছি না।

'ওঁক!'

এটা আমাদের পাঞ্জাবি ড্রাইভারের পেটে-গুঁতো-খাওয়া গলার শব্দ। সে আমার চিৎকার শুনে গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গলির মুখটায় এসেছিল, কিন্তু ব্যাগ-চোর তাকে ঘায়েল করে পালিয়েছে। দূরে আবছা ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দেখছি সর্দারজি ধরাশায়ী।

ইতিমধ্যে প্রথম লোকটাও পাঁচিল টপকে উধাও। ফেলুদা পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'অন্তত সের খানেক সরষের তেল মেখে এসেছিল—পাড়াগাঁয়ে সিঁদেল চোর যেরকম করে।'

এই তেলের গন্ধটা অবিশ্যি লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম, কিন্তু গন্ধের কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

'ভাগ্যিস!'

ফেলুদা এই কথাটা যে কেন বলল, তা বুঝতে পারলাম না। এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও সে বলছে—ভাগ্যিস?

আমি বললাম, 'তার মানে?'

ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা বলল, 'তুই কি ভাবছিস জি সি ধমীজার বাক্স চুরি করে নিয়ে গেল ওই শয়তানগুলো?'

'তবে?'—আমি তো অবাক!

'যেটা গেল সেটা ছিল দ্য প্রপার্টি অফ প্রদোষ সি মিটার। ওর মধ্যে তিনখানা ছেঁড়া গেঞ্জি, পাঁচখানা ধুধধুড়ে রুমাল, গুচ্ছের ন্যাকড়া আর খান পাঁচেক পুরনো ছেঁড়া আনন্দবাজার। তুই যখন

জামা বদলাচ্ছিলি তখন ওয়ান-নাইন-সেভেনে টেলিফোন করে জেনেছি যে চারের দুই প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের কোনও টেলিফোন নেই। অবিশ্যি ওই নম্বরে যে কোনও বাড়িই নেই সেটা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না।'

আমার বুকে আবার ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

মন বলছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সিমলাটা যেতেই হবে।

॥ ৫ ॥

কাল রাত্রে বাড়ি ফিরেই দীননাথবাবুকে ঘটনাটা টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো শুনে একেবারে থ। বললেন, 'এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এক যদি হয় যে এমনি ছ্যাঁচড়া চোর, ব্যাগটায় কিছু আছে মনে করে আপনাকে আক্রমণ করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে—যেমন কলকাতায় প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তাও তো একটা ব্যাপার রয়েই যাচ্ছে— চারের দুই বলে তো কোনও বাড়িই নেই প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে। অর্থাৎ মিস্টার পুরি ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অর্থাৎ মিস্টার ধমীজার রেলওয়েতে খোঁজ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। টেলিফোনটা তা হলে করল কে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা জানতে পারলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত মিস্টার লাহিড়ী।'

'কিন্তু আপনারই বা সন্দেহটা হল কী করে বলুন তো?'

'আসল খটকা লাগল লোকটার এত রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করা থেকে। ধমীজা গেছেন কালকে। তা হলে পুরি কাল কিংবা আজ দিনের বেলা ফোন করল না কেন?'

'হুঁ!...তা হলে তো সেই সিমলা যাবার প্ল্যানটাই রাখতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা যে দিকে টার্ন নিচ্ছে, তাতে তো আপনাকে পাঠাতে আমার ভয়ই করছে।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না মিস্টার লাহিড়ী। কেসটাকে এখন আর নিরামিষ বলা চলে না—বেশ পেঁয়াজ রসুনের

গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে আমিও এখন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছি। নইলে আপনার টাকাগুলো নিতে রীতিমতো লজ্জা করত। যাই হোক, আপনি এখন একটা কাজ করতে পারলে ভাল হয়।'

'বলুন।'

'আপনার বাক্সে কী কী জিনিস ছিল সেটার একটা ফর্দ করে যদি আমায় পাঠিয়ে দেন তা হলে বাক্স ফেরত নেবার সময় মিলিয়ে নিতে সুবিধে হবে।'

'কিছুই বিশেষ ছিল না, কাজেই কাজটা খুবই সহজ। যখন আপনাদের যাবার টিকিট ইত্যাদি পাঠাব, তার সঙ্গেই লিস্টটাও দিয়ে দেব।'

কাল চলে যাচ্ছি বলে আজ সারাটা দিন ফেলুদাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হল। এই একদিনেই ওর হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। ওর মনটা যে অস্থির হয়ে আছে, সেটা ওর ঘন ঘন আঙুল মটকানো থেকেই বুঝতে পারছি। আরও বুঝতে পারছি এই যে, যে বাক্সের মধ্যে দামি কিছু নেই, তার পিছনে শয়তানের দৃষ্টি কেন যাবে—এই রহস্যের কিনারা আমারই মতো ও-ও এখনও করে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় কাল ও আবার বাক্স থেকে প্রত্যেকটা জিনিস বার করে খুঁটিয়ে দেখেছে। এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং ক্রিমের টিউব টিপে টিপে দেখেছে, ব্লেডগুলো খাপ থেকে বার করে দেখেছে, খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে দেখেছে। এত করেও সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি।

ফেলুদা বেরিয়ে গেল আটটার মধ্যে। কী আর করি—কোনও রকমে কয়েক ঘণ্টা একা বাড়িতে বসে কাটানোর জন্য মনটা তৈরি করে নিলাম। বাবা ম্যাসানজোর গেছেন দিন পনেরোর জন্য। ওঁকে একটা চিঠি লিখে সিমলা যাবার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। ফেলুদা যাবার সময় বলে গেছে, 'তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ কলিং বেল টেপে তা হলে তুই নিজে দরজা খুলবি না, শ্রীনাথকে বলবি। আমি এগারোটার মধ্যে ফিরে আসব।'

বাবাকে চিঠি লিখে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে বৈঠকখানার সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে বাক্সের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে

সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমেই আরও ধোঁয়াটে হয়ে আসতে লাগল। দীননাথবাবু, তাঁর সেই ফিল্মে অ্যাকটিং করা ভাইপো, খিটখিটে নরেশ পাকড়াশী, আপেলওয়ালা, সিমলাবাসী মিস্টার ধমীজা, সুদের কারবারি বৃজমোহন, সবাই—যেন মনে হল মুখোশ পরা মানুষ। এমন কী, এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স আর তার ভিতরের প্রত্যেকটা জিনিসও যেন মুখোশ পরে বসে আছে। আর তার ওপরে কাল রাত্রে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা...

শেষটায় ভাবা বন্ধ করে তাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলাম। সিনেমা পত্রিকা—নাম 'তারাবাজি'। এই তো সেই পত্রিকা—যাতে অমরকুমারের ছবি দেখেছিলাম। এই তো—'শ্রীগুরু পিকচার্সের নির্মীয়মাণ "অশরীরী" ছায়াচিত্রে নবাগত অমরকুমার।' মাথায় দেব আনন্দের জুয়েল থিফের ধাঁচের টুপি, গলায় মাফলার, সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণে যাকে বলে ক্রূর হাসি। হাতে আবার একটা রিভলবার—সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ফাঁকি। নিশ্চয়ই কাঠের তৈরি।

হঠাৎ কী মনে হল, টেলিফোন ডিরেক্টরিটা খুলে একটা নাম বার করলাম। শ্রীগুরু পিকচার্স। তিপ্পান্ন নম্বর বেনটিঙ্ক স্ট্রিট। টু ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর।

নম্বর ডায়াল করলাম। ওদিকে রিং হচ্ছে। এইবার টেলিফোন তুলল।

'হ্যালো—'

'শ্রীগুরু পিকচার্স?'

আমার গলাটা মাস ছয়েক হল ভেঙে মোটার দিকে যেতে শুরু করেছে, তাই আমার বয়স যে মাত্র সাড়ে পনেরো, সেটা নিশ্চয়ই এরা বুঝতে পারবে না।

'হ্যাঁ, শ্রীগুরু পিকচার্স।'

'আপনাদের অশরীরী ছবিতে যে নবাগত অমরকুমার কাজ করছেন, তাঁর সম্বন্ধে একটু—'

'আপনি মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন।'

লাইনটা বোধ হয় মিস্টার মল্লিককে দেওয়া হল।

'হ্যালো।'

'মিস্টার মল্লিক?'

'কথা বলছি।'

'আপনাদের একটা ছবিতে অমরকুমার বলে একজন নবাগত অ্যাকটিং করছেন কি?'

'তিনি তো বাদ হয়ে গেছেন—'

'বাদ হয়ে গেছেন?'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আমি—' কী নাম বলব কিছু ভেবে না পেয়ে বোকার মতো খট করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম। অমরকুমার বাদ হয়ে গেছে! নিশ্চয়ই ওর গলার আওয়াজের জন্য। কাগজে ছবি-টবি বেরিয়ে যাবার পরে বাদ। অথচ ভদ্রলোক কি সে-খবরটা জানেন না? নাকি জেনেও আমাদের কাছে বেমালুম চেপে গেলেন?

বসে বসে এই সব ভাবছি এমন সময় টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠে আমাকে বেশ খানিকটা চমকে দিল। আমি হন্তদন্ত রিসিভারটা তুলে হ্যালো বলার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তারপর একটা খট করে শব্দ পেলাম। বুঝেছি। পাবলিক টেলিফোন থেকে কলটা আসছে। আমি আবার বললাম, 'হ্যালো।' এবারে কথা এল—চাপা কিন্তু স্পষ্ট।

'সিমলা যাওয়া হচ্ছে?'

একটা অচেনা গলায় হঠাৎ কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে এটা ভাবতেই পারিনি। তাই আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঢোক গিলে চুপ করে রইলাম।

আবার কথা এল। খসখসে গলায় রক্ত-জল-করা-কথা—

'গেলে বিপদ। বুঝেছ? বিপদ।'

আবার খট্। এবার টেলিফোন রেখে দেওয়া হল। আর কথা শুনব না। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার হয়ে গেছে। সেই নেশাখোর রাণার হাতে বাঘ-মারা বন্দুক যেভাবে কাঁপত, ঠিক সেইভাবে কাঁপা হাতে আমি টেলিফোনটা রেখে দিয়ে চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই আবার ক্রিং শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল, কিন্তু তার পরেই বুঝলাম এটা টেলিফোন নয়, কলিং বেল। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে দেখে নিজেই দরজা খুলতে ফেলুদা ঢুকল। তার হাতে পেল্লায় প্যাকেটটা দেখে বুঝলাম লন্ড্রি থেকে আনা আমাদের দুজনের গরম কাপড়। ফেলুদা আমার দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'ঠোঁট চাটছিস কেন? কোনও গোলমেলে টেলিফোন এসেছিল নাকি?'

আমি তো অবাক। 'কী করে বুঝলে?'

'রিসিভারটা যেভাবে রেখেছিস তাতেই বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া জটপাকানো কেস—ও রকম দু-একটা টেলিফোন না এলেই ভাবনার কারণ হত। কে করেছিল? কী বলল?'

'কে করেছিল জানি না। বলল, সিমলা গেলে বিপদ আছে।'

ফেলুদা পাখাটা ফুল স্পিডে করে তক্তপোশের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই কী বললি?'

'কিচ্ছু না।'

'ইডিয়ট। তোর বলা উচিত ছিল যে আজকাল কলকাতার রাস্তাঘাটে চলতে গেলে যে বিপদ, তেমন বিপদ এক যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও নেই—সিমলা তো কোন ছার।'

ফেলুদা হুমকিটা এমনভাবে উড়িয়ে দিল যে আমিও আর ও বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করে বললাম, 'লন্ড্রি ছাড়া আর কোথায় গেলে?'

'এস এম কেদিয়ার আপিসে।'

'কিছু জানতে পারলে?'

'বৃজমোহন বাইরে মাইডিয়ার লোক। পরিষ্কার বাংলা বলে, তিন পুরুষ কলকাতায় আছে। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে সত্যিই ওর লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। মনে হল পাকড়াশী এখনও কিছু টাকা ধারে। ধমীজার আপেল বৃজমোহনও খেয়েছিল। নীল এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ ওর নেই। ট্রেনে বেশির ভাগ সময়টাই হয় ঘুমিয়ে না হয় চোখ বুজে শুয়ে কাটিয়েছে।'

আমার দিক থেকেও একটা খবর দেবার ছিল—তাই

অমরকুমারের বাদ হয়ে যাওয়ার কথাটা ওকে বললাম। তাতে ফেলুদা বলল, 'তা হলে মনে হয় ছেলেটা হয়তো সত্যিই ভাল অভিনয় করে।'

সারাদিন আমরা আমাদের গোছগাছটা সেরে ফেললাম। কাল আর সময় পাব না কারণ ভোর সাড়ে চারটায় উঠতে হবে। মাত্র চারদিনের জন্য যাচ্ছি বলে খুব বেশি জামাকাপড় নিলাম না। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় জটায়ু অর্থাৎ লালমোহনবাবুর কাছ থেকে একটা টেলিফোন এল। বললেন, 'একটা নতুন রকমের অস্ত্র নিয়েছি—দিল্লি গিয়ে দেখাব।' লালমোহনবাবুর আবার অস্ত্রশস্ত্র জমানোর শখ। রাজস্থানে একটা ভুজালি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন—যদিও সেটা কাজে লাগেনি। ভদ্রলোকের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, বললেন, 'কাল সকালে সেই দমদমে দেখা হবে।'

রাত আটটার কিছু পরে দীননাথবাবুর ড্রাইভার এসে আমাদের দিল্লির প্লেন ও সিমলার ট্রেনের টিকিট, আর দীননাথবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটায় লেখা আছে—

প্রিয় মিস্টার মিত্তির,

দিল্লিতে জনপথ হোটেলে একদিন ও সিমলায় ক্লার্কস হোটেলে চার দিনের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। আপনার কথা মতো সিমলাতে মিঃ ধমীজার নামে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম, এইমাত্র তার জবাব এসেছে। তিনি জানিয়েছেন আমার বাক্স তাঁর কাছে সযত্নে রাখা আছে। তিনি পরশু বিকালে চারটার সময় আপনাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছেন। ঠিকানা আপনার কাছে আছে, তাই আর দিলাম না। আপনি আমার বাক্সের জিনিসপত্রের একটা তালিকা চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি যে ওতে একটিমাত্র জিনিসই ছিল যেটা আমার কাছে কিছুটা মূল্যবান। সেটি হল বিলাতে তৈরি এক শিশি এনটারোভয়োফর্ম ট্যাবলেট। দিশির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। আপনাদের যাত্রা নিরাপদ ও সফল হোক এই প্রার্থনা করি। ইতি ভবদীয়—

দীননাথ লাহিড়ী

কাল খুব ভোরে উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু পৌনে দশটায় আমাদের দরজায় কে যেন বেল টিপল। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, তিনি যে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে আসবেন সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা ভিতরে ভিতরে অবাক হলেও, বাইরে একটুও সেরকম ভাব না দেখিয়ে বলল, 'গুড ইভনিং মিস্টার পাকড়াশী—আসুন ভেতরে।'

ভদ্রলোকের খিটখিটে ভাবটা তো আর নেই দেখছি। ঠোঁটের কোণে একটা অপ্রস্তুত হাসি, একটা কিন্তু কিন্তু ভাব, একদিনের মধ্যেই একেবারে আশ্চর্য পরিবর্তন। এত রাত্রে কী বলতে এসেছেন উনি?

নরেশবাবু কৌচের বদলে চেয়ারটাতে বসে বললেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে—ফোন করেছিলাম বার পাঁচেক—কানেকশন হচ্ছিল না—তাই ভাবলাম চলেই আসি। অপরাধ নেবেন না—'

'মোটেই না। কী ব্যাপার বলুন।'

'একটা অনুরোধ—একটা বিশেষ রকম অনুরোধ—বলতে পারেন একটা বেয়াড়া অনুরোধ নিয়ে এসেছি আমি।'

'বলুন—'

'দীননাথের বাক্সে যে লেখাটার কথা বলছিলেন, সেটা কি তেরাই-রচয়িতা শম্ভুচরণের কোনও রচনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী।'

'মাই গড!'

ফেলুদা চুপ। নরেশ পাকড়াশীও কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ। দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। তারপর মুখ খুললেন—

'আপনি জানেন কি যে ভ্রমণ-কাহিনীর বই আমার সংগ্রহে যত আছে তেমন আর কলকাতায় কারুর কাছে নেই?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা বিশ্বাস করা কঠিন নয়। আপনার বইয়ের আলমারির দিকে যে আমার দৃষ্টি যায়নি তা নয়। সোনার জলে লেখা কতকগুলো নামও চোখে পড়েছে—স্বেন হেদিন, ইবন বাতুতা,

তাভেরনিয়ে, হুকার...'

'আশ্চর্য দৃষ্টি তো আপনার।'

'ওইটেই তো ভরসা।'

নরেশবাবু তাঁর বাঁকানো পাইপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সিমলা যাচ্ছেন তো?'

এবার ফেলুদার অবাক হবার পালা। 'কী করে জানলেন' প্রশ্নটা মুখে না বললেও তার চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। নরেশবাবু একটু হেসে বললেন, 'দীনু লাহিড়ীর বাক্স ধর্মীজার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে সেটা আপনার মতো তুখোড় লোকের পক্ষে বের করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। ধর্মীজার নামটা তার সুটকেসে লেখা ছিল, আর এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগটা তাকে আমি নিজে ব্যবহার করতে দেখেছি। সেই বাক্স থেকে শেভিং-এর সরঞ্জাম বার করে দাড়ি কামিয়েছেন ভদ্রলোক।'

'কিন্তু কাল সে কথাটা বললেন না কেন?'

'আমি বলে দেওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বার করার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ নয় কি? কেসটা তো আপনার। আপনি মাথা খাটাবেন এবং তার জন্য আপনি পারিশ্রমিক পাবেন। গায়ে পড়ে আমি কেন হেল্‌প করব বলুন?'

ফেলুদার ভাব দেখে বুঝলাম সে নরেশবাবুর কথাটা অস্বীকার করছে না। সে বলল, 'কিন্তু আপনার বেয়াড়া অনুরোধটা কী সেটা তো বললেন না।'

'সেটা আর কিছুই না। লাহিড়ীর বাক্স আপনি উদ্ধার করতে পারবেন নিশ্চয়ই। আর সেই সঙ্গে সেই লেখাটাও। আমার অনুরোধ আপনি ওটা ওকে ফেরত দেবেন না।'

'সে কী!' ফেলুদা অবাক। আমিও।

'তার বদলে ওটা আমাকে দিন।'

'আপনাকে?' ফেলুদার গলার আওয়াজ তিন ধাপ চড়ে গেছে।

'বললাম তো অনুরোধটা একটু বেয়াড়া। কিন্তু এ অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।' ভদ্রলোক তাঁর কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'তার প্রথম কারণ

হচ্ছে—ওই লেখার মূল্য দীননাথ লাহিড়ীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার বাড়ির আলমারিতে একটাও ভাল বই দেখেছেন? দেখেননি। দ্বিতীয়ত, কাজটা আমি আপনাকে বিনা কম্পেনসেশনে করতে বলছি

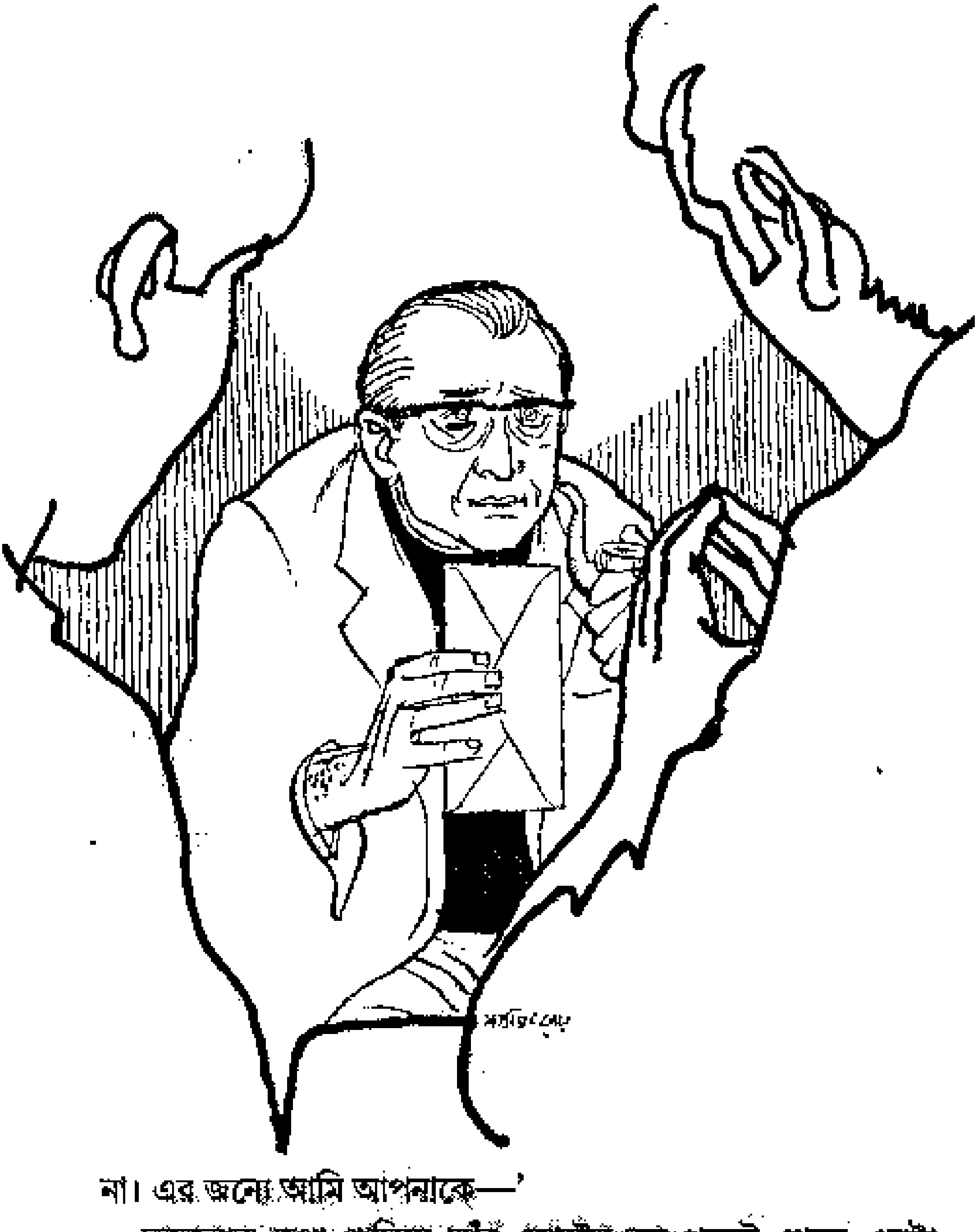

না। এর জন্যে আমি আপনাকে—'

ভদ্রলোক কথা থামিয়ে তাঁর কোটের বুক-পকেট থেকে একটা নীল রঙের খাম টেনে বার করলেন। তারপর খামের ঢাকনা খুলে সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে ধরলেন। ঢাকনা খুলতেই একটা চেনা

গন্ধ আমার নাকে এসেছিল। সেটা হল করকরে নতুন নোটের গন্ধ। এখন দেখলাম খামের মধ্যে একশো টাকার নোটের তাড়া।

'এতে দু' হাজার আছে', নরেশবাবু বললেন, 'এটা আগাম। লেখাটা হাতে এলে আরও দু দেব আপনাকে।'

ফেলুদা খামটা যেন দেখেও দেখল না। পকেটে হাত দিয়ে চারমিনারের প্যাকেট বার করে দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার মনে হয় দীননাথ লাহিড়ী ও লেখার কদর করেন কি না করেন সেটা এখানে অবান্তর। আমি যে কাজের ভারটা নিয়েছি সেটা হল তাঁর বাক্সটা সিমলা থেকে এনে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া—সমস্ত জিনিসপত্র সমেত। ব্যাস্—ফুরিয়ে গেল।'

নরেশবাবু বোধ হয় কথাটার কোনও জুতসই জবাব পেলেন না। বললেন, 'বেশ—ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার অনুরোধের কথাটাতেই ফিরে আসছি। লেখাটা আপনি আমায় এনে দিন। দীনু লাহিড়ীকে বলবেন সেটা মিসিং। ধমীজা বলছে লেখাটা বাক্সে ছিল না।'

ফেলুদা বলল, 'তাতে ধমীজার পোজিশনটা কী হচ্ছে সেটা ভেবে দেখেছেন কি? একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের ঘাড়ে আমি এভাবে অপরাধের বোঝা চাপাতে রাজি হব—এটা আপনি কী করে ভাবলেন? মাপ করবেন মিস্টার পাকড়াশী, আপনার এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, 'গুড নাইট, মিস্টার পাকড়াশী। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

নরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত থুম হয়ে বসে থেকে টাকা সমেত খামটা পকেটে পুরে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। তিনি রাগ করেছেন, না হতাশ হয়েছেন, না অপমানিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা ছাড়া অন্য কোনও গোয়েন্দা যদি অতগুলো করকরে নোটের সামনে পড়ত, তা হলে কি সে

এভাবে লোভ সামলাতে পারত? বোধ হয় না।

॥ ৬ ॥

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের দুশো তেষট্টি নম্বর ফ্লাইটে আমরা তিনজনে দিল্লি চলেছি— আমি, ফেলুদা আর জটায়ু। সাড়ে সাতটার সময় প্লেন দমদম ছেড়েছে। দমদমে ওয়েটিং রুমে থাকতেই ফেলুদা বাক্স বদলের ঘটনাটা মোটামুটি লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল। শোনার সময় ভদ্রলোক বারবার উত্তেজিত হয়ে 'থ্রিলিং' 'হাইলি সাসপিশাস' ইত্যাদি বলতে লাগলেন, আর সরষের তেল গায়ে মেখে অ্যাটাক করার ব্যাপারটা একটা ছোট্ট খাতায় নোট করে নিলেন। ওয়েটিং রুমে থাকতেই ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি আগে প্লেনে চড়েছেন কি না। তাতে উনি বললেন, 'কল্পনার দৌড় থাকলে মানুষ কোনও কিছু না করেও সব কিছুই করে ফেলতে পারে। প্লেনে আমি চড়িনি। যদি জিজ্ঞেস করো নার্ভাস লাগছে কি না তা হলে বলব—নট এ বিট, কারণ আমি কল্পনায় শুধু প্লেনে নয়—রকেটে চড়ে মুনে পর্যন্ত ঘুরে এসেছি।'

এত বলার পরেও দেখলাম প্লেনটা যখন তীরবেগে রানওয়ের ওপর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ সাঁই করে মাটি ছেড়ে কোনাকুনি উপর দিকে উঠল, তখন লালমোহনবাবু দুহাতে তাঁর সিটের হাতল দুটো এমন জোরসে মুঠো করে ধরলেন যে, তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো সব ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটো নীচের দিকে নেমে এসে তলার দাঁতের পাটি বেরিয়ে গেল, আর মুখটা হয়ে গেল হলদে ব্লটিং পেপারের মতো।

পরে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'ওরকম হবেই। রকেট যখন পৃথিবী ছেড়ে শূন্যে ওঠে, তখন অ্যাস্ট্রোনটদের মুখও ওরকম বেঁকে যায়। আসলে ওপরে ওঠার সময় মানুষের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের একটা লড়াই চলতে থাকে, আর সে লড়াইয়ের ছাপ পড়ে মানুষের মুখের ওপর। তাই মুখ বেঁকে যায়।'

আমার বলার ইচ্ছে ছিল, মাধ্যাকর্ষণের জন্য মুখ বেঁকলে

সকলেরই বেঁকা উচিত, শুধু লালমোহনবাবুর বেঁকবে কেন, কিন্তু ভদ্রলোক এখন সামলে নিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছেন দেখে আর কিছু বললাম না।

ব্রেকফাস্টে কফি, ডিমের অমলেট, বেকড বিনস, রুটি মাখন মারমালেড, কমলালেবু আর নুন গোলমরিচের খুদে কৌটোর সঙ্গে ট্রেতে ছিল প্লাস্টিকের থলির ভিতর একগাদা কাঁটা-চামচ আর ছুরি। লালমোহনবাবু কফির চামচ দিয়ে অমলেট কেটে খেলেন, ছুরিটাকে চামচের মতো ব্যবহার করে শুধু শুধু মারমালেড খেলেন, আর কাঁটা দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে গিয়ে শেষটায় না পেরে হাত দিয়ে কাজটা সারলেন। খাবার পর ফেলুদাকে বললেন, 'আপনাকে তখন সুপুরি খেতে দেখলুম—আর আছে নাকি?' ফেলুদা তার দুটো পায়ের মাঝখানে ধমীজার বাক্সটা রেখেছিল, সেটা থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে লালমোহনবাবুকে দিল। বাক্সটার দিকে চোখ পড়লেই কেন জানি আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠছিল। এই বাক্সটা ফেরত দিয়ে তার বদলে ঠিক ওই রকমই একটা বাক্স আনার জন্য আমরা কলকাতা থেকে বারো শো মাইল দূরে সাত হাজার ফুট হাইটে বরফের দেশ সিমলা শহরে চলেছি!

ফেলুদা প্লেনে ওঠার পর থেকেই বিখ্যাত সবুজ খাতা (ভল্যুম সেভন) বার করে তার মধ্যে নানারকম হিজিবিজি নোট করে চলেছে, আর মাঝে মাঝে কলমের পিছনটা দাঁতের ফাঁকে দিয়ে পাশের জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সাদা সাদা তুলোর মতো মেঘের সমুদ্রের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছে। আমি অবিশ্যি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ রহস্যটা যে ঠিক কোনখানে সেটাই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

দিল্লিতে নামার পর প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বেশ শীত। ফেলুদা বলল, তার মানে সিমলায় টাটকা স্নো-ফল হয়েছে; উত্তর দিক থেকে সেই বরফের কনকনে হাওয়া বয়ে এসে দিল্লির শীত বাড়িয়েছে। ধমীজার ব্যাগটা ফেলুদা নিজের হাতেই রেখেছিল, আর এক মুহূর্তের জন্যও সেটাকে হাতছাড়া করেনি। লালমোহনবাবু বললেন আগ্রা হোটেলে উঠবেন। 'বারোটা নাগাত চানটান করে

আপনাদের হোটেলে এসে মিট করব। তারপর এক সঙ্গে লাঞ্চ সেরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে। ট্রেন তো সেই রাত আটটায়।'

জনপথ হোটেলটা একটা পেল্লায় ব্যাপার। ছ'তলা হোটেলের পাঁচতলার পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ডাবল রুমে জিনিসপত্র যথাস্থানে রেখে ফেলুদা তার খাটে শুয়ে পড়ল। একটা প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল, সেটা এই সুযোগে ফেলুদাকে বলে ফেললাম—

'এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কোন জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি রহস্যজনক বলে মনে হয়?'

ফেলুদা বলল, 'খবরের কাগজ।'

'একটু খুলে বলবে কি?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'মিস্টার ধমীজা দু দুটো দিল্লির কাগজ সযত্নে ভাঁজ করে তার বাক্সে পুরেছিলেন কেন—আপাতত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে রহস্যজনক। ট্রেনে যে কাগজ কেনা হয়, শতকরা নিরানব্বুইজন লোক সে কাগজ ট্রেনেই পড়া শেষ করে ট্রেনেই ফেলে আসে। অথচ...'

এটা হল ফেলুদার কায়দা। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করবে, যেটা নিয়ে ভাবার কথা আর কারুর মাথাতেই আসবে না।

দিল্লিতে আমরা যেটুকু সময় ছিলাম তার মধ্যে লেখার মতো দুটো ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটা তেমন কিছু নয়, দ্বিতীয়টা সাংঘাতিক।

সাড়ে বারোটার সময় লালমোহনবাবু এলে পর আমরা ঠিক করলাম লাঞ্চ সেরে যন্তর মন্তর দেখতে যাব। আড়াইশো বছর আগে রাজা মানসিংহের তৈরি এই আশ্চর্য অবজারভেটরিটা জনপথে হোটেল থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ। ফেলুদা বলল ও ঘরেই থাকবে, বাক্সটা পাহারা দেবে, আর কেসটা নিয়ে চিন্তা করবে। কাজেই আমি আর লালমোহনবাবু চলে গেলাম মানসিংহের কীর্তি দেখতে, আর সেখানেই ঘটল প্রথম ঘটনাটা।

মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর লালমোহনবাবু হঠাৎ আমার কোটের আস্তিনটা ধরে বলল, 'একজন সাসপিশাস ক্যারেকটার বোধহয় আমাদের ফলো করছে।'

উনি যাকে চোখের ইশারায় দেখালেন, তিনি একজন বুড়ো ভদ্রলোক। তার মাথায় একটা নেপালি টুপি, চোখে কালো চশমা আর কানে তুলো। সত্যিই মনে হল লোকটা সুযোগ পেলেই যেন এখান থেকে ওখান থেকে উঁকি মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে।

'লোকটাকে আমি চিনি,' লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন।

'সে কী, চেনেন মানে?'

'প্লেনে আমার পাশে এসেছে। আমার সেফটি বেল্ট বাঁধতে সাহায্য করেছিল।'

'কোনও কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?'

'না। আমি থ্যাঙ্কস দিলুম, উনি কিছু বললেন না। ভেরি সাসপিশাস।'

আমরা ওর বিষয় কথা বলছি সেটা বোধহয় বুড়োটা বুঝতে পেরেছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখতে পেলাম না।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটে হল। রিসেপশনে গিয়ে পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইতে লোকটা বলল চাবি তো নেই। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই খেয়াল হল চাবিটা রিসেপশনে দেওয়াই হয়নি—ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে। তারপর আবার খেয়াল হল, ফেলুদা যখন ঘরেই রয়েছে, তখন চাবির দরকার কী? হোটেলে থেকে তো অভ্যেস নেই, তাই মাথা গুলিয়ে গেছে।

পাঁচ তলায় লম্বা খোলা বারান্দা দিয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত হেঁটে গিয়ে ডান দিকে আমাদের ঘর। দরজায় টোকা দিয়ে দেখি কোনও সাড়া নেই।

জটায়ু বললেন, 'তোমার দাদা বোধহয় ন্যাপ নিচ্ছেন।'

আবার টোকা মারলাম, তাও কোনও জবাব নেই।

শেষটায় দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদা কিন্তু ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু খোলা হলে কী হবে—দরজার পিছনে কী জানি একটা রয়েছে যার ফলে সেটা অল্প খুলে আর খুলছে না।

এবার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা খানিকটা গলাতেই একটা দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

দরজার ঠিক পিছনটায় ফেলুদা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তার ডান হাতের কনুইটা রয়েছে সামনের দিকে, আর সেটাতেই আটকাচ্ছে আমাদের দরজা।

আমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাও লালমোহনবাবুর সঙ্গে একজোটে খুব সাবধানে দরজাটাকে আরেকটু ফাঁক করে কোনওরকমে শরীরটা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

ফেলুদা অজ্ঞান হয়ে ছিল; হয়তো আমাদের ঠেলাঠেলির ফলেই এখন একটু ওপাশ এপাশ করছে, আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানোর

মতো শব্দ করছে। লালমোহনবাবু দেখলাম দরকারে বেশ কাজের মানুষ; মাথায় আর চোখে জল দিয়ে ফেলুদার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

ফেলুদা আরেকটা গোঙানির শব্দ করে মাথাটার উপর আলতো করে নিজের হাতটা ঠেকিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে বলল, 'ওটা নেই নিশ্চয়ই।'

আমি এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি। বললাম, 'না ফেলুদা। বাক্স লোপাট।'

'ন্যাচারেলি!'

ফেলুদা উঠতে যাবে, আমরা দুজনে তার দিকে হাত বাড়িয়েছি, তাতে ও বলল, 'ঠিক আছে, আই ক্যান ম্যানেজ। চোট শুধু ব্রহ্মতালুতে।'

মিনিট দু-এক বিশ্রাম করে হাত-পা এদিক ওদিক চালিয়ে নিয়ে, টেলিফোনে চা অর্ডার দিয়ে, অবশেষে ফেলুদা আমাদের ঘটনাটা খুলে বলল।

'তোরা যাবার পর আধঘণ্টা খানেক আমি খাতাটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছু কাজকর্ম করলাম। কাল রাত্রে তো ঘণ্টা দু-একের বেশি ঘুমোইনি, তাই সবে ভাবছি একটু চোখটা বুজে জিরিয়ে নেব, এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।'

'টেলিফোন?'

'শোন না ব্যাপারটা!—টেলিফোন ধরতে রিসেপশনের লোকটার গলা পেলাম। বলল, 'মিস্টার মিত্তির, একটি ভদ্রলোক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আপনাকে বিখ্যাত ডিটেকটিভ বলে চিনেছেন। তিনি আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন—আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব কি?'

ফেলুদা একটু থেমে আমার দিকে ফিরে বলল, 'একটা জিনিস তোকে বলছি তোপসে—অটোগ্রাফ নেবার লোভের চেয়ে অটোগ্রাফ দেবার লোভটা মানুষের মধ্যে কিছু কম প্রবল নয়। অবিশ্যি ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে যাব, কিন্তু এই লেসনটা না পেলে হতাম কিনা সন্দেহ।'

'তার মানে---?'

'তার মানে কিছুই না। বললাম, পাঠিয়ে দাও আমার ঘরে। লোকটা এল, নক করল, দরজা খুললাম, আর খুলতেই নক পড়ল আমার মাথায়, আর তার পরেই অমাবস্যা। মুখে রুমাল বেঁধে এসেছিল, তাই চেহারাটাও...'

আমার ইচ্ছে করছিল মাথার চুল ছিঁড়ি। কেন যে গেলাম মরুতে যন্তর মন্তর দেখতে! লালমোহনবাবু বললেন, 'দিল্লিতে রয়েছি যখন, প্রাইম মিনিস্টারকে একটা ফোন করলে হয় না?'

ফেলুদা একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'বাক্স নিয়ে সে লোকের কী লাভ হল জানি না, কিন্তু আমাদের একেবারে চরম বিপদে ফেলে দিয়ে গেল। কী বেপরোয়া শয়তান রে বাবা!'

এরপর মিনিট পাঁচেক ধরে আমাদের তিনজনের নিশ্বাস ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না ঘরে। তারপর ফেলুদা বলল, 'রাস্তা আছে। ঠিক সিধে নয়, তবে একমাত্র রাস্তা। আর সেটা নিতেই হবে, কারণ খালি হাতে সিমলা যাওয়া চলে না।'

এবার ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে তার সবুজ নোট বুকটা নিল। তারপর ধমীজার বাক্সের জিনিসের লিস্টটা বার করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এতে এমন জিনিস একটাও নেই যেটা দিল্লি শহরে কিনতে যাওয়া যাবে না। এই লিস্ট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস নিতে হবে আমাদের। জিনিসগুলোর অবস্থা কীরকম ছিল সেটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। হয়তো ধমীজার চেয়ে বেশি ভাল করেই মনে আছে। কাজেই সেখানে কোনও চিন্তা নেই। এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং ক্রিম যতটা খরচ হয়েছিল ঠিক ততটা পর্যন্ত বার করে ফেলে দিয়ে সেই অবধি টিউবটাকে পাকিয়ে দেব। সাদা রুমাল কিনে তাতে G লেখানোও আজকের মধ্যেই সম্ভব, নকশাটা আমার মনে আছে। খবরের কাগজ দুটোর তারিখ অবিশ্যি মিলবে না, কিন্তু সেটা ধমীজা নোটিশ করবে বলে মনে হয় না। এক খরচের মধ্যে হল এক রোল কোডাক ফিল্ম—'

'ওই যাঃ!' জটায়ু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা সেই যে আপনি প্লেনে

আমাকে দিলেন, তারপর আর ফেরতই দেওয়া হয়নি।' এই বলে তিনি পকেট থেকে সুপুরি রাখা কোডাকের কৌটোটা বার করে ফেলুদাকে দেখালেন।

'ঠিক আছে। একটা ঝামেলা কমল।...কিন্তু ওটা আবার কী বেরোল আপনার পকেট থেকে?'

কোডাকের কৌটোর সঙ্গে একটা কাগজের টুকরোও বেরিয়ে এসেছে লালমোহনবাবুর কোটের পকেট থেকে। কাগজটায় লাল পেনসিলে লেখা—

'প্রাণের ভয় থাকে তো সিমলা যেয়ো না—'

॥ ৭ ॥

এখন রাত সাড়ে ন'টা। আমরা ট্রেনে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কালকার দিকে ছুটে চলেছি। কালকা থেকে কাল ভোরে সিমলার ট্রেন ধরব। দিল্লি থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তাই আর ট্রেনে ডিনার নিইনি। আমাদের কামরায় আমরা তিনজনেই রয়েছি, তাই একটা আপার বার্থ খালি। অন্য দুজনের কথা জানি না, আমার মনের মধ্যে খুশি ভয় কৌতূহল উত্তেজনা সব মিলিয়ে এমন একটা ভাব হয়েছে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমার কীরকম লাগছে, তা হলে আমি বলতেই পারব না।

আমরা তিনজনেই চুপচাপ যে যার নিজের ভাবনা নিয়ে বসেছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'আচ্ছা মিস্টার মিত্তির, খুব ভাল গোয়েন্দা আর খুব ভাল ক্রিমিন্যাল—এই দুটোর মধ্যে বোধহয় খুব একটা তফাত নেই, তাই না?'

ফেলুদা এত অন্যমনস্ক ছিল যে কোনও উত্তরই দিল না, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম লালমোহনবাবু কেন কথাটা বললেন। ওটার সঙ্গে আজ বিকেলের একটা ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। সেটা এখানে বলা দরকার, কারণ ফেলুদার একটা বিশেষ ক্ষমতা এতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ধমীজাকে ভাঁওতা দেবার জন্য লিস্ট অনুযায়ী বাক্সের

জিনিসগুলো জোগাড় করতে লাগল মাত্র আধঘণ্টা। শুধু একটা ব্যাপারে এসে ঠেকে গেলাম—বাক্সের ভিতরের জিনিস জোগাড় হলেও আসল বাক্সটা নিয়েই হয়ে গেল মুশকিল।

নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ পাওয়া যাবে কোত্থেকে? দিল্লিতে আমাদের চেনা এমন একজনও লোক নেই যার কাছে ওরকম একটা ব্যাগের সন্ধান করা যেতে পারে। বাজারে ঠিক ওইরকমই দেখতে ব্যাগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে এয়ার ইন্ডিয়ার লেবেল নেই, আর লেবেল না থাকলে ধমীজা নির্ঘাত আমাদের বুজরুকি ধরে ফেলবেন। শেষটায় ফেলুদা দেখি একেবারে এয়ার ইন্ডিয়ার আপিসে গিয়ে হাজির হল। ঢুকেই আমাদের দৃষ্টি গেল কাউন্টারের সামনে চেয়ারে বসা পার্শি টুপি পরা এক ফরসা বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের বাঁ দিকে তার চেয়ারের গা ঘেঁষে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে একটা ঝকঝকে নতুন নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স। ঠিক যেরকমটি দরকার সেরকম। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমরা একটা নীল রঙের বাজারের ব্যাগ কিনে নিয়েছিলাম।

ফেলুদা সেটা হাতে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের বাক্সের ঠিক পাশেই হাতের বাক্সটা রেখে, কাউন্টারের পিছনের লোকটাকে ওর সব চেয়ে চোস্ত ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল—'আপনাদের দিল্লি থেকে কোনও ফ্লাইট ফ্রাঙ্কফুর্টে যায় কি?' লোকটা অবিশ্যি তখুনি ফেলুদাকে খবরটা দিয়ে দিল, আর ফেলুদাও তক্ষুনি থ্যাঙ্ক ইউ বলে যাবার সময় এমন কায়দা করে বুড়োর ব্যাগটা তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে পা দিয়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে নিজের ব্যাগটা বুড়োর ব্যাগের জায়গায় রেখে দিল যে, আমার মনে হল ফেলুদার হাত সাফাইটাও তার বুদ্ধির মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এটাও বলা দরকার যে বাক্স হাতে পাওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফেলুদার কারসাজির ফলে সেই বাক্স আর তার ভিতরের জিনিসপত্রের যা চেহারা হল, তা দেখে ধমীজার চোদ্দোপুরুষও সন্দেহ করবে না যে তার মধ্যে কোনও ফাঁকি আছে।

ফেলুদা এতক্ষণ খাতা খুলে বসেছিল, এবার সেটা বন্ধ করে

আমাদের এই ছোট্ট কামরার ভেতরেই পায়চারি শুরু করে আপন মনেই বলে উঠল, 'ঠিক এই রকম একটা কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন ওঁরা চারজন...'

কখন যে কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা বলা শক্ত। অনেক সময় কেন যে করে সেটা বলা আরও শক্ত। যেমন জলের গেলাসগুলো। কামরার দেয়ালে জানালা ও দরজার দুদিকে আংটা লাগানো আছে, আর তার মধ্যে বসানো আছে চারটে জলের গেলাস। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই একটা গেলাসের দিকে।

'ট্রেনে উঠলে আপনার ঘুম হয়, না হয় না?' হঠাৎ ফেলুদা প্রশ্ন করল জটায়ুকে। জটায়ু একটা জলহস্তীর মতো বিশাল হাই তুলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে হেসে বলল, 'ঝাঁকুনিটা মন্দ লাগে না।'

ফেলুদা বলল, 'জানি। কিন্তু সকলের পক্ষেই এই ঝাঁকুনিটা ঘুমপাড়ানির কাজ করে না। আমার এক মেসোমশাই সারারাত জেগে বসে থাকতেন ট্রেনে। অথচ বাড়িতে খেয়েদেয়ে বালিশে মাথা দিলেই অঘোর নিদ্রা।'

হঠাৎ দেখি ফেলুদা এক লাফে বাঙ্কে উঠে গেছে। উঠেই প্রথমে রিডিং লাইটটা জ্বালল। তারপর সেটার সামনে এলেরি কুইনের বইটা (যেটা দিল্লি স্টেশন থেকে ধমীজার বাক্সে রাখার জন্য কিনতে হয়েছে) খুলে ধরে কিছুক্ষণ পাতা উলটে দেখল। তারপর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে সিলিংয়ের আলোর দিকে চেয়ে রইল। ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, বাইরে মাঝে মাঝে দু-একটা বাতি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যায় না। লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তিনি যে অস্ত্রটার কথা বলেছিলেন সেটা কখন আমাদের দেখাবেন, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'একটা ভুল হয়ে গেছে। ডাইনিং কারের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে ওদের কাছে সুপুরি আছে কি না। না থাকলে কোনও স্টেশন থেকে কিনে নিতে হবে। ধমীজার কৌটোর মাল মাত্র একটিতে এসে ঠেকেছে।'

লালমোহনবাবু পকেট থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে

ঢাকনা খুলে হাতের উপর কাত করলেন। কিন্তু তা থেকে সুপুরি বেরোল না।

'আচ্ছা আপদ তো! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভেতরে রয়েছে, অথচ বেরোচ্ছে না।'

এবার লালমোহনবাবু কৌটোটা হাতের তেলোর উপর ঝাঁকাতে শুরু করলেন, আর প্রত্যেক ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে একটা করে শালা বলতে লাগলেন। কিন্তু তাও সুপুরি বেরোল না।

'দিন তো মশাই!'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা এক লাফে বাঙ্ক থেকে নেমে এক ছোবলে লালমোহনবাবুর হাত থেকে হলদে কৌটোটা ছিনিয়ে নিল। জটায়ু এই আচমকা আক্রমণে থ।

ফেলুদা নিজে কৌটোটাকে একবার ঝাঁকিয়ে কোনও ফল হল না দেখে তার ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কৌটোর ভিতরে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই একটা খচ শব্দ করে সুপুরিটা আলগা হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

এবার ফেলুদা কৌটোর মুখে নাক লাগিয়ে বলল—'কৌটোর তলায় আঠা লাগানো ছিল। সম্ভবত অ্যারালডাইট।'

বাইরে করিডরে পায়ের আওয়াজ।

'তোপসে, শাট দ্য ডোর!'

আমি দরজাটা এক পাশে ঠেলে বন্ধ করার সময় এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম আমাদের দরজার সামনে দিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল যন্তর মন্তরের সেই কালো চশমা পরা আর কানে তুলো গোঁজা বুড়ো।

'স স স স...'

ফেলুদার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ বেরোল।

সে সুপুরিটা হাতের তেলোয় নিয়ে একদৃষ্টে সেটার দিকে চেয়ে আছে।

আমি এগিয়ে গেলাম ফেলুদার দিকে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে সুপুরি নয়। একটা অন্য কিছুর গায়ে ব্রাউন রং লাগিয়ে তাকে কতকটা সুপুরির মতো দেখতে

করা হয়েছে।

'বোঝা উচিত ছিল রে তোপসে!' ফেলুদা চাপা গলায় বলে উঠল। 'আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। আই হ্যাভ বিন এ ফুল!'

এবার ফেলুদা তার হাতের কাছের জলের গেলাসটা আংটা থেকে বার করে নিয়ে তার মধ্যে সুপুরিটাকে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল। দেখতে দেখতে জলের রং খয়েরি হয়ে গেল। ধোয়া শেষ হলে পর জিনিসটাকে জল থেকে তুলে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলুদা সেটাকে আবার হাতের উপর রাখল।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যেটাকে সুপুরি বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে একটা নিখুঁতভাবে পলকাটা ঝলমলে পাথর। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেটা ফেলুদার ডান হাতের উপর এপাশ ওপাশ করছে, আর তার ফলে কামরার এই আধা আলোতেই তার থেকে যা ঝলকানি বেরোচ্ছে, তাতে মনে হয় বুঝি হিরে।

আর সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে বলব এত বড় হিরে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, আর লালমোহনবাবুও দেখেননি, আর ফেলুদাও দেখেছে কি না সন্দেহ।

'এ-এটা কি ডা-ডাই-ডাই...'

লালমোহনবাবুর মাথাটা যে গণ্ডগোল হয়ে গেছে সেটা তাঁর কথা বলার ঢং থেকেই বুঝতে পারলাম। ফেলুদা পাথরটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এক লাফে উঠে গিয়ে দরজাটা লক করে দিয়ে আবার জায়গায় ফিরে এসে চাপা গলায় বলল, 'এমনিতেই তো মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে আপনি আবার তার মধ্যে ডাই ডাই করছেন?'

'না—মানে—'

'যে রেটে এই বাক্সের পিছনে লোক লেগেছে, তাতে হিরে হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। তবে আমি তো আর জহুরি নই।'

'তা হলে এর ভ্যা-ভ্যা—'

'হিরের ভ্যালু সম্বন্ধে আমার খুব পরিষ্কার জ্ঞান নেই। ক্যারেটের একটা আন্দাজ আছে—কোহিনুরের ছবি অ্যাকচুয়েল সাইজে দেখেছি। আন্দাজে মনে হয় এটা পঞ্চাশ ক্যারেটের কাছাকাছি হবে।

দাম লাখ-টাখ ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাবার কথা।'

ফেলুদা এখনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরটাকে দেখছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ধমীজার কাছে এ জিনিস গেল কী করে?'

ফেলুদা বলল, 'লোকটা আপেলের চাষ করে, আর ট্রেনে ডিটেকটিভ বই পড়ে—এ ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তখন প্রশ্নটার জবাব আর কী করে দিই বল।'

এতক্ষণে লালমোহনবাবু মোটামুটি গুছিয়ে কথা বলতে পারলেন—'তা হলে এই পাথর কি সেই ধমীজার কাছেই ফেরত চলে যাবে?'

'যদি মনে হয় এটা তারই পাথর, তা হলে যাবে বই কী।'

'তার মানে আপনার কি ধারণা এটা তার নাও হতে পারে?'

'সেটারও আগে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, বাংলাদেশের বাইরে এই ভাবে টুকরো করে এই ধরনের সুপুরি খাওয়ার রেওয়াজটা আদৌ আছে কি না!'

'কিন্তু তা হলে—'

'আর কোনও প্রশ্ন নয়, তোপসে। এখন কেসটা মোড় ঘুরে নতুন রাস্তা নিয়েছে। এখন কেবল চারিদিকে দৃষ্টি রেখে অতি সন্তর্পণে গভীর চিন্তা করে এগোতে হবে। এখন কথা বলার সময় নয়।'

ফেলুদা বুক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা zip-ওয়ালা অংশ খুলে তার মধ্যে পাথরটা ভরে ওয়ালেটটা আবার পকেটে পুরে উপরের বাঙ্কে উঠে গেল। আমি জানি এখন আর তাকে বিরক্ত করা চলবে না। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক তখন আমাকেই বললেন, 'জানো ভাই—রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেব ভাবছি।'

আমি বললাম, 'কেন? কী হল?'

'গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল, সে সব কি আর বানিয়ে লেখা যায়, না ভেবে বার করা যায়? কথায় বলে না—টুথ ইজ স্ট্রেঙ্গার দ্যান ফিকশন।'

'স্ট্রেঙ্গার না, কথাটা বোধহয় স্ট্রেঞ্জার।'

'স্ট্রেঞ্জার?'

'হ্যাঁ। মানে আরও বিস্ময়কর।'

'কিন্তু স্ট্রেঞ্জার মানে তো আগন্তুক। ও, না না—স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জার, স্ট্রেঞ্জেস্ট...'

আমি একটা কথা ভদ্রলোককে না বলে পারলাম না। জানতাম এটা বললে উনি খুশি হবেন।

'আপনার জন্যেই কিন্তু হিরেটা পাওয়া গেল। আপনি সুপুরি খেয়ে কৌটো খালি করে দিয়েছিলেন বলেই তো তলা থেকে ওই নকল সুপুরিটা বেরোল।'

লালমোহনবাবু কান অবধি হেসে ফেললেন।

'তা হলে আমারও কিছু কনট্রিবিউশন আছে বলছ, অ্যাঁ? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—'

তারপর আরেকটু ভেবে বললেন, 'আমার কী বিশ্বাস জানো তো? আমার বিশ্বাস তোমার দাদা এই হিরের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই কেসটা নিলেন। নইলে ভেবে দেখ—দুবার দুবার বাক্স চুরি হল, কিন্তু দুবারই আসল জিনিসটা আমাদের কাছেই রয়ে গেল। আগে থেকে জানা না থাকলে কি এটা হয়?'

সত্যিই তো। লালমোহনবাবু ভালই বলেছেন। ওই সুপুরির কৌটো এখনও চোরেরা নিতে পারেনি। দিল্লিতে হোটেলের ঘরে ঢুকে বাক্স চুরির গোঁয়ার্তুমিও মাঠে মারা গেছে। হিরেটা এখনও আমাদের হাতে, মানে ফেলুদার পকেটে।

তার মানে শয়তানদের হাত থেকে এখনও রেহাই নেই।

হয়তো সিমলায় গিয়েও নেই...

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুমটা যখন ভাঙল তখন বোধহয় মাঝরাত্তির। ট্রেন ছুটে চলেছে কালকার দিকে। বাইরে এখনও অন্ধকার। আমাদের কামরার ভিতরেও অন্ধকার। তার মানে ফেলুদাও ঘুমোচ্ছে। উল্টোদিকে লোয়ার বার্থে জটায়ু। রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখব, এমন সময় চোখ পড়ল দরজার দিকে। দরজার ঘষা কাচের উপর

আমাদের দিক থেকে পর্দা টানা রয়েছে। সেই পর্দার বাঁ পাশে একটা ফাঁক দিয়ে কাচের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেই কাচের উপর পড়েছে একটা মানুষের ছায়া।

মানুষটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম, সে হাতলটা ধরে ঠেলে দরজাটাকে খোলার চেষ্টা করছে। জানি দরজা লক করা আছে, খুলতে পারে না, কিন্তু তাও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানি না, হঠাৎ পাশের সিট থেকে লালমোহনবাবু ঘুমের মধ্যে 'বুমেরাং' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে লোকটার ছায়াটা কাচের উপর থেকে সরে গেল।

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এত শীতের মধ্যেও আমি দস্তুর মতো ঘেমে গেছি।

॥ ৮ ॥

আমি দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, এবারে প্লেনে দিল্লি আসার সময় দিন পরিষ্কার ছিল বলে দূরে বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণা দেখেছি, সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখেছি, কিন্তু সিমলাতে এসে চোখের সামনে বরফ দেখতে পেয়ে যেরকম অবাক হয়েছি সেরকম আর কখনও হইনি। রাস্তায় যদি আমাদের দেশের লোক না দেখতাম, তা হলে ভারতবর্ষে আছি বলে মনেই হত না। অবিশ্যি শহরটার চেহারাতে এমনিতেই একটা বিদেশি ভাব রয়েছে। তার কারণ, ফেলুদা বলল, দার্জিলিঙের মতো সিমলাও নাকি সাহেবদেরই তৈরি। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে লেফটেনান্ট রস বলে একজন সাহেব নাকি সিমলায় এসে নিজের থাকার জন্য একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করে। সেই থেকে শুরু হয় সিমলায় সাহেবদের বসবাস। ভাগ্যিস সাহেবরা গরমে কষ্ট পেত, আর তাই গরমকালে ঠাণ্ডা ভোগ করার জন্য পাহাড়ের উপর নিজেদের থাকার জন্য শহর তৈরি করে নিত!

কালকা থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেনে এখানে আসার পরে

বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি। সেই কানে তুলো গোঁজা বুড়ো লোকটা কিন্তু একই গাড়িতে সিমলা এসেছে, আর আমাদের সঙ্গে একই ক্লার্কস হোটেলে উঠেছে। তবে লোকটা এখন আমাদের দিকে আর বিশেষ নজর দিচ্ছে না, আর আমারও মনে হচ্ছে ওকে সন্দেহ করে আমরা হয়তো ভুলই করেছিলাম। সত্যি বলতে কী, এখন লোকটাকে প্রায় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হচ্ছে। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে ক্লার্কসেই উঠেছেন। এই বরফের সময় খুব বেশি লোক বোধ হয় সিমলায় আসে না, তাই উনি আগে থেকেই রিজার্ভ না করেও একটা ঘর পেয়ে গেছেন।

ফেলুদা হোটেলে এসে ঘরে জিনিসপত্র তুলেই পোস্টাপিসের খোঁজে বেরিয়ে গেল। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলল বাক্সটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তাই আমরা দুজনেই থেকে গেলাম। ফেলুদা কিন্তু এসে অবধি সিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্যই করেনি। আর ঠিক তার উলটোটা করছেন লালমোহনবাবু। যা কিছু দেখেন তাতেই বলেন, "ফ্যানাস্ট্যাটিক।" আমি যখন বললাম, যে কথাটা আসলে ফ্যান্টাস্টিক, তাতে ভদ্রলোক বললেন যে উনি নাকি ইংরিজি এত অসম্ভব তাড়াতাড়ি পড়েন যে প্রত্যেকটা কথা আলাদা করে লক্ষ করার সময় হয় না। এ ছাড়া সিমলায় পোলার বেয়ার আছে কি না, এখনও আকাশে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায় কি না, এই বরফ দিয়ে এস্কিমোদের বাড়ি ইলগু (আমি বললাম কথাটা আসলে ইগ্‌লু) তৈরি করা যায় কি না—এই সব উদ্ভট প্রশ্ন করে চলেছেন অনবরত।

ক্লার্কস হোটেলটা পাহাড়ের ঢালু গায়ের উপর তৈরি। হোটেলের দোতলার সামনের দিকে একটা লম্বা বারান্দা, আর বারান্দা থেকে বেরোলেই রাস্তা। দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর, লাউঞ্জ বা বসবার ঘর, আমাদের ডাবল রুম আর লালমোহনবাবুর সিঙ্গল রুম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় আরও থাকার ঘর রয়েছে, আর রয়েছে ডাইনিং রুম।

ফেলুদার ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে আমাদের লাঞ্চ খেতে খেতে হয়ে গেল প্রায় দুটো। ডাইনিং রুমের এক কোণে ব্যান্ড

বাজছে, লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন কনসার্ট। আমরা তিনজন ছাড়া ঘরে রয়েছেন সেই কানে তুলো গোঁজা বৃদ্ধ—যার দিকে লালমোহনবাবু আর দেখছেন না—আর অন্য আরেকটা টেবিলে বসেছেন তিনজন বিদেশি—দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা। আমরা যখন খেতে ঢুকছি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একজন কালো চশমা পরা ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা মাথায় 'বেরে' ক্যাপ পরা ভদ্রলোক। যতদূর মনে হয় সবসুদ্ধ এই আটজন ছাড়া হোটেলে আর কোনও লোক নেই।

সুপ খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ধমীজার কাছে তো আজকেই যাবার কথা?'

'চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তিনটেয় বেরোলেই হবে।'

'বাড়িটা কোথায় জানো?'

'ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল পড়ে কুফ্রি যাবার পথে। এখান থেকে আট মাইল।'

'তা হলে এক ঘণ্টা লাগবে কেন?'

'অনেকখানি রাস্তা বরফে ঢাকা। পাঁচ মাইলের বেশি স্পিড তুললে গাড়ি স্কিড করতে পারে।' তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনার সঙ্গে যা গরম আছে পরে নেবেন। যেখানে যাচ্ছি সেটা সিমলার চেয়ে এক হাজার ফুট বেশি হাইটে। বরফ আরও অনেক বেশি।'

লালমোহনবাবু চামচ থেকে সুড়ুত করে খানিকটা সুপ টেনে নিয়ে বললেন, 'শেরপা যাচ্ছে সঙ্গে?'

কথাটা শুনে প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বেশ গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, 'না। রাস্তা আছে। গাড়ি যাবে।'

সুপ শেষ করে যখন মাছের জন্য অপেক্ষা করছি তখন ফেলুদা হঠাৎ লালমোহনবাবুকে বলল, 'আপনি যে অস্ত্রের কথা বলছিলেন সেটা কী হল?'

লালমোহনবাবু একটা কাঠির মতো সরু লম্বা রুটির খানিকটা চিবোতে চিবোতে বললেন, 'সেটা আমার বাক্সে রয়েছে। এখনও দেখানোর ঠিক মওকা পাইনি।'

'ব্যাপারটা কী?'

'একটা বুমেরাং।'

ওরেব্বাস! এই কারণেই কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভদ্রলোক বুমেরাং বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন!

'ও জিনিসটা আবার কোথায় পেলেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। আরও পাঁচ রকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না। শুনিচি ঠিক করে ছুঁড়তে পারলে নাকি শিকারকে ঘায়েল করে আবার শিকারির হাতেই ফিরে আসে।'

'একটু ভুল শুনেছেন। শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের পাশেই পড়ে থাকে। লক্ষ্য যদি মিস করে তা হলেই আবার ফিরে আসে।'

'সে যাই হোক মশাই—ছোঁড়া খুব ডিফিকাল্ট। আমি আমাদের গড়পারের বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়েছিলুম। তা সে বুমেরাং গিয়ে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের এক বাড়ির তেতালার বারান্দায় ঝোলানো ফুলের টব দিলে ভেঙে। ভাগ্যে চেনা বাড়ি ছিল—তাই ফেরত পেলুম।'

'ওটা আজ সঙ্গে নিয়ে নেবেন।'

লালমোহনবাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল—'ডেঞ্জার এক্সপেক্ট করছেন নাকি?'

'পাথরটা তো পায়নি সে লোক এখনও!'

ফেলুদা যদিও কথাটা বেশ হালকাভাবেই বলল, আমি বুঝতে পারলাম যে কোনও রকম একটা গোলমালের আশঙ্কা সেও যে করছে না তা নয়।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় একটা নীল অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সি এসে আমাদের হোটেলের সামনে দাঁড়াল। আমরা তিনজনই সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলাম, গাড়িটা আসতেই ফেলুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ড্রাইভারটা এখানকারই লোক, বয়স অল্প, বেশ জোয়ান চেহারা। ফেলুদা সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল, তার সঙ্গে ধর্মীজোর (নকল) বাক্স, আর আমরা দুজন পিছনে। লালমোহনবাবু তার বুমেরাংটা ওভারকোটের ভিতর নিয়ে নিয়েছেন। কাঠের তৈরি জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছি।

অনেকটা হকি স্টিকের তলার অংশটার মতো দেখতে, যদিও তার চেয়ে অনেক পাতলা আর মসৃণ।

আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমেছে, তাই শীতটাও খানিকটা বেড়েছে। তবে মেঘ ঘন নয়, তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় আমাদের গাড়ি ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হলের উদ্দেশে রওনা দিল।

ক্লার্কস হোটেলটা শহরের ভিতরেই। এসে অবধি হোটেলের বাইরে যাওয়া হয়নি। গাড়ি যখন শহর ছেড়ে নির্জন পাহাড়ি পথ ধরল তখন প্রথম সিমলা পাহাড়ের বরফে ঢাকা ঠাণ্ডা থমথমে মেজাজটা ধরতে পারলাম। রাস্তার এক পাশ দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে— কোনও সময় বাঁয়ে, কোনও সময় ডাইনে। একদিকে খাড়াই, একদিকে খাদ। রাস্তা বেশি চওড়া নয়, কোনও রকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। পাহাড়ের গায়ে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে ঘন ঝাউ বন।

প্রথম চার মাইল রাস্তা দিব্যি কুড়ি-পঁচিশ মাইল স্পিডে যাওয়া সম্ভব হল, কারণ এই অংশটায় রাস্তার উপরে বরফ নেই বললেই চলে। বনের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে বরফ দেখা যায়, আর মাঝে মাঝে রাস্তার এক পাশে বা উপর দিকে চাইলে পাহাড়ের গায়ে বরফ দেখা যায়। কিন্তু এবার ক্রমে দেখছি বরফ বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ির স্পিড কমে আসছে। পাঁচ মাইলের মাথায় শুরু হল রাস্তার উপর এক হাত পুরু বরফ। তার উপরে গভীর হয়ে পড়েছে গাড়ির চাকার দাগ, সেই দাগের উপর চাকা ফেলে অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি। মাটি এত পিছল যে মাঝে মাঝে গাড়ির চাকা ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না।

নাকের ডগা আর কানের পাশটা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। লালমোহনবাবু একবার বললেন তাঁর কানে তালা লেগে গেছে, আরেকবার বললেন তাঁর নাক বন্ধ হয়ে আসছে। আমি অবিশ্যি নিজের শরীর নিয়ে একদম মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি খালি ভাবছি, কী অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছি আমরা! এ এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ থাকার কোনও মানেই হয় না। এখানে শুধু থাকবে বরফের

দেশের রকমারি পাখি আর পোকামাকড়। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হচ্ছে—এ রাস্তা মানুষের তৈরি, রাস্তার বরফের উপর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে একটু আগেও গাড়ি গেছে, অনেকদিন থেকেই যাচ্ছে, অনেকদিন ধরেই যাবে। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের অনেক আগেই এখানে মানুষ না এলে এমন আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের দেখাই হত না।

এই অদ্ভুত তুষাররাজ্য দিয়ে আরও মিনিট কুড়ি চলার পর হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা দেখলাম 'ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল'। এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের জার্নিটা শেষ হয়ে যাবে সেটা ভাবতেই পারিনি।

আরও কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা ফটক পড়ল যার গায়ে ধমীজার বাড়ির নামটা লেখা রয়েছে—'দি নুক।' গাড়ি ডান দিকে ঘুরে গেটের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রকাণ্ড পুরনো বিলিতি ধরনের টাওয়ার-ওয়ালা বাড়িটা দেখা গেল। বাড়ির ছাদে আর কার্নিশে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। সাহেবি মেজাজের মানুষ না হলে এরকম সময় এরকম জায়গায় এরকম বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না।

আমাদের ট্যাক্সি পোর্টিকোর নীচে গিয়ে থামল। আমরা নামতেই গরম উর্দিপরা বেয়ারা এসে ফেলুদার হাত থেকে কার্ড নিয়ে ভেতরে গেল, আর তার এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির মালিক নিজেই বেরিয়ে এলেন। 'গুড আফটারনুন মিস্টার মিটার। আপনার পাংচুয়ালিটি প্রশংসনীয়। ভেতরে আসুন, প্লিজ।'

ধমীজার ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে সাহেব বলে ভুল হয়। বর্ণনা শুনে যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারা মোটামুটি সেইরকমই। ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলে পর আমরা সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। কাঠের মেঝে ও দেয়ালওয়ালা প্রকাণ্ড ড্রইংরুম, তার এক পাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সোফায় বসার আগেই ফেলুদা তার হাতের ব্যাগটা তার আসল মালিকের হাতে তুলে দিল। ধমীজার নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাদের ভাঁওতা একেবারেই ধরতে

পারেনি।

'থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ! মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাগটাও আমি হাতের কাছেই এনে রেখেছি।'

'একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিন', ফেলুদা হালকাভাবে সাহেবি হাসি হেসে বলল।

ধমীজাও হেসে 'ওয়েল, ইফ ইউ সে সো,' বলে ঢাকনাটা খুলল। তারপর জিনিসপত্র আলতোভাবে ঘেঁটে বলল, 'সব ঠিক আছে—কেবল এই খবরের কাগজগুলো আমার নয়।'

'আপনার নয়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। সে ইতিমধ্যে কাগজগুলো ধমীজার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে।

'না। অ্যান্ড নাইদার ইজ দিস।' ধমীজা কালকা স্টেশন থেকে কেনা সুপুরি ভরা কোডাকের কৌটোটা ফেলুদাকে দিয়ে দিল। 'বাকি সব ঠিক আছে।'

'ওঃ হো', ফেলুদা বলল, 'ওগুলো বোধহয় ভুল করে আপনার বাক্সে চলে গেছে।'

যাক—তা হলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ধমীজার সঙ্গে ওই পাথরের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা হলে ওই কৌটো কী করে গেল ওই বাক্সের মধ্যে?

'অ্যান্ড হিয়ার ইজ মিস্টার লাহিড়ীজ ব্যাগ।'

ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর থেকে দীননাথবাবুর ব্যাগটা ফেলুদার হাতে চলে এল। ধমীজা হেসে বললেন, 'আপনি যে কথাটা আমাকে বললেন, আমিও আপনাকে সেটা বলতে চাই—একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটা দেখে নিন।'

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার লাহিড়ী কেবল একটা জিনিসের জন্যেই একটু ভাবছিলেন—একটা এনটারো-ভায়োফর্মের শিশি—'

'ইটস দেয়ার। রয়েছে বাক্সের ভেতর', বললেন মিস্টার ধমীজা।

'—আর একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল কি?'

'ম্যানুস্ক্রিপ্ট?'

ফেলুদা বাক্সটা খুলেছে। ঘাঁটবার দরকার নেই, পাঁচ হাত দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর মধ্যে কোনও খাতা জাতীয় কিচ্ছু নেই।

ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে। সে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

'কী ম্যানুস্ক্রিপ্টের কথা বলছেন আপনি?' ধমীজা প্রশ্ন করল।

ফেলুদা এখনও চুপ। আমি বুঝতে পারছিলাম তার মনের অবস্থাটা কী। হয় মিস্টার ধমীজাকে মুখের ওপর চোর বলতে হয়, আর না হয় সুড়সুড়িয়ে ওই খাতা ছাড়া বাক্স নিয়েই থ্যাঙ্ক ইউ বলে চলে আসতে হয়।

ধমীজাই কথা বলে চললেন—'আই অ্যাম ভেরি সরি মিস্টার মিটার, কিন্তু আমি প্রথম যখন গ্র্যান্ড হোটেলে আমার ঘরে বাক্সটা খুলি, তখন ওতে যা ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে। খাতা তো ছিলই না, এক টুকরো কাগজও ছিল না। আমি বাক্সের মালিকের ঠিকানা পাবার আশায় তন্ন তন্ন করে বাক্সের ভিতর খুঁজেছি। সিমলায় এসে এ বাক্স আমার আলমারির ভেতর চাবি বন্ধ অবস্থায় ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কোনও লোকের হাতে পড়েনি—এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।'

এ অবস্থায় আর কী করবে ফেলুদা? সে চেয়ার ছেড়ে উঠে লজ্জিত ভাব করে বলল, 'আমারই ভুল মিস্টার ধমীজা। কিছু মনে করবেন না।...আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'একটু কফি...বা চা...'

'আজ্ঞে না। থ্যাঙ্ক ইউ। আজ আসি আমরা। গুড বাই—'

আমরা উঠে পড়লাম। লেখাটা কোথায় যেতে পারে, কেন সেটা বাক্সের মধ্যে থাকবে না, সেটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল, নরেশ পাকড়াশী বলেছিলেন, দীননাথবাবুকে ট্রেনে কোনও পাণ্ডুলিপি পড়তে দেখেননি। সেটাই কি তা হলে সত্যি কথা?

দীননাথবাবু কি তা হলে লেখার ব্যাপারটা একেবারে বানিয়ে বলেছেন?

॥ ৯ ॥

ফেরার পথে অল্পক্ষণের মধ্যেই আরও অন্ধকার হয়ে এল। অথচ বেলা যে খুব বেশি হয়েছে তা নয়। ঘড়িতে বলছে চারটে পঁচিশ। তা হলে আলো এত কম কেন?

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে আকাশের দিকে চাইতেই কারণটা বুঝতে পারলাম। সাদার বদলে এখন ছাই রঙের মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? আশা করি না। এমনিতেই রাস্তা পিছল। যদিও আমরা নীচের দিকে নামছি, তার মানে এই নয় যে, আমাদের গাড়ি আরও জোরে চলবে। বরং উতরাইয়ের স্কিড করার ভয়টা আরও বেশি। ভরসা এই যে, এ সময়টা রাস্তায় গাড়ি চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে।

ফেলুদা ড্রাইভারের পাশে চুপ করে বসে আছে, তার দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে। যদিও তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও কেন জানি মনে হচ্ছে তার ভুরুটা কুঁচকোনো। বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘুরছে। হয় দীননাথবাবু না হয় ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন। ধমীজার বৈঠকখানাতেও আলমারি বোঝাই বই দেখেছি। তার পক্ষে শম্ভুচরণের নামটা জানা কি সম্ভব নয়? পঞ্চাশ বছর আগে ইংরিজিতে লেখা তিব্বতের ভ্রমণকাহিনীর উপর কি তার লোভ থাকতে পারে না? কিন্তু ধমীজার কাছেই যদি লেখাটা থাকে তা হলে ফেলুদা সেটা উদ্ধার করবে কী করে?...

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে রহস্য এখন একটার জায়গায় দুটো হয়ে গেছে—একটা হিরের, একটা শম্ভুচরণের লেখার। একা ফেলুদার পক্ষে এই দুটো জাঁদরেল রহস্যের জট ছাড়ানো কি সম্ভব?

শীত বাড়ছে। নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে বেশ। লালমোহনবাবু ওভারকোটের একটা বোতাম খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে ভক ভক করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বুমেরাঙটাও ঠাণ্ডা বরফ। অস্ট্রেলিয়ান জিনিস, শীতের দেশে কাজ করবে তো?' আমার বলার ইচ্ছে ছিল অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক জায়গায় খুবই শীত পড়ে, এমনকী বরফও পড়ে, কিন্তু সেটা আর

বলা হল না। সামনে, প্রায় একশো গজ দূরে, একটা গাড়ি উল্টো দিক থেকে এসে টেরচাভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো চেষ্টা করলে কোনওরকমে কসরত করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা বোধ হয় বেশ বিপজ্জনক হবে।

আমাদের ড্রাইভার বার বার হর্ন দিয়েও যখন কোনও ফল হল না তখন বুঝলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে।

ফেলুদা কথা না বলে স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে গাড়ি থামাতে বলল, আর ড্রাইভারও খুব সাবধানে গাড়িটাকে রাস্তার এক পাশে পাহাড়ের দিকটায় নিয়ে গিয়ে থামাল। আমরা চারজনই কাদা আর বরফে প্যাচপেচে রাস্তায় নামলাম।

চারিদিকে একটা নিঝুম ভাব। এত গাছ থাকা সত্ত্বেও একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সামনে একটা গাড়ি রয়েছে—আমাদেরই মতো একটা অ্যাম্বাসাডর—কিন্তু তার যাত্রী বা ড্রাইভার কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, কারুরই কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা খুব হিসেব করে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বরফের উপর যেখানে চাকার দাগ, সেই দাগের উপর পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি, এমন সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ চমকে গিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পা হড়কে একেবারে বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। একটা আচমকা 'ছপাৎ' শব্দই এই ভড়কানির কারণ। আমি জানি শব্দটা হয়েছে পাইন গাছের ডাল থেকে বরফের চাপড়া পিছলে মাটিতে পড়ার ফলে। এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটা শুনে সত্যিই চমকে উঠতে হয়।

লালমোহনবাবুকে কোনওরকমে হাত ধরে টেনে তুলে আমরা আবার এগোতে লাগলাম।

আরও খানিকটা এগোতেই বুঝলাম গাড়িটার মধ্যে একজন লোক বসে আছে। সামনে। ড্রাইভারের সিটে।

আমাদের ড্রাইভার বলল লোকটাকে চেনে। ট্যাক্সিটাও ওর জানা। লোকটা ওই ট্যাক্সিটার ড্রাইভার। নাম অরবিন্দ। 'উও মর গিয়া হোগা...ইয়া বেহুঁশ হো গিয়া'—আমাদের ড্রাইভার হরবিলাস

মন্তব্য করল।

ফেলুদার হাত থেকে কোটের ভিতরে চলে গেছে। আমি জানি ওখানে আছে ওর রিভলবার।

ছপাৎ!

আবার এক চাবড়া বরফ মাটিতে পড়ল কাছেই কোনও একটা গাছ থেকে। লালমোহনবাবু চমকে উঠলেও এবার আর আছাড় খেলেন না। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে আরেকবার তাকে বরফে গড়াগড়ি দিতে হল।

একটা কান-ফাটানো পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে ঠিক দু' হাত দূরে রাস্তার খানিকটা বরফ তুবড়ির মতো ফিনকি দিয়ে উঠল, আর শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারিদিকের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আমরা গাড়িটার বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। শব্দটা শোনা মাত্র ফেলুদা এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে নিয়ে গাড়িটার পাশে বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর তার পরমুহূর্তেই লালমোহনবাবু গড়াতে গড়াতে আমাদের ঠিক পাশেই হাজির হলেন। আমাদের ড্রাইভারও এক লাফে গাড়িটার পিছনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যদিও সে বেশ জোয়ান লোক, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এর আগে কখনও এরকম অবস্থায় পড়েনি।

গুলিটা এসেছে আমাদের রাস্তার ধারের খাড়াই পাহাড়টার উপরের দিক থেকে। আন্দাজে মনে হয় এখন আর আততায়ী আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, কারণ এই কালো অ্যাম্বাসাডরটা আমাদের গার্ড করে রেখেছে।

আমি এই মাটিতে মুখ থুবড়োনো অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম কী যেন একটা নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। আমার ঘাড়ে কী যেন একটা ঠাণ্ডা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। চারিদিক ঘিরে আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো বরফ পড়তে শুরু করেছে। কী অদ্ভুত সুন্দর এই বরফের বৃষ্টি! এই প্রথম জানলাম যে বরফ পড়ার কোনও শব্দ নেই। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা জিব

দিয়ে একটা সাপের মতো শব্দ করে তাকে থামিয়ে দিল।

হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা আবার ভেঙে গেল। এবার বন্দুকের শব্দ নয়, গাছ থেকে বরফ পড়ার শব্দ নয়, বরফের উপর গাড়ির চাকার শব্দ নয়। এবার মানুষের গলা।

'শুনুন মিস্টার মিত্তির!'

এ কার গলা? এ গলা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

'শুনুন মিস্টার মিত্তির—আমি আপনাদের বাগে পেয়েছি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাজেই কোনও কারসাজি দেখাবেন না। ওতে কোনও ফল তো হবেই না, বরং আপনাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে।'

চেঁচিয়ে বলা এই কথাগুলো উল্টো দিকের পাহাড়ের গা থেকে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ পরিবেশটাকে গমগমিয়ে দিল। তারপর আবার কথা শুরু হল—

'আমি আপনার কাছে শুধু একটি জিনিস চাই।'

'কী জিনিস?'—ফেলুদা উপরে পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে প্রশ্নটা করল।

'আপনি গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে সামনে আসুন। আমি আপনাকে দেখতে চাই, যদিও আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বেরিয়ে এলে তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।'

আমার কানের কাছেই একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল কিছুক্ষণ থেকে, আমি ভাবছিলাম সেটা গাড়ির ভেতর থেকে আসছে; এখন বুঝলাম সেটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর দাঁতে দাঁত লাগার ফলে।

ফেলুদা বরফ থেকে উঠে গাড়ির উল্টো দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে একটা কথা নেই। বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছে এ অবস্থায় আদেশ মানা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। ফেলুদাকে এমন বেগতিকে কখনও পড়তে হয়েছে বলে মনে পড়ল না।

'আপনার সঙ্গে যে তিনজন রয়েছে', আবার কথা এল, 'তারা যদি কোনও রকম চালাকি করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের ফল ভোগ করতে হবে—এটা যেন তারা মনে রাখেন।'

'আপনি কী চাইছেন সেটা এবার বলবেন কী?' ফেলুদা জিজ্ঞেস

করল। গাড়ির পিছনের চাকার পাশ দিয়ে ফেলুদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে উপরের দিকে চেয়ে আছে। তার সামনেই পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু বরফের ঢাল; তার উপরে রয়েছে ঝাউবন। সেই ঝাউবনের আড়াল থেকে আততায়ী কথা বলছে আর আমাদের দেখছে।

আবার কথা এল—

'আপনার রিভলভারটা বার করুন।'

ফেলুদা বার করল।

'ওটা ছুঁড়ে আপনার সামনে পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর ফেলে দিন।'

ফেলুদা ফেলল।

'আপনার কাছে কোডাকের কৌটোটা আছে?'

'আছে।'

'দেখান।'

ফেলুদা কোটের পকেট থেকে হলদে কৌটোটা বার করে তুলে ধরল।

'এবারে ওর ভেতরে যে পাথরটা ছিল সেটা দেখান।'

ফেলুদার হাত এবার কোটের বুক পকেটে চলে গেল। পাথরটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা সেটাকে দু' আঙুলের ডগায় তুলে ধরল।

কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। লোকটা নিশ্চয়ই পাথরটা দেখছে। বাইনোকুলার আছে কি ওর সঙ্গে?

'বেশ। এবার ওই কৌটোর মধ্যে ওটাকে পুরে আপনার ডান দিকে রাস্তার পাশের কালো পাথরটার উপর রেখে আপনারা সিমলা ফিরে যান। যদি মনে করেন—'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা বলে উঠল—'আপনার পাথরটা চাই তো?'

'সেটাও কি ছুঁড়ে দিতে হবে?' বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর এল।

'তা হলে এই নিন!'

ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটল যে আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন চোখে অন্ধকার দেখলাম।

ফেলুদা কথাটা বলেই তার হাতের পাথরটা সটান ছুঁড়ে দিল যেখান থেকে কথা আসছে সেইদিকে। আর তার পরেই হল এক রক্তজল-করা বীভৎস ব্যাপার। আমাদের অদৃশ্য দুশমন সেই হিরেটাকে লুফবার জন্য ঝাউগাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে সামনে আলোয় এসে বরফের একটা বিরাট চাঁই পা দিয়ে ধ্বসিয়ে টাল হারিয়ে সেই বরফের সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে রাস্তার পাশে বরফজমা নালাটার উপর এসে স্থির হলেন। গড়িয়ে আসার সময়ই অবিশ্যি তার হাত থেকে বাইনোকুলার আর রিভলভার, চোখ থেকে কালো চশমা আর থুঁতনি থেকে ছুঁচোলো নকল দাড়ি ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বরফের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ঘটনার পর আর লুকিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, তাই আমরা তিনজনেই দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ফেলুদার কাছে। আমার ধারণা ছিল যে এতটা দূর থেকে গড়িয়ে পড়ায় লোকটা মরে না গেলেও, অজ্ঞান তো হবেই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সে বরফের উপর চিত অবস্থাতেই ফেলুদার দিকে জ্বলজ্বলে কটা চোখে চেয়ে আছে, আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে।

গলাটা যে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কী? ইনি হলেন ব্যর্থ ফিল্ম অভিনেতা শ্রীঅমরকুমার, ওরফে শ্রীপ্রবীর কুমার লাহিড়ী, দীননাথ লাহিড়ীর ভাইপো।

ফেলুদা ঠাণ্ডা শুকনো গলায় বলল, 'বুঝতেই তো পারছেন প্রবীরবাবু, এখন কে কাকে বাগে পেয়েছে। কাজেই আর কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। বলুন, আপনার কী বলার আছে।'

অমরকুমারের চিত হওয়া মুখের উপর বরফের গুঁড়ো এসে পড়ছে। সে এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। আমার কাছে এখনও সব ধোঁয়াটে, কিন্তু আশা করছি প্রবীরবাবুর কথায় রহস্য দূর হবে।

ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'বেশ, আপনি না বলেন

তো আমাকেই বলতে দিন। প্রতিবাদ করার হলে করবেন।—হিরেটা আপনি পেয়েছিলেন নেপালি বাক্সটা থেকে। খুব সম্ভবত এই মহামূল্য রত্নটাই নেপালের মাতাল রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে শম্ভুচরণকে দিয়েছিলেন। নেপালি বাক্সটা আসলে সম্ভবত শম্ভুচরণের। সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধু সতীনাথ লাহিড়ীকে দিয়ে যান। সতীনাথের গুরুতর অসুখের জন্য সে হিরেটার কথা কাউকে বলতে পারেনি। এই ক'দিন মাত্র আগে হিরেটা আপনি বাক্স থেকে পান। তারপরে সেটাতে রং মাখিয়ে সুপুরি বানিয়ে কোডাকের কৌটোর তলায় আঠা দিয়ে আটকে রাখেন, আর নিরাপদ জায়গা মনে করে কৌটোটা কাকার কাছ থেকে পাওয়া বাক্সটাতে রাখেন। কিন্তু সে বাক্স যে তার পরদিন আপনার ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আসবে সেটা তো আর আপনি ভাবেননি। সেদিন আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার পর থেকেই আপনি বাক্সটা হাত করার তাল করেছেন। প্রথমে মিস্টার পুরির নাম দিয়ে ভাঁওতা টেলিফোন আর প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে গুণ্ডা লাগানো। তাতে ফল হল না দেখে আমাদের ধাওয়া করে দিল্লি আসা। কিন্তু তাতেও হল না। জনপথ হোটেলে আপনার বেপরোয়া প্ল্যানটিও মাঠে মারা গেল। তাই বাধ্য হয়েই সিমলা আসতে হল। আর তারপর আজকের এই অবস্থা!...'

ফেলুদা থামল। আমরা সবাই ফেলুদাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, এমনকী আমাদের ড্রাইভার পর্যন্ত।

'বলুন প্রবীরবাবু—আমি কি ভুল বলেছি?'

প্রবীরবাবুর উগ্র চোখে হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। অদ্ভুত ধূর্ত চাহনিতে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কীসের কথা বলছেন আপনি? কোন হিরে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। হিরেটা তো বরফের তলায় তলিয়ে গেছে, আর তার উপরে আরও বরফ জমা হচ্ছে এখন।

'কেন, এটা কি আপনি চেনেন না?'

আবার চমক লাগার পালা। ফেলুদা এবার তার বুক পকেট থেকে

আরেকটা পাথর বার করল। এই বরফ-পড়া মেঘলা বিকেলেও তার ঝলকানি দেখে তাক লেগে যায়।

'বরফের উপরে যেটা রয়েছে সেটার দাম কত জানেন? পাঁচ টাকা। আজই সকালে মিলার জেম কোম্পানি থেকে কেনা। আর এটাই হল—'

প্রবীরবাবু বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে হিরেটা ছিনিয়ে নিয়েছে!

ঠকাং!

আচমকা একটা মোক্ষম অস্ত্র প্রচণ্ড জোরে প্রবীরবাবুর মাথায় বাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিল। তার শরীরটা আবার এলিয়ে পড়ল বরফের উপর। তার হাতের মুঠো খুলে গেল। তার হাত থেকে হিরে আবার ফিরে এল ফেলুদার হাতে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাবু!'

ফেলুদার ধন্যবাদটা লালমোহনবাবুর কানে গেল কি না জানি না। তিনি এখনও তাঁর নিজেরই হাতে ধরা বুমেরাংটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

॥ ১০ ॥

অমরকুমার এখন কেঁচো। সিমলা ফেরার পথে গাড়িতেই ও সব স্বীকার করেছে। ফেলুদা অবিশ্যি ওর নিজের রিভলভারটা উদ্ধার করে নিয়েছিল, আর সেটা হাতে থাকায় প্রবীরবাবুকে দিয়ে সত্যি কথা বলাতে সুবিধে হয়েছিল। ভদ্রলোকের মাথায় বুমেরাংঙের বাড়ি মেরে আবার লালমোহনবাবুই রাস্তা থেকে খানিকটা বরফ তুলে সেখানটায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভদ্রলোকের তাতে উপকার হয়েছিল কি না জানি না। বেহুঁশ ড্রাইভারও এখন অনেকটা সুস্থ। তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানতে না পেরে শেষটায় গায়ের জোরে ঘায়েল করেন প্রবীরবাবু।

অশরীরী ছবি থেকে বাদ যাবার পর থেকেই প্রবীরবাবুর মাথাটা বিগড়ে যায়, কারণ ওর বিশ্বাস ছিল ফিল্মে অভিনয় করে ওর অনেক

পয়সা ও নাম-ডাক হবে। ব্যাগড়া দিল ওর গলার স্বর। সিধে রাস্তায় কিছু হবে না জেনে বাঁকা রাস্তার কথা ভাবেন। সেই সময় বেরোয় নেপালি বাক্স। সেই বাক্স ঘেঁটে প্রবীরবাবু পেয়ে গেলেন একটা পলকাটা পাথর। যাচাই করে দাম জেনে চোখ কপালে উঠে যায়। এবার স্বপ্ন দেখেন নিজেই ছবি প্রডিউস করে নিজেই হবেন তার হিরো, কেউ তাকে বাদ দিতে পারবে না। তার পরের যে ঘটনা, সেটা তো আমাদের জানাই।

আপাতত প্রবীরবাবুকে রাখা হয়েছে সিমলায় হিমাচল প্রদেশ স্টেট পুলিশের জিম্মায়। হিরেটা পাবার পর থেকেই ফেলুদার প্রবীরবাবুকে সন্দেহ হয়েছিল, তাই সিমলায় এসেই দীননাথবাবুকে টেলিফোন করে চলে আসতে বলে—যদিও কারণটা বলেনি। উনি কাল এগারোটার গাড়িতে এসে ভাইপো সম্বন্ধে যা ভাল বোঝেন করবেন। হিরেটা বোধহয় দীননাথবাবুরই হাতে চলে যাবে, কারণ সেটা এসেছিল তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে।

আমি সব শুনেটুনে বললাম, 'হিরের ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু শম্ভুচরণ বোসের ভ্রমণকাহিনীটা কোথায় গেল?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা হল দু' নম্বর রহস্য। দোনলা বন্দুক হয় জানিস তো? সেইরকম আমাদের এই বাক্স-রহস্যটা হল দোনলা রহস্য।'

'এই দ্বিতীয় রহস্যটার কিছু কিনারা হল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু খবরের কাগজ অ্যান্ড জলের গেলাস।'

শম্ভুনাথের খাতার রহস্যের চেয়ে ফেলুদার এই কথার রহস্যটা আমার কাছে কিছু কম বলে মনে হল না।

বাকি রাস্তাটা ফেলুদা আর কোনও কথা বলেনি।

এখন আমরা ক্লার্কস হোটেলের উত্তর দিকের খোলা ছাদে রঙিন ছাতার তলায় বসে হট চকোলেট খাচ্ছি। সবসুদ্ধ আটটা টেবিলের মধ্যে একটাতে আমরা তিনজন বসেছি, আরেকটাতে দুজন জাপানি আর আরেকটা দূরের টেবিলে বসেছেন সেই কানে তুলোওয়ালা ভদ্রলোক (এখন অবিশ্যি তাঁর কানে আর তুলো নেই)। আকাশে

মেঘ কেটে গেলেও সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আলো এমনিতেই কম। পুব দিকে পাহাড়ের গায়ে সিমলা শহর বিছিয়ে রয়েছে, শহরের রাস্তায় আর বাড়িগুলোতে একে একে আলো জ্বলে উঠছে।

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। দেখে বুঝতে পারছিলাম কী যেন ভাবছেন। অবশেষে চকোলেটে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, 'সব মানুষের মনের মধ্যেই বোধহয় একটা হিংস্রতা বাস করে। তাই নয় কি ফেলুবাবু? বুমেরাঙের বাড়িটা মারতে ভদ্রলোক যখন পাক খেয়ে পড়ে গেলেন, তখন ভেতরে একটা উত্তেজনা ফিল করছিলুম যেটাকে উল্লাস বললেও ভুল হবে না। আশ্চর্য!'

ফেলুদা বলল, 'মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে সেটা জানেন তো? আজকাল একটা থিয়োরি হয়েছে যে শুধু বাঁদর থেকে নয়, আফ্রিকার এক ধরনের বিশেষ জাতের খুনে বাঁদর থেকে। কাজেই প্রবীরবাবুর মাথায় বুমেরাঙের বাড়ি মেরে আপনার যে আনন্দ হয়েছে, সেটার জন্য আপনার পূর্বপুরুষরাই দায়ি।'

আমরা যতই বাঁদর আর বুমেরাং নিয়ে কথা বলি না কেন, আমার মন কেবল চলে যাচ্ছে শম্ভুচরণের ভ্রমণকাহিনীর দিকে। কোথায়, কার কাছে রয়েছে সেই লেখা? নাকি কারুর কাছে নেই, আর কোনওদিনও ছিল না?

শেষ পর্যন্ত আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'ফেলুদা, ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন, না দীননাথবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'দুজনের কেউই মিথ্যে বলছে না।'

'তার মানে লেখাটা আছে?'

'আছে।' ফেলুদা গম্ভীর। 'তবে সেটা ফেরত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ।'

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কাছে আছে জানো?'

'জানি। এখন সব জানি, সবই বুঝতে পারছি। তবে সে লোককে দোষী প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। তুখোড় বুদ্ধি সে লোকের। আমাকেও প্রায় বোকা বানিয়ে দিয়েছিল।'

'প্রায়?'

প্রায় কথাটা শুনে আমার ভালই লাগল। ফেলুদা পুরোপুরি বোকা

বলছে এটা ভাবাই আমার পক্ষে কষ্টকর।

'মিত্তির সাহাব—'

একজন বেয়ারা ছাদের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়ে ফেলুদার নাম ধরে ডেকে এদিক-ওদিক দেখছে।

'এই যে এখানে'—ফেলুদা হাত তুলে বেয়ারাটাকে ডাকল। বেয়ারা এগিয়ে এসে ফেলুদার হাতে একটা বড় ব্রাউন খাম দিল।

'মৈনেজার সাহাবকে পাশ ছোড় গিয়ে আপকে লিয়ে।'

খামের উপর লাল পেনসিলে লেখা—মিস্টার পি সি মিটার, ক্লার্কস হোটেল।

খামটা হাতে নিয়েই ফেলুদার মুখের ভাব কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল। সেটা খুলে ভিতরের জিনিসটা বার করতেই একটা চেনা গন্ধ পেলাম, আর ফেলুদার মুখ হয়ে গেল একেবারে হাঁ।

'এ কী—এ জিনিস—এখানে এল কী করে?'

যে জিনিসটা বেরোল সেটা একটা বহুকালের পুরনো খাতা। এরকম খাতা আমাদের দেশে আর কিনতে পাওয়া যায় না। খাতার প্রথম পাতায় খুদে খুদে মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা A Bengalee in lamaland, আর তার তলায় মাস ও সাল Shambhoo Churn Bose, June 1917.

'এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুসপ্রিন্ট!' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ভদ্রলোকের ইংরিজি শুধরে দেবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমি দেখছি ফেলুদার দিকে। ফেলুদার দৃষ্টি এখন আর খাতার উপর নেই। সে চেয়ে আছে তার সামনের দিকে। ফেলুদা কি তা হলে সত্যিই পুরোপুরি বোকা বনে গেল নাকি?

এবারে বুঝতে পারলাম ফেলুদা একটা বিশেষ কিছুর দিকে দেখছে। আমারও দৃষ্টি সেই দিকে গেল। জাপানিরা উঠে চলে গেছে। এখন আমরা ছাড়া শুধু একটি লোক ছাদে বসে আছে। সে হল এক কানে তুলোওয়ালা কালো চশমা পরা নেপালি টুপি পরা বুড়ো ভদ্রলোক।

ফেলুদা একদৃষ্টে ওই ভদ্রলোকটির দিকেই দেখছে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দিকে

এগিয়ে এলেন। আমাদের টেবিল থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে প্রথমে চশমা, আর তারপর টুপিটা খুললেন। এ চেহারা এখন চেনা যাচ্ছে, কিন্তু তাও কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে।

'ফলস টিথ পরবেন না?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সার্টেনলি!'

পকেট থেকে এক জোড়া বাঁধানো দাঁত বার করে ভদ্রলোক উপর-নীচ দু'পাটি ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার গালের তোবড়ানো চলে গেল, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, বয়স দশ বছর কমে গেল। এখন আর চিনতে কোনও কষ্ট হয় না।

ইনি হলেন ল্যানসডাউন রোডের চ্যাম্পিয়ন খিটখিটে শ্রীনরেশচন্দ্র পাকড়াশী।

'কবে করিয়েছেন দাঁত?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'অর্ডার দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন হল, হাতে এসেছে দিল্লি থেকে ফেরার পরের দিন।'

এখন বুঝতে পারলাম দীননাথবাবু কেন নরেশবাবুকে বুড়ো ভেবেছিলেন। ট্রেনে ওর ফলস টিথ ছিল না। তারপর আমরা যখন তাঁকে ল্যানসডাউন রোডে দেখেছি ততদিনে উনি দাঁত পরা শুরু করে দিয়েছেন।

ফেলুদা বলল, 'বাক্সটা যে আপনা থেকে বদলি হয়নি, ওটা যে কেউ প্ল্যান করে বদল করিয়েছে, এ সন্দেহ আমার অনেক আগে থেকেই হয়েছে। কিন্তু সেটা যে আপনার কীর্তি সেটা ভেবে বার করতে সময় লেগেছে।'

'সেটা স্বাভাবিক', নরেশবাবু বললেন, 'আমি ব্যক্তিটিও যে নেহাত মূর্খ নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।'

'একশোবার। কিন্তু আপনার গলদটা কোথায় হয়েছিল জানেন? ওই খবরের কাগজগুলো ধর্মীজার বাক্সে পোরাতে। এটা কেন করেছিলেন তা আমি জানি। পুঁথিটা থাকায় দীননাথবাবুর বাক্সের যা ওজন ছিল, ধর্মীজার বাক্স ছিল তার চেয়ে হালকা। সে বাক্স হাতে নিলে দীননাথের খটকা লাগতে পারত। তাই সেটায় কাগজ পুরে ওজনটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনে পড়া কাগজ কে

আর কষ্ট করে ভাঁজ করে বাক্সে পোরেন বলুন!'

'রাইট! কিন্তু সেইখানেই তো আপনার বাহাদুরি। অন্য কেউ হলে সন্দেহ করত না।'

'এবার একটা প্রশ্ন আছে,' ফেলুদা বলল, 'আপনি বাদে সকলেই সে রাত্রে বেশ ভাল ঘুমিয়েছিলেন, তাই না?'

'হু—তা বলতে পারেন।'

'অথচ দীননাথ সচরাচর ট্রেনে মোটেই ভাল ঘুমোন না। তাকে কি ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন?'

'রাইট!'

'জলের গেলাসে ঘুমের বড়ি গুঁড়ো করে ঢেলে দিয়েছিলেন?'

'রাইট। সেকোনাল। ওটা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। ডিনারের আগে প্রত্যেককেই খাবার জল দিয়ে গিয়েছিল, এবং ধমীজা বাদে অন্য দুজনই বাথরুমে হাত ধুতে গিয়েছিল।'

'তার মানে ধমীজাকে খাওয়াতে পারেননি?'

'উহুঁ। তার ফলে রাতটা আমার মাঠে মারা যায়। ভোর ছটায় উঠে ধমীজা দাড়ি কামায়, তারপর তার জিনিসপত্র বাক্সে রেখে বাথরুমে যায়। সেই সুযোগে আমি আমার কাজ সারি। তখনও অন্য দুজন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।'

'তবে আপনার সবচেয়ে চালাকি কোনখানে জানেন? লেখাটা হাত করার পরেও আমার আছে এসে সেটার জন্য টাকা অফার করা।'

মিস্টার পাকড়াশী হো হো করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 'সিমলা যেতে বারণ করে টেলিফোন ও কাগজে লেখা হুমকি—এও তো আপনার কীর্তি?'

'ন্যাচারেলি। প্রথম দিকে তো আমি মোটেই চাইনি আপনি সিমলা আসেন। তখন তো আপনি আমার পরম শত্রু। আমি তো ভাবছি—ফেলু মিত্তির যখন বাক্সের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমার এমন পারফেক্ট ক্রাইমটা ফাঁস হয়ে যাবে। প্লেনে পর্যন্ত আমি আপনার ওই বন্ধুটির পকেটে হুমকি কাগজ গুঁজে দিয়েছি তারপর ক্রমে, এই সিমলায় এসে, মনে হল লেখাটা আপনাকে ফেরত

দেওয়াই উচিত।'

'কেন?'

'কারণ খাতা ছাড়া বাক্স ফেরত দিলে আপনার ঘাড়েও তো খানিকটা সন্দেহ পড়ত। সেটা আমি চাইনি। আপনি-লোকটাকে তো এ ক'দিনে কিছুটা চিনেছি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, নরেশবাবু। এবারে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'লেখাটা যে ফেরত দিলেন—আপনি ইতিমধ্যে এর একটা কপি করে রেখেছেন, তাই না?'

নরেশবাবুর মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। বুঝলাম ফেলুদা একটা ওস্তাদের চাল চেলেছে। ও বলে চলল, 'আমরা যখন আপনার বাড়ি গেলাম, তখনই আপনি এটা কপি করছিলেন টাইপ করে, তাই না?'

'কিন্তু...আপনি...?'

'আপনার ঘরে একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেটা শম্ভুচরণের নেপালি বাক্সে পেয়েছি, আর আজ পাচ্ছি এই খাতাটায়।'

'কপিটা কিন্তু—'

'আমাকে বলতে দিন, প্লিজ!—শম্ভুচরণ মারা গেছেন টোয়েন্টিওয়ানে। অর্থাৎ একান্ন বছর আগে। অর্থাৎ এক বছর আগে তার লেখার কপিরাইট ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ সে লেখা আজ যে কেউ ছাপাতে পারে—তাই না?'

'আলবত পারে!' নরেশবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন। 'আপনি কি বলতে চান এটা করে আমি কিছু অন্যায় করেছি? এ তো অসাধারণ লেখা—দীননাথ কি এ লেখা কোনওদিন ছাপাত? এটা আমিই ছাপব, এবং আমার এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।'

'হস্তক্ষেপ না করলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তো?'

'তার মানে? কে করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা? কে?'

ফেলুদার ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। আরেকবার হ্যান্ডসেক করার জন্য নরেশবাবুর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—

'মিট ইওর রাইভ্যাল, মিস্টার পাকড়াশী। এই বাক্স-রহস্যের

ব্যাপারে আমি দীননাথবাবুর কাছে কেবল একটি পারিশ্রমিকই চাইব—সেটা হল এই খাতাটা।'

'বুমেরাং', বলে উঠলেন জটায়ু।

যদিও কেন বললেন সেটা এখনও ভেবে বের করতে পারিনি।

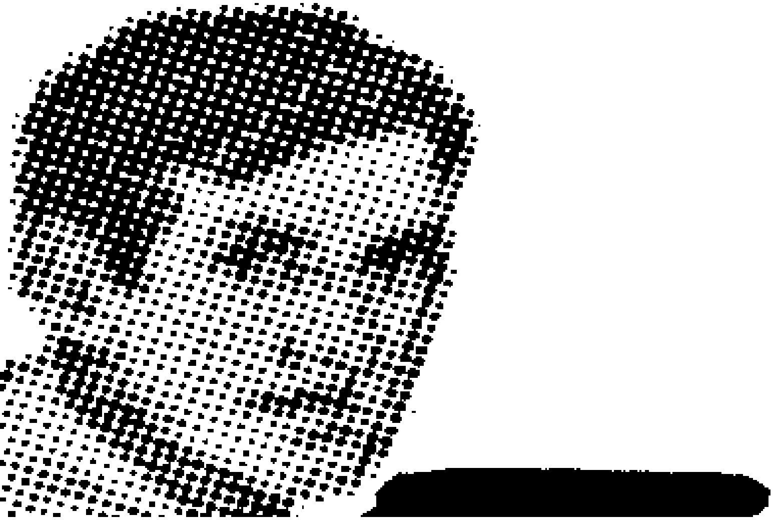

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

Pradosh C. Mitter
Private Investigator

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

॥ ১ ॥

জুন মাসের মাঝামাঝি। স্কুল ফাইনাল দিয়ে বসে আছি, রেজাল্ট কবে বেরোবে জানি না। আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক দুটো বাজতে দশ মিনিটে এমন তেড়ে বৃষ্টি নামল যে সে আশা ত্যাগ করে একটা নতুন কেনা টিনটিনের বই নিয়ে বৈঠকখানায় তক্তাপোশে বসে বেশ মশগুল হয়ে পড়ছি। টুনটুনির বই না, টিনটিনের বই। টিনটিন ইন টিবেট। বেলজিয়াম থেকে ফরাসি ভাষায় বেরোয় এই আশ্চর্য কমিক বই। তারপর পৃথিবীর নানান ভাষায় অনুবাদ হয়। এখানে আসে ইংরিজিটা। আমার আর ফেলুদার দুজনেরই মতে রহস্য রোমাঞ্চ সাসপেন্স আর হাসিতে ভরা এর চেয়ে ভাল কমিক বই আর নেই। এর আগে আরও তিনটে কিনেছি, এটা নতুন, প্রথমে আমি পড়ব, তারপর ফেলুদা। ও এখন সোফায় কাত হয়ে শুয়ে দ্য চ্যারিয়ট অফ দ্য গড্‌স বলে একটা বই পড়ছে। পড়ছে মানে, একটু আগেও পড়ছিল, এখন শেষ করে সেটা বুকের ওপর রেখে সিলিঙে ঘুরন্ত পাখাটার দিকে চেয়ে আছে। মিনিটখানেক এইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'গিজার পিরামিডে কটা পাথরের ব্লক আছে জানিস ? দুই লক্ষ।'

বেশ। জানলাম। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন পিরামিড নিয়ে পড়েছে বুঝলাম না। ফেলুদা বলে চলল, 'এই ব্লকের এক একটার ওজন প্রায় পনেরো টন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যা আন্দাজ করা যায় তার সাহায্যে দিনে দশটার বেশি ব্লক নিখুঁতভাবে পালিশ করে ঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে বসানো মিশরীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া যেখানে পিরামিড, তার ত্রিসীমানায় ওই পাথর নেই। সে পাথর আসত নৌকো করে, নাইল নদীর ওপার

থেকে। সাধারণ বুদ্ধিতেও হিসেব করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় জানিস ? ওই একটি পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল কমপক্ষে ছ'শো বছর।'

ভাববার কথা বটে। বললাম, 'এটা কি ওই বইয়ে লিখেছে ?'

'শুধু এটা নয়। প্রাচীন কালের আরও অনেক আশ্চর্য কীর্তির কথা এতে আছে যেগুলো কী করে সম্ভব হয়েছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন না, বা বলার চেষ্টাও করেন না। আমাদের দেশেই দেখ না। দিল্লিতে কুতুবমিনারের পাশে যে লৌহস্তম্ভ আছে তাতে দু হাজার বছরেও মরচে ধরেনি কেন ? ইস্টার আইল্যান্ডের নাম শুনেছিস ? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেই দ্বীপে গেলে দেখা যায়, কোন আদ্যিকালে কারা জানি পেল্লায় সব মানুষের মাথা পাথরে খোদাই করে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পাথর আছে দ্বীপের মাঝামাঝি ; মাথাগুলো এনে রাখা হয়েছে সেখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে। এক-একটার ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন। জংলি লোকে কী করে এ জিনিসটা করল ? কপি, ক্রেন, ট্রাকটর, বুলডোজার—এ সব তো তখন ছিল না !'

ফেলুদা এর মধ্যে একটা চারমিনার ধরিয়েছে। বইটা পড়ে ও যে বেশ উত্তেজিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, 'পেরুতে একটা জায়গায় মাইলের পর মাইল জুড়ে মাটির উপর জ্যামিতিক রেখা আর নকশা কাটা আছে। আদ্যিকাল থেকে সেটার কথা লোকে জানে ; প্লেন থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ কবে কেন কীভাবে সেগুলো কাটা হল তা কেউ জানে না। রহস্য এতই গভীর যে সেটা নিয়ে কেউ ভাবতেও চায় না।'

'যিনি ওই বইটা লিখেছেন তিনি ভেবেছেন বুঝি ?'

'প্রচুর ভেবেছেন ; আর ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আজ থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহ থেকে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত কোনও প্রাণী পৃথিবীতে এসে মানুষকে তাদের জ্ঞানের খানিকটা অংশ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পিরামিড ইত্যাদি হচ্ছে এই

অতিমানবীয় টেকনলজির নিদর্শন, যাকে আজকের মানুষও টেক্কা দিতে পারেনি। কুরুক্ষেত্রে যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আজকের অ্যাটমিক মারণাস্ত্রের মিল তা জানিস তো ?'

'তার মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও কি অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে—'

ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই বাধা পড়ল। এই বৃষ্টির মধ্যেই কে জানি এসে আমাদের কলিং বেলটায় পর পর তিনবার সজোরে চাপ দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হুমড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন সিধুজ্যাঠা, আর তাঁর হাতের ছাতাটা ঝপাত করে বন্ধ করতেই আরও খানিকটা জল চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল।

'কী দুর্যোগ কী দুর্যোগ একটু চা বলো তোমার ওই ভাল চা', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন সিধুজ্যাঠা। আমি এক দৌড়ে গিয়ে শ্রীনাথকে ঘুম ভাঙিয়ে তিন কাপ চা করতে বলে ফিরে এসে দেখি সিধুজ্যাঠা সোফায় বসে সাংঘাতিক ভ্রুকুটি করে টেবিলের উপরে রাখা চীনে মাটির অ্যাশট্রেটার দিকে চেয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি এই বাদলায় রিকশা না নিয়ে—'

'মানুষ খুন তো আকছার হচ্ছে ; তার চেয়েও সাংঘাতিক খুন কী জানো ?'

ফেলুদা থতমত, চুপ। আমি তো বটেই। যিনি প্রশ্নটা করেছেন তিনিই উত্তর দেবেন সেটাও জানি। সিধুজ্যাঠা বললেন, 'এ কথা সবাই মানে যে, আজকে আমাদের দেশটা উচ্ছন্নে যেতে বসলেও, এককালে অনেক কিছুই এখানে ঘটেছিল যা নিয়ে আজও আমরা গর্ব করতে পারি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার বিষয়টা কী জানো তো ? সেটা হল আমাদের শিল্পকলা, যার অনেক নমুনা আমরা আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। কেমন, ঠিক কি না ?'

'ঠিক।' ফেলুদা চোখ বুজে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'এই আর্টের মধ্যেও যেটা সেরা, সেটা হল ভারতবর্ষের মন্দির, আর তার গায়ের কারুকার্য। ঠিক কি না ?'

'ঠিক।'

সিধুজ্যাঠা জানেন না এমন বিষয় নেই। তবে তার মধ্যেও আর্টের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাঁর তিন আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারিই হল আর্টের বই। কিন্তু হুনের কথা কী বলছিলেন সেটা এখনও বোঝা গেল না।

একটা মান্ধাতি চুরুট ধরাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে দুবার কেশে একটু দম নিয়ে সিধুজ্যাঠা, বললেন, 'এককালে কালাপাহাড় ধর্ম চেঞ্জ করে হিন্দু মন্দিরের কী সর্বনাশ করে গেছে সে তো জানো। কিন্তু আজ এই উনিশশো তিয়াত্তরে আবার যে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে সেটা জানো কী?'

'আপনি কি মন্দিরের গা থেকে মূর্তি খুলে নিয়ে ব্যবসা করার কথা বলছেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'এগজ্যাক্টলি!' সিধুজ্যাঠা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এটা যে কতবড় একটা ক্রাইম সেটা ভাবতে পার? মোটিভটা এখানে ধর্মেরও নয়, শ্রেফ ব্যবসার। ধনী আমেরিকান টুরিস্টরা এইসব মূর্তি হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিনে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ ব্যাপারটা এমন গোপনে হচ্ছে যে ধরার কোনও উপায় নেই। তবে এইসব শিল্পহত্যাকারীদের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। আজ দেখলুম ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের একটা যক্ষীর মাথা গ্রান্ড হোটেলে এক আমেরিকান টুরিস্টের কাছে।'

'বলেন কী!' ফেলুদা রীতিমতো অবাক। রাজারাণী যে ভুবনেশ্বরের একটা বিখ্যাত মন্দির সেটা আমিও জানতাম। ছেলেবেলা পুরী-ভুবনেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, বাবা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লাল পাথরের মন্দির, তার গায়ে অদ্ভুত সব মূর্তি আর নকশা।

সিধুজ্যাঠা বলে চললেন, 'আমার কাছে কিছু পুরনো রাজপুত পেন্টিং ছিল, থার্টি-ফোরে কিনেছিলুম কাশীতে, সেইগুলো নিয়ে গিয়েছিলুম নগরমলকে দেখাতে। নগরমলের দোকান আছে জান তো গ্র্যান্ড হোটেলের ভেতরে?—আমার অনেক দিনের চেনা। ছবিগুলো খুলে রেখেছি কাউন্টারের উপর, এমন সময় এই মার্কিন

বাবুটি এলেন। মনে হল নগরমলের কাছ থেকে আগে কিছু জিনিসটিনিস কিনেছে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। বেশ ভারী জিনিস বলে মনে হল। মোড়কটি যখন খুললে না—বলব কী ফেলু—আমার হৃৎপিণ্ডটা একটা লাফ মেরে গলার কাছে চলে এল। একটা মূর্তির মাথা। লাল পাথরের তৈরি। আমার চেনা

মুখ, শুধু তফাত এই যে সে মুখকে ধড়ের সঙ্গে লাগা অবস্থায় দেখেছি, আর এখন দেখছি সেটাকে ছেনি দিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। আমার তো মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। নগরমল দেখে বললে জিনিসটা খাঁটি, ছাঁচ বা নকল নয়। সে মার্কিন ছোকরা বললে দু হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে কোন প্রাইভেট ডিলারের কাছ থেকে। আমি মনে মনে বললুম—যা

ভাবছি তাই যদি হয় তা হলে আরও দুটো শূন্য বাড়িয়ে দিলেও ন্যায্য দাম দেওয়া হত না। যাই হোক, সে ব্যাটা তো হোটেলে চলে গেল, আমি নিজেও ষোলো আনা শিওর হতে পারছিলুম না, তাই সোজা বাড়ি এসে জিমারের বই খুলে দেখি কী—যা ভেবেছিলুম তাই। ও মুণ্ডু খাস রাজারাণীর গা থেকে ভেঙে আনা হয়েছে। অথচ এ সব মন্দিরে সরকারি পাহারা থাকে। ঘুষ খেয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল তো ওইটেই চাবিকাঠি কিনা। আমি অবিশ্যি এর মধ্যেই ভুবনেশ্বরের আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্রেস চিঠি লিখে দিয়েছি। কিন্তু তাতেই বা কী হবে। ওই পার্টিকুলার মাথাটাকে তো আর বাঁচানো গেল না। আর মন্দির যা জখম হবার তাও হয়ে গেল।'

আমারও মনে হচ্ছিল যে এইভাবে আমাদের মন্দিরের মূর্তি ভেঙে বিদেশের লোককে বিক্রি করাটা সত্যিই একটা ক্রাইম।

শ্রীনাথ চা এনে দিয়েছে, সিধুজ্যাঠা কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভাবছি কীভাবে এর প্রতিকার হয়। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর কী করতে পারি বলো। তাই, বুঝলে ফেলু, তোমার কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, অপরাধী খুঁজে বেড়াও তুমি, এর চেয়ে বড় আর কী অপরাধ থাকতে পারে? এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি করলে হয়তো পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাতেই বা কী ভরসা? এ তো আর সোনা রুপো বা হিরেজহরত নয়, যার দামটা বাজারদর থেকে হিসেব করে নেওয়া যায়। আর্টের ভ্যালুটা অন্য রকম; সেটা সবাই বোঝে না। আমি এমনও শিক্ষিত লোক জানি যারা জোড়বাংলা মন্দির দেখে বলে ওর মধ্যে আর কী আছে, আর কাংড়া ছবি দেখে বলে এর চেয়ে হেমেন মজুমদার ভাল।'

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল। এবার বলল, 'সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের নামটা জেনেছিলেন কি?'

'জেনেছি বইকী। এই যে তার কার্ড।'

সিধুজ্যাঠা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে ফেলুদাকে দিল। উঠে গিয়ে দেখলাম তাতে নাম ছাপা

রয়েছে—সল সিলভারস্টাইন—আর তার নীচে ঠিকানা।

'ইহুদি', সিধুজ্যাঠা বললেন।—'স্টাইন দেখলেই বুঝবে ইহুদি। লোকটা ডাকসাইটে ধনী তাতে সন্দেহ নেই। হাতে একটা ঘড়ি পরেছিল তেমন ঘড়ি বাপের জন্মে দেখিনি। তারই দাম বোধহয় হাজারখানেক ডলার।'

'ভদ্রলোক কদ্দিন থাকবেন কিছু বলেছিলেন?'

'কাল সকালেই কাঠমান্ডু চলে যাচ্ছে। অবিশ্যি এখন হয়তো তাকে ফোন করলে পেতে পার।'

ফেলুদা উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। কলকাতার বেশির ভাগ জরুরি টেলিফোনের নম্বর ওর মুখস্থ। তার মধ্যে অবিশ্যি হোটেলও বাদ পড়ে না।

ফোন করে জানা গেল মিস্টার সিলভারস্টাইন তাঁর ঘরে নেই, কখন ফিরবেন কোনও ঠিক নেই। ফেলুদা যেন একটু হতাশ হয়েই ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা মূর্তিটা বিক্রি করেছিল তার অন্তত চেহারার বর্ণনাটা পেলেও একটা রাস্তা পাওয়া যেত।'

'সেটা তো আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল', সিধুজ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।—'কিন্তু কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। ভদ্রলোক আবার আমার ছবিগুলো দেখছিলেন। দেখে বললেন, তার তান্ত্রিক আর্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট, আমি সন্ধান পেলে যেন তাকে জানাই। এই বলে তার একখানা কার্ড বের করে আমার হাতে দিলে।...সত্যি, তুমি যে কীভাবে প্রোসিড করবে তা তো আমার মাথায় আসছে না।'

'দেখি, ভুবনেশ্বর থেকে কোনও খবর আসে কি না। রাজারাণীর গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে গেলে তো হই-চই পড়ে যাওয়া উচিত।'

সিধুজ্যাঠা এক চুমুকে চা-টা শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, 'বছরখানিক থেকে এ বাঁদরামির কথাটা কানে আসছিল, তবে অ্যাদ্দিন এদের নজরটা ছিল ছোটখাটো অখ্যাত মন্দিরের উপর। এখন মনে হচ্ছে এদের সাহসটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। আমার ধারণা অত্যন্ত বেপরোয়া ও শক্তিশালী কিছু লোক রয়েছে এই কেলেঙ্কারির

পেছনে। ফেলু যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে পার তো দেশ তোমাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

সিধুজ্যাঠা চলে যাবার পর ফেলুদা গ্র্যান্ড হোটেলে রাত এগারোটা পর্যন্ত বার বার ফোন করেও সেই আমেরিকানকে ধরতে পারল না। শেষবারের বার ফোনটা রেখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'সিধুজ্যাঠা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়—সত্যিই যদি ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা আমেরিকানদের হাতে চলে গিয়ে থাকে—তা হলে ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায়; আর যে লোক এই পাচারের কাজটা করেছে সে নিঃসন্দেহে একটা পয়লা নম্বরের ক্রিমিন্যাল। খারাপ লাগে ভাবতে যে আমার পক্ষে এগোনোর কোনও রাস্তা নেই। কোনওই রাস্তা নেই।'

রাস্তা একটা বেরিয়ে গেল। পরদিনই। আর সেটা বেরোল এমন একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে ভাবলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে।

॥ ২ ॥

দুর্ঘটনার কথা বলার আগে আরেকটা জরুরি কথা বলা দরকার। সিধুজ্যাঠার আন্দাজ যে ঠিক সেটা পরদিনের আনন্দবাজারেই জানা গেল। আমিই প্রথম পড়লাম খবরটা—

মস্তকহীন যক্ষী

ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের গাত্র থেকে একটি যক্ষীমূর্তির মস্তকাংশ অপহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের প্রহরীটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ওড়িশার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এ ব্যাপারে পুলিশি তদন্তের আয়োজন করেছে বলে জানা গেল।

খবরটা পড়ে ফেলুদাকে বললাম, 'তার মানে পাহারাদারই মাথাটা চুরি করেছে?'

ফেলুদা তার ফরহ্যানসের টিউবটা টিপে আধ ইঞ্চি পেস্ট বার করে ব্রাশের উপর চাপিয়ে বলল, 'এ চুরি কি আর পাহারাদারে করে? গরিব লোকের অত সাহস হয় না। চুরি করেছে ভদ্রলোকে। সে মোটা ঘুষ দিয়েছে প্রহরীকে, প্রহরী তাই আপাতত গা ঢাকা দিয়েছে।'

সিধুজ্যাঠা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছে। আমার মন বলছিল যে তাঁর আন্দাজ ঠিক হয়েছে জেনে তিনি নিশ্চয়ই সদর্পে সেটা ঘোষণা করতে আসবেন। শেষ পর্যন্ত এলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা চার ঘণ্টা পরে, সাড়ে দশটার সময়। আজ বিষ্যুদবার, নটা থেকে আমাদের বাড়ির বিজলি বন্ধ হয়ে গেছে, এদিকে আকাশে মেঘ করে গুমোট হয়ে রয়েছে, বৈঠকখানায় বসে ঘামছি, এমন সময় দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। দরজা খুলতেই আবার সেই হুমড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকা, চায়ের হুকুম, আর পরক্ষণেই ধপ করে সোফায় বসা। ফেলুদা ভুবনেশ্বরের কথাটা উচ্চারণ করতেই তিনি এক দাবড়ানিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও সব ছাড়ো। ওগুলো ফালতু কথা। রেডিয়ো শুনেছ?'

'কই না তো। আসলে আজ—'

'জানি। বিষ্যুদবার। অথচ তাও একটা ট্রানজিস্টার কিনবে না। যাকগে...সাংঘাতিক খবর। কাঠমাণ্ডুর প্লেন ক্র্যাশ করেছে। কলকাতার কাছেই। এক ঘণ্টা ডিলে ছিল। সাড়ে সাতটায় মাটি ছেড়েছে, ফিফ্‌টিন মিনিটসের মধ্যে ক্র্যাশ করেছে। ঝড়ে পড়েছিল। বোধহয় ফিরে আসবার চেষ্টা করছিল। কাল সারারাত কীরকম ঝোড়ো বাতাস ছিল সে তো জানই। আটান্নজন যাত্রী, অল ডেড। মার্কিন ব্যাঙ্কার সল সিলভারস্টাইন তার মধ্যে ছিলেন সে কথা রেডিয়োতে বলেছে।'

খবরটা শুনে আমরা দুজনেই একেবারে থ। ফেলুদা বলল—'কোথায় ক্র্যাশ করেছে? জায়গার নাম বলেছে?'

'সিদিংপুর বলে একটা গ্রামের পাশে। হাসনাবাদের দিকে।

ফেলু, মনে মনে প্রার্থনা করছিলুম সে মূর্তি যেন দেশ ছেড়ে না যায়। সে প্রার্থনা যে এমনভাবে মঞ্জুর হবে তা কি আর জানতুম?'

ফেলুদা হাতের রিস্টওয়াচের দিকে দেখল। সে কি সিদিকপুর যাওয়ার মতলব করছে না কি?

সিধুজ্যাঠারও কেমন যেন তটস্থভাব। বললেন, 'আমি যা ভাবছি, তুমিও নিশ্চয় সেই কথাই ভাবছ। প্লেন মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সপ্লোশন হয়। যাত্রীর সঙ্গে তার ভেতরের জিনিসপত্রও চারদিকে ছিটকে পড়ে। যেমন সব ক্র্যাশেই হয়। সেই জিনিসপত্রের মধ্যে যদি......'

ফেলুদা দু মিনিটের মধ্যে ঠিক করে ফেলল যে প্লেন যেখানে ক্র্যাশ করেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে যক্ষীর মাথাটা পাওয়া যায় কি না। তিন ঘণ্টা হল ক্র্যাশটা হয়েছে, যেতে লাগবে ঘণ্টা দেড়েক। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এয়ারলাইনের লোক, দমকল, পুলিশ ইত্যাদি সেখানে গিয়ে তাদের কাজকর্ম খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে। ওখানে গিয়ে কী দেখতে পাবে জানি না; তবু যাওয়া দরকার। সুযোগ যখন আপনাআপনিই এসে পৌঁছেছে তখন সেটার সদ্ব্যবহার না করার কোনও মানে হয় না।

সিধুজ্যাঠা বললেন, 'ছবিগুলো বিক্রি করে আমার হাতে কিছু কাঁচা টাকা এসেছে। আমি তার থেকে কিছুটা তোমাকে দিতে চাই। আফটার অল, আমার কথাতেই তো তোমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সুতরাং—'

'শুনুন, সিধুজ্যাঠা', ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকে এসেছে ঠিকই, কিন্তু আমি যদি নিজে এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ না করতাম তা হলে এগোতাম না। আমি কাল রাত্রে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, আর যত ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে, আপনার কথাটা ষোলো আনা সত্যি। দেশের মন্দিরের গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে যারা বিদেশিদের বিক্রি করে, তাদের অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই।'

'ব্রাভো!' সিধুজ্যাঠা চেঁচিয়ে উঠলেন। —'তবে একটা কথা বলে রাখি। আর্থিক না হলেও, অন্যরকম হেলপ তোমার লাগতে

পারে। হয়তো আর্টের ব্যাপারে কোনও তথ্য জানার দরকার হতে পারে। তার জন্য আমার কাছে আসতে দ্বিধা কোরো না। যদি সম্ভব হয়, তুমি নিজেও একটু আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করে ফেলো—তা হলে উৎসাহটা আরও বেশি পাবে।'

ঠিক হল মাথাটা যদি পাওয়া যায় তা হলে সেটা সোজা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসা হবে। কে চুরি করেছিল সেটা জানা না গেলেও, অন্তত চোরাই জিনিসটা তো উদ্ধার হবে।

ঝড়ের স্পিডে তৈরি হয়ে নিয়ে একটা হলদে ট্যাক্সিতে চেপে আমরা যখন সিন্দিকপুরের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন ঠিক এগারোটা বাজতে পাঁচ। ফিরতে হয়তো বেলা হবে, এদিকে খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই—আমাদের বাড়িতে একটার আগে খাওয়া হয় না—তাই ঠিক হল ফেরার পথে যশোহর রোডে কোনও একটা পাঞ্জাবি দোকানে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওদিক দিয়ে লরি যাতায়াত করে। লরির লোকেরা এইসব দোকানে খায়। রুটি, মাংস, তড়কা—দেখলেই জিভে জল আসে। ফেলুদাকে দেখেছি ও সবরকম খাওয়াতে অভ্যস্ত। ওর দেখাদেখি আমিও সেই অভ্যাসটা করে নিতে চেষ্টা করছি।

কলকাতার ভিড় ছাড়িয়ে ভি আই পি রোডে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর দমদম ছাড়াবার কিছু পরেই মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল। হাসনাবাদ কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল। যশোহর রোড দিয়েই যেতে হয়। আমাদের ড্রাইভার বললেন রাস্তা পিছল না থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতেন। —'ওদিকে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে জানেন তো স্যার? রেডিয়োতে বলল।'

ফেলুদা যখন বলল যে ওই ক্র্যাশের জায়গাতেই আমরা যাচ্ছি, তখন ভদ্রলোক ভারী উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনার রিলেটিভ কেউ ছিল নাকি স্যার প্লেনে?'

'আজ্ঞে না।'

ফেলুদার পক্ষে ব্যাপারটা খুলে বলা মুশকিল, অথচ ড্রাইভারবাবুর কৌতূহল মেটে না।

'সব তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেচে শুনলাম। কিছু কি আর দেখতে পাবেন গিয়ে?'

'দেখা যাক।'

'আপনি কোনও সাংবাদিক-টাংবাদিক বোধহয়?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'গপ্পো-টপ্পো লিখি আর কী।'

'অ। দেখে-টেখে সব নোট-টোট করে পরে বইয়ে-টইয়ে লাগিয়ে দেবেন।'

বারাসত ছাড়িয়ে মাইল দশেক যাবার পর থেকেই আমরা মাঝে মাঝে থেমে রাস্তার লোকের কাছ থেকে সিদিকপুরের নির্দেশ নিচ্ছিলাম। শেষটায় একটা বাজার টাইপের জায়গায় এসে একটা সাইকেলের দোকানের সামনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই তারা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল যে আর দু মাইল গেলেই বাঁ দিকে একটা কাঁচা রাস্তা পড়বে, সেটা ধরে মাইল খানেক গেলেই সিদিকপুর। এদের হাবভাবে বোঝা গেল এরা অনেককেই আগে রাস্তা বাতলে দিয়েছে।

কাঁচা পথটা একেবারেই গেঁয়ো। মাঝে মাঝে জল জমেছে, আর নানারকম টায়ারের দাগ পড়েছে কাদার উপর। ভাগ্যে এটা জুন মাস, সবে বর্ষা পড়েছে। আর এক মাস পরে হলেই এ রাস্তা দিয়ে আর গাড়ি যেত না। আজ সকালের বৃষ্টিটা যে এদিকেও হয়েছে সেটা মাঠঘাটের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই শান্ত পাড়াগাঁয়ের মাঝখানে একটা ফকার ফ্রেন্ডশিপ জেট প্লেন ক্র্যাশ করেছে ভাবতেও অবাক লাগছিল। ইতিমধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে পর পর তিনখানা অ্যাম্বাসাডর মেন রোডের দিকে চলে গেল। পায়ে হাঁটা লোকও কিছু পথে পড়ল—কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরছে।

সামনে একটা মোড়ের মাথায় একটা বটগাছের ধারে বেশ

ভিড়। একটু এগিয়ে কয়েকটা গাড়ি ও একটা জিপ রাস্তার ধারে দাঁড় করানো রয়েছে। আমাদের ট্যাক্সি সেই গাড়িগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্র্যাশের কোনও চিহ্ন নেই, তাও বুঝতে পারলাম এখানেই আমাদের নামতে হবে। ডানদিকে কিছু দূরে একটা গাছপালায় ভর্তি জায়গা, তারও কিছু দূরে বাঁদিকে একটা গ্রামের ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম সেটাই নাকি সিদিকপুর। ক্র্যাশের জায়গা কোথায় জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনে। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন।'

আমাদের ড্রাইভার (নামটা জেনে গেছি—বলরাম ঘোষ) গাড়িতে চাবি দিয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে ক্র্যাশ দেখতে। আমরা মাঠের মধ্যে হাঁটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে যেটাকে বন বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে আট-দশটা বড় বড় আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ ছাড়া আর কিছুই না। সেগুলো পেরিয়েই একটা কলা বাগান, আর সেইখানেই যত কাণ্ড।

গাছের মধ্যে যেগুলো এখনও নেড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো সব ঝলসে কালো হয়ে গেছে। ডানদিকে কিছু দূরে একটা নেড়া গাছ, ফেলুদা বলল সেটা শিমুল। তার বড় বড় ডালগুলো যেন তলোয়ারের কোপে কেটে ফেলা হয়েছে, আর যা দাঁড়িয়ে আছে তা পুড়ে ছাই। সমস্ত জায়গাটা লোকজন পুলিশ এয়ারপোর্টের কর্মচারীতে ভরে আছে, আর তাদের আশেপাশে প্রায় একশো গজ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফকার ফ্রেন্ডশিপের ভগ্নাবশেষ। এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, ওইদিকে আবার থুবড়োনো নাকের খানিকটা। তা ছাড়া ভাঙাছেঁড়া ফাটাফুটো দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া আধপোড়া সিকিপোড়া কত কী যে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। একটা অদ্ভুত কড়া গন্ধে চারিদিকটা ছেয়ে রয়েছে যেটার জন্য আমার নাকে রুমাল দিতে হল। ফেলুদা জিভ দিয়ে ছিক করে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল, 'যদি আর ঘণ্টাখানেক আগেও আসতে পারতাম!'

আসলে, পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে, তাই কাছে যাবার কোনও উপায় নেই।

আমরা অগত্যা ঘেরাও-করা জায়গাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। পুলিশ মাটি থেকে জিনিস তুলে তুলে দেখছে। কোনওটাই আস্ত নেই, তবে ভাঙা বা আধপোড়া অবস্থাতেও অনেক জিনিস দিব্যি চেনা যাচ্ছে। একটা স্টেথোস্কোপের কানে দেবার অংশ, একটা ব্রিফ কেস, জলের ফ্লাস্ক, একটা বোধহয় হ্যান্ডব্যাগের আয়না—যেটা একটা পুলিশ হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়ার ফলে তার থেকে রোদের ঝিলিক বেরোচ্ছে।

আমাদের ডান দিকে ক্র্যাশের জায়গা, আমরা তার পাশ দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁ দিকের একটা আমগাছের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

একটা ছেলে গাছের একটা নিচু ডালের উপর উঠে বসেছে, তার হাতে একটা কালসিটে পড়া সু-জুতো, যেটা নিশ্চয়ই চামড়ার ছিল, আর যেটা নিশ্চয়ই ছেলেটা এই জঞ্জালের মধ্যে থেকেই পেয়েছে।

ফেলুদা ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

'তোরা অনেক জিনিস পেয়েছিস এই জঞ্জাল থেকে, না রে ?'

ছেলেটা চুপ। সে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে।

'কী হল ? বোবা নাকি ?'

ছেলেটা তাও চুপ। ফেলুদা 'হোপলেস' বলে এগিয়ে চলল ক্র্যাশের জায়গা ছেড়ে গ্রামের দিকে। বলরামবাবুর কৌতূহল আবার চাগিয়ে উঠেছে। বললেন, 'আপনি কিছু খুঁজছেন নাকি স্যার ?'

'একটা লাল পাথরের মূর্তি', ফেলুদা জবাব দিল,—'শুধু মাথাটা।'

'শুধু মাথাটা......হুঁ......' বলে বলরামবাবু দেখি এদিক ওদিক ঘাসের উপর খোঁজা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের তলায় একটা বাঁশের মাচা ; তার উপর তিনজন আধবুড়ো বসে তামাক খাচ্ছে। যে সবচেয়ে বুড়ো সে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল,

'আপন্যারা কোত্থিকে আয়লেন ?'

'কলকাতা। খুব জোর বেঁচে গেছে আপনাদের গ্রামটা!'

'হাঁ তা গ্যাচে বাবু। আল্লার কৃপা ঘর-বাড়ি ভাঙেনি মানুষজন মরেনি—বাছুর একটা বাঁধা ছিল করিমুদ্দির সেডা মোরেচে আর আলম শ্যাখের—'

'আগুন লাগল কখন ?'

'মাটিতে য্যামন পড়ল অমনি য্যামন বোম ফাটার শব্দ ত্যামন শব্দ আর দাউ দাউ করে আগুন আর ধোঁয়া গোটা গেরামটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া। আর তারপর অ্যালো বৃষ্টি, দমকল অ্যালো—'

'দমকল আসা অবধি আগুন জ্বলছিল ?'

'আগুন নেভেছে বৃষ্টির জলে।'

'আপনি কাছাকাছি গিয়েছিলেন আগুন নেভার পর ?'

'আমি বুড়ো মানুষ আমার অতো কী গরজ...'

'ছেলে ছোকরারা যায়নি? ওখান থেকে জিনিসপত্তর তুলে নেয়নি ?'

বুড়ো চুপ। অন্য দুজনও উসখুস করছে। ইতিমধ্যে আট দশজন ছেলে জড়ো হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। ফেলুদা তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কী রে ?'

ছেলেটি ঘাড় কাত করে বলল, 'আলি।'

'এদিকে আয়।'

ফেলুদা নরম সুরে কথা বলছিল বলেই বোধ হয় ছেলেটা এগিয়ে এল।

ফেলুদা তার কাঁধে হাত দিয়ে গলাটা আরও নামিয়ে বলল, 'ওই ভাঙা প্লেনটা থেকে অনেক জিনিস ছড়িয়ে বাইরে পড়েছিল, জানিস তো ?'

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা লাল পাথরের তৈরি মেয়ে মানুষের মাথা ছিল। কুমোর যেমন মাথা গড়ে, সেইরকম মাথা।'

'এই ও জানে।'

আলি আরেকজন ছেলের দিকে দেখিয়ে দিল। ফেলুদা একেও জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কী রে ?'

'পানু।'

ফেলুদা বলল, 'আর কী নিয়েচিস তা আমার জানার দরকার নেই ; মাথাটা ফেরত দিলে তোকে আমি বকশিশ দেব।'

পানুর মুখেও কথা নেই।

'বাবু জিজ্ঞেস করচে জবাব দে—', তিন বুড়োর এক বুড়ো ধমক দিয়ে উঠল।

'ওর কাছে নেই।'

কথাটা বলল পানুরই বয়সী, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আরেকটি ছেলে।

'কোথায় গেল ?' চাবুকের মতো প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'আরেকজন বাবু এসেচিল, তিনি চাইলেন, তাকে দিয়ে দিয়েচে।'

'সত্যি কথা ?' ফেলুদা পানুর কাঁধ ধরে প্রশ্ন করল। আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। শেষে পেয়েও ফসকে যাবে যক্ষীর মাথা ? পানু এবার মুখ খুলল।

'একজন বাবু এলেন যে গাড়ি করে একটুক্ষণ আগে।'

'কীরকম গাড়ি ?'

'নীল রঙের !'—তিন চারটি ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল।

'কীরকম দেখতে বাবু ? লম্বা ? রোগা ? মোটা ? চশমা পরা ?...'

ছেলেদের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, প্যান্ট শার্ট পরা, রোগাও না মোটাও না ফরসাও না কালোও না, বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ; আমরা এসে পৌঁছানোর আধ ঘণ্টা আগে এসে একে তাকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে পানুর কাছ থেকে সামান্য কিছু বকশিশ দিয়ে একটা লাল পাথরের তৈরি মানুষের মাথা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। তার নীল রঙের গাড়ি।

আমরা যখন গ্রামের পথ দিয়ে গাড়িতে করে আসছিলাম তখন উলটো দিক থেকে একটা নীল রঙের অ্যাম্বাসাডরকে আমাদের

গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

'চল তোপ্‌সে—আসুন বলরামবাবু!'

খবরটা শুনে ফেলুদা যদি হতাশও হয়ে থাকে, সে ভাবটা যে সে এর মধ্যে কাটিয়ে উঠে আবার নতুন এনার্জি পেয়ে গেছে সেটা তার ট্যাক্সির উদ্দেশে দৌড় দেখেই বুঝলাম। আমরাও দুজনে ছুটলাম তার পিছনে। কী আছে কপালে কে জানে!

॥ ৩ ॥

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার ফিরে চলেছি। দেড়টা বেজে গেছে, কিন্তু খাওয়ার কথা মনেই নেই। যশোহর রোডে পড়ে বলরামবাবু একবার বলেছিলেন, 'চা খাবেন নাকি স্যার? গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে......' ফেলুদা সে কথায় কান দেয়নি। বলরামবাবুও বোধহয় ব্যাপারটায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে আর চায়ের কথা বলেননি।

গাড়ি পঁচাত্তর কিলোমিটার স্পিডে ছুটে চলেছে, আর আমি ভাবছি কী অল্পের জন্যেই না মাথাটা ফসকে গেল। সকালে যদি লোডশেডিংটা না হত, আর রেডিয়োর খবরটা যদি ঠিক সময়ে শুনতে পেতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়তো আমরা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে ছুটে চলেছি। কিংবা হয়তো সোজা ভুবনেশ্বর। মন্দিরের গায়ে ভাঙা মূর্তি আবার জোড়া লেগে যেত, আর ফেলুদা তার জোরে হয়তো পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী হয়ে যেত।

এই এক ঘন্টার রোদেই রাস্তা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মনে মনে ভাবছি বলরামবাবু আরেকটু স্পিড তুললে পারেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ায় পালস রেট-টা ধাঁ করে বেড়ে গেল।

একটা গাড়ি-মেরামতের দোকানের সামনে একটা নীল অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে আছে।

বলরামবাবু যে সিদ্দিকপুরের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছিলেন সেটা তার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম।—'গাড়ি থামাব স্যার?'

'সামনের চায়ের দোকানটায়', ফেলুদা চাপা গলায় জবাব দিল।

বলরামবাবু স্টাইলের মাথায় মেরামতির দোকানের দুটো দোকানের পরে ট্যাক্সিটাকে রাস্তার ডানদিকে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁ-ষ করে ব্রেক কষলেন। ফেলুদা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তিন কাপ চা অর্ডার দিল। কাপ তো নয়, কাচের গেলাস।

'আর কী আছে ভাই ?'

'বিস্কুট খাবেন ? ভাল বিস্কুট আছে।'

কাচের বোয়ামের মধ্যে গোল গোল নানখাটাই-টাইপের বিস্কুট, ফেলুদা তারই দুটো করে দিতে বলল।

আমার চোখ নীল অ্যাম্বাসাডরের দিকে। পাংচার সারানো হচ্ছে। একটি ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, মাঝারি রং, বয়স চল্লিশ-টল্লিশ, ঘন ভুরু, ঘন হাতের লোম, কানের পাশ দিয়েও বোধহয় লোম বেরিয়েছে, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। গাড়ির পাশে ছটফট ভাব করে পায়চারি করছেন আর ঘন ঘন টান দিচ্ছেন আধপোড়া সিগারেটে। বাঙালি কি ? কথা না বললে বোঝার উপায় নেই।

চা তৈরি হচ্ছে। ফেলুদা চারমিনার বার করে একটা মুখে পুরে পকেট চাপড়ে দেশলাই না-পাওয়ার ভান করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। আমি আমাদের ট্যাক্সির কাছেই রয়ে গেলাম। দুই গাড়ির মধ্যে তফাত বিশ-পঁচিশ হাত। বলরামবাবুর আড়চোখ নীল গাড়ির দিকে।

'এক্সকিউজ মি, আপনার কাছে কি...'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে জ্বালিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'থ্যাঙ্কস্ !' ফেলুদা ধোঁয়া ছাড়ল। 'টেরিবল ব্যাপার !'

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

'আপনি তো ক্র্যাশের ওখানে গিয়েছিলেন', ফেলুদা বলল। —'আপনার গাড়িটা যেন আসতে দেখলাম...... ?'

'ক্র্যাশ ?'

'আপনি জানেন না ? কাঠমাণ্ডুর প্লেন......সিদিকপুরে......'

'আমি টাকি থেকে আসছি।'

টাকি হল হাসনাবাদের কাছেই একটা শহর।

আমরা কি তা হলে ভুল করলাম? গাড়ির নম্বরটা যদি দেখে রাখতাম তা হলে খুব ভাল হত।

'আর কতক্ষণ লাগবে হে? ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন মেরামতির লোকটাকে।

'এই হয়ে গেল স্যার। পাঁচ মিনিট।'

চায়ের দোকান থেকে বলরামবাবু হাঁক দিয়ে জানালেন চা রেডি। ফেলুদা নীল গাড়ি ছেড়ে আমাদের হলদে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। হাতে গেলাস নিয়ে তিনজনে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসার পর ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'ভিনাই করছে। ডাহা মিথ্যেবাদী।'

আমি বললাম, 'কিন্তু নীল অ্যাম্বাসাডর তো আরও অনেক আছে। এ রংটা তো খুব কমন, ফেলুদা।'

'লোকটার জুতোয় এখনও কালো ছাইয়ের দাগ লেগে আছে। তোর নিজের স্যান্ডালটার দিকে চেয়ে দেখেছিস একবার?'

সত্যিই তো! স্যান্ডেলের রংটাই বদলে গেছে স্ট্র্যাপের জায়গায় গিয়ে। আর ওই ভদ্রলোকেরও তাই। ব্রাউন জুতোয় কালোর ছোপ।

ফেলুদা যে ইচ্ছে করেই ধীরে সুস্থে বিস্কুট খাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট পরে অন্য গাড়িটা সুস্থ অবস্থায় মেরামতির দোকান থেকে বেরিয়ে যশোহর রোড দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। আর তার পরমুহূর্তেই আমাদের গাড়িও ধাওয়া করল তার পিছনে। দুটোর মাঝখানে বেশ অনেকখানি ফাঁক, কিন্তু ফেলুদা বলল সেই ভাল; লোকটার সন্দেহ উদ্রেক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দমদমের কাছে এসে হঠাৎ আরেক পশলা বৃষ্টি নামল। সামনে সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, ভাল দেখা যাচ্ছে না, তাই বলরামবাবুকে বাধ্য হয়েই স্পিড বাড়িয়ে নীল গাড়ির আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে পড়তে হল। ভদ্রলোক বেশ রসিক; বললেন, 'হিন্দি ফিলিমের মতন মনে হচ্ছে স্যার। সেদিন শত্রুঘনের একটা বইয়ে দেখলুম

এইভাবে গাড়ির পেছনে গাড়ি ফলো করছে। অবিশ্যি সেখানে পেছনের গাড়িটা একটা পাহাড়ের গায়ে ক্র্যাশ করল।'

ফেলুদা বলল, 'একদিনে একটা ক্র্যাশই যথেষ্ট। আপনি স্টেডি থাকুন। কলকাতায় পাহাড় না থাকলেও—'

'কী বলচেন স্যার! থার্টিন ইয়ারস গাড়ি চালাচ্ছি—এখনও পর্যন্ত একটিও নট এ সিঙ্গল অ্যাক্সিডেন্ট।'

'ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রি ফোর নাইন', ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল। আমিও নম্বরটা মাথায় রেখে দিলাম, আর বার বার 'পাঁতিচান...পাঁতিচান...পাঁতিচান' আওড়ে নিলাম। এটা আর কিছুই নয়—পাঁচ তিন চার আর ন'য়ের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি। নম্বর মনে রাখার দুতিন রকম উপায় ফেলুদা শিখিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে এটা একটা।

বলরামবাবু সত্যিই বাহাদুর ড্রাইভার, কারণ কলকাতার ট্রাফিকে ভরা গিজগিজে রাস্তা দিয়েও ঠিক নীল গাড়িকে সামনে রেখে চলেছেন। কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা কে জানে।

'মূর্তিটা নিয়ে কী করবে বলো তো লোকটা?' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে।

'ভুবনেশ্বরে ফেরত নিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। যে জাতের ধুরন্ধর, তাতে মনে হয় আবার আরেকজন বিদেশি খদ্দের জোগাড় করার চেষ্টা করবে। একই জিনিস উপরো-উপরি দুবার বিক্রি করার এমন সুযোগ তো চট করে আসে না।'

নীল গাড়ি শেষ পর্যন্ত দেখি আমাদের পার্ক স্ট্রিটে এনে ফেলেছে। পুরনো গোরস্থান ছাড়িয়ে, লাউডন স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিটের মোড় ছাড়িয়ে শেষে গাড়ি দেখি হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কুইনস ম্যানসনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

'যাব স্যার?'

'আলবৎ।'

আমাদের ট্যাক্সিও গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা; তার মাঝখানে একটা পার্ক, আর চারদিকে ঘিরে রয়েছে পাঁচ-ছ'তলা উঁচু সব বাড়ি। পার্কের চারদিকে গাড়ি পার্ক

করা রয়েছে, তার মধ্যে আবার দু-একটা স্কুটারও রয়েছে। আমাদের ডান দিকে কুইন্‌স ম্যানসন। আমরা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম, নীল গাড়ি কিছু দূরে একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল। আমরা গাড়ির ভিতরে বসে আছি কী হয় দেখার জন্য।

ভদ্রলোক একটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে নামলেন, দরজার কাচ তুললেন, দরজা লক করলেন, তারপর ডান দিকে গিয়ে একটা বড় দরজা দিয়ে কুইন্‌স ম্যানসনে ঢুকে গেলেন।

এক মিনিট অপেক্ষা করে ফেলুদাও ট্যাক্সি থেকে নামল আমি তার পিছনে। সোজা চলে গেলাম সেই দরজার দিকে। একটা ঘড় ঘড় শব্দ আগেই কানে এল ; গিয়ে দেখি দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা আদ্যিকালের লিফ্‌ট, সেটা সবেমাত্র নীচে নেমেছে। ঝটপটাং শব্দ করে লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল দরজা খুলে বুড়ো লিফটম্যান খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা হঠাৎ একটা ব্যস্ততার ভাব করে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার সেনগুপ্ত এইমাত্র ওপরে গেলেন না?'

'সেনগুপ্ত কৌন্?'

'এইমাত্র যিনি ওপরে গেলেন?'

'আভি উ গিয়া পাঁচ নম্বরকা মিস্টার মল্লিক। সেনগুপ্তা ইহা কোই নেহি রহ্‌তা।'

'ও। আমারই ভুল।'

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট। মিস্টার মল্লিক। এগুলো মনে রাখতে হবে। ফেলুদা খাতা আনেনি ; বাড়ি গিয়ে নোট করে নেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু বাড়ি ফিরতে যে এখনও দেরি সেটা একটু পরেই বুঝলাম। ফেলুদা বলরামবাবুকে ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দিল, ভদ্রলোক যাবার সময় একটা স্লিপ দিয়ে বলে গেলেন, 'এটা আমার পাশের বাড়ির টেলিফোন, আপনি বললে আমায় ডেকে দেবে। দরকার-টরকার পড়লে একটু খবর দেবেন স্যার। একঘেয়ে কাজের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে...।'

পার্ক স্ট্রিট থানার ও সি মিস্টার হরেন মুৎসুদ্দির সঙ্গে ফেলুদার আলাপ ছিল। দু বছর আগে হ্যাপি-গো-লাকি বলে একটা রেসের ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে মারার রহস্য ফেলুদা আশ্চর্যভাবে সমাধান

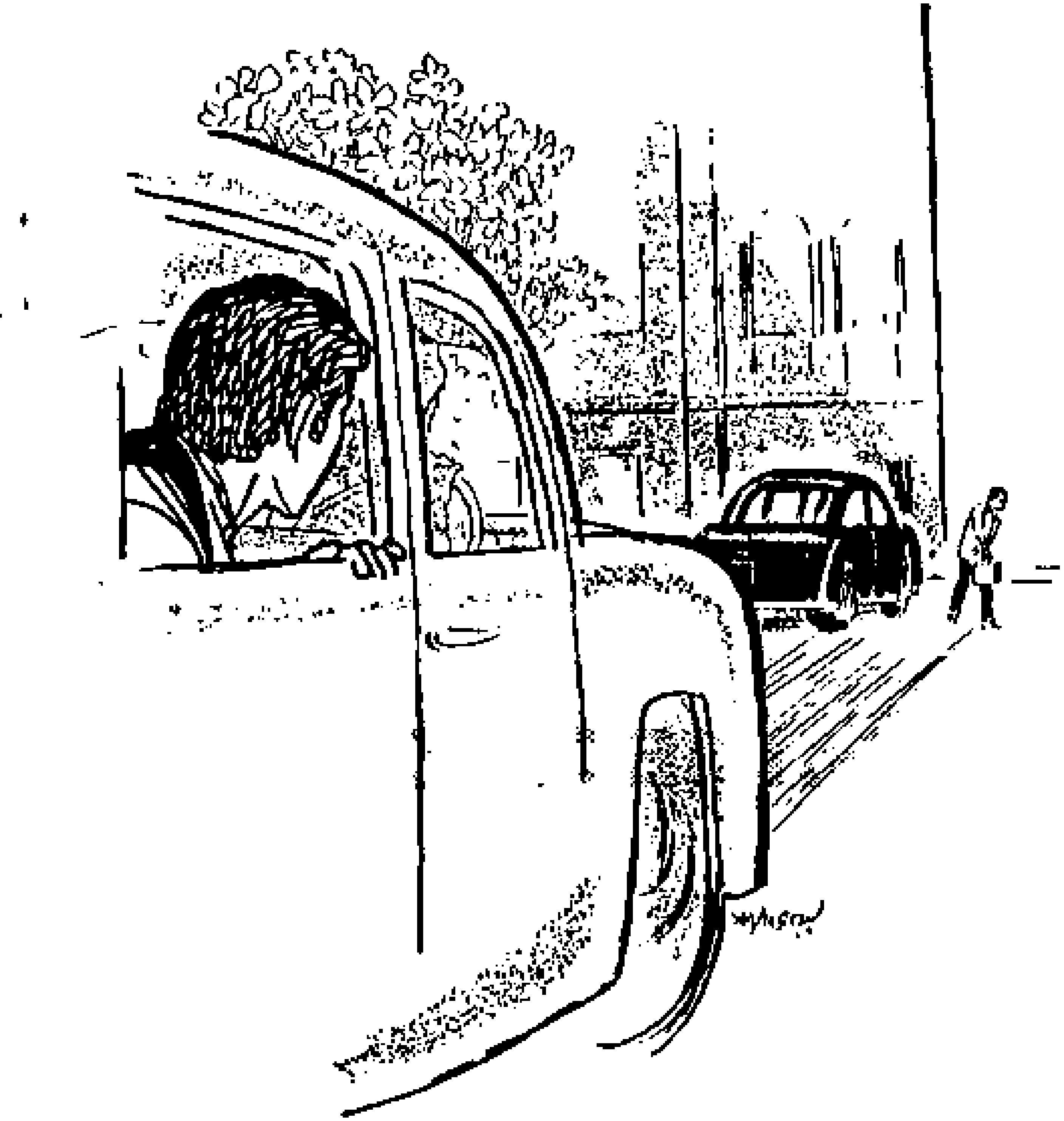

করেছিল ; তখনই মুৎসুদ্দির সঙ্গে আলাপ হয়'। আমরা এখন তাঁর আপিসে। ভদ্রলোক মূর্তি চুরির খবরটা কাগজে পড়েছেন। ফেলুদা সেইখান থেকে শুরু করে আজকের পুরো ঘটনাটা তাঁকে বলে বলল, 'যদ্দূর মনে হয় এই মল্লিক চুরির ব্যাপারটা নিজে না করলেও, চোরাই মাল উদ্ধার করে সেটাকে পাচার করার ভারটা নিজেই নিয়েছে। তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইনফরমেশন, আর একটি লোক তার পিছনে রাখা—এই দুটো অনুরোধ করতে আমি এসেছি। তার কার্যকলাপের দিকে একটু নজর রাখা দরকার। মিস্টার মল্লিক, পাঁচ নম্বর কুইন্স ম্যানসন, নীল অ্যাম্বাসাডর, নম্বর ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রি ফোর নাইন।'

মুৎসুদ্দি এতক্ষণ একটা পেনসিল কানের মধ্যে গুঁজে বসেছিলেন, এবার সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'হবে। আপনি যখন বলছেন তখন হবে। একটা স্পেশাল কনস্টেবল লাগিয়ে দিচ্ছি, সে ওকে চোখে চোখে রাখবে। আর আমাদের ফাইলে যদি কিছু থাকে তাও দেখছি। থাকবেই যে এমন কোনও কথা নেই, যদি না লোকটা এর আগে কোনও গণ্ডগোল করে পুলিশের নজরে এসে থাকে।'

'ব্যাপারটা খুব আর্জেন্ট কিন্তু। মূর্তি আবার বেহাত হলেই মুশকিল।'

মুৎসুদ্দি মুচকি হেসে বললেন, 'কেন, মুশকিল কেন ? আমরা তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটি না, মিস্টার মিত্তির। আপনি একা ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা কি আর রিফিউজ করব ? আমরা আছি কীসের জন্য ? পাবলিককে হেলপ করার জন্যেই তো ? তবে একটা কথা বলি—একটা অ্যাডভাইস, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড—এই সব র‍্যাকেটের পেছনে মাঝে মাঝে এক একটা দল থাকে—গ্যাং—এবং তারা বেশ পাওয়ারফুল হয়। গায়ের জোর বলছি না। পয়সার জোর। পোজিশনের জোর। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকেরা যখন নোংরা কাজে নামে, তখন সাধারণ ক্রিমিন্যালদের চেয়ে তাদের বাগে আনা অনেক বেশি শক্ত হয়, জানেন তো ? আপনি ইয়াং, ট্যালেন্টেড, তাই আপনাকে এগুলো

বলছি—নইলে আর আমার কী মাথাব্যথা বলুন !......’

ওয়ালডর্ফে চীনে খাবার অর্ডার দিয়ে ফেলুদা ম্যানেজারের ঘর থেকে কুইনস ম্যানসন পাঁচ নম্বরে একটা টেলিফোন করে, হ্যালো শুনেই ফোনটা রেখে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, ‘লোকটা এখনও ঘরেই আছে।’

আমরা বাড়ি ফিরলাম পৌনে তিনটেয়। চারটের কিছু পরে মিস্টার মুৎসুদ্দির টেলিফোন এল। প্রায় পাঁচ মিনিট কথা হল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা তার খাতায় নোট করে নিল। তারপর আমি না জিজ্ঞেস করতেই আমার কৌতূহল মিটিয়ে দিল। —

‘লোকটার পুরো নাম জয়ন্ত মল্লিক। দিন পনেরো হল কুইন্‌স ম্যানসনে এসে রয়েছে। ফ্ল্যাটটা আসলে মিস্টার অধিকারী বলে একজন ভদ্রলোকের। ইনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক রেস্টোরেন্টের মালিক। বোধহয় মল্লিকের বন্ধু। অধিকারী এখন দার্জিলিঙে। তার অবর্তমানে মল্লিক ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করছে। গাড়িটাও অধিকারীর। সেই গাড়ি করেই মল্লিক আজ তিনটে নাগাদ গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর আবার ভিতরে ঢোকে। দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে করে ডালহৌসি যায়। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য মুৎসুদ্দির লোক ওকে হারিয়ে ফেলে, তারপর ফেয়ারলি প্লেসে রেলওয়ে বুকিং আপিসের বাইরে গাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে দেখে, মল্লিক কিউয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে। এখান থেকে মনমড, সেখান থেকে আওরঙ্গাবাদ। সেকেন্ড ক্লাসের রিজার্ভ টিকিট। আরও খবর থাকলে পরে টেলিফোন করবে।’

‘আওরঙ্গাবাদ যাচ্ছে ?’ আমি জায়গাটার নামই শুনিনি।

‘আওরঙ্গাবাদ’, ফেলুদা বলল। ‘আর আমরা এখন যাচ্ছি সর্দার শঙ্কর রোড, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বোসের বাড়ি। একটা কনসালটেশনের দরকার।’

॥ ৪ ॥

‘আওরঙ্গাবাদ !’

সিধুজ্যাঠার চোখ কপালে উঠে গেল।—‘এ যে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি ! জায়গাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ ফেলু ? আওরঙ্গাবাদ হল এলোরায় যাবার ঘাঁটি। মাত্র বিশ মাইলের পথ, চমৎকার রাস্তা। আর এলোরার মানে বুঝতে পারছ তো ? এলোরা হল ভারতের সেরা আর্টের ডিপো ! পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা কৈলাসের মন্দির—যা দেখে মুখের কথা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আর তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে লাইন করে দেড় মাইল জায়গা জুড়ে আরও তেত্রিশটা গুহা—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—তার প্রত্যেকটা মূর্তি আর কারুকার্যে ঠাসা। আমার তো ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে !......কিন্তু প্লেন থাকতে ট্রেনে যাচ্ছে কেন লোকটা ?’

‘সম্ভব মনে হয়, মূর্তিটা ও হাতের কাছে রাখতে চাইছে। প্লেনে গেলে সিকিউরিটি চেক-এর ব্যাপার আছে। হাতের ব্যাগ খুলে দেখে পুলিশ। ট্রেনে সে ঝামেলা নেই।’

আওরঙ্গাবাদের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমারও গলা শুকিয়ে গেল। ফেলুদা হাতের ঘড়ির দিকে দেখে তড়াক করে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল।

‘কী ঠিক করলে ?’ সিধুজ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমাদের প্লেনেই যেতে হবে।’

সিধুজ্যাঠা যে ভাবে ফেলুদার দিকে চাইলেন তাতে বুঝলাম গর্বে ওঁর বুকটা ভরে উঠেছে। মুখে কিছু না বলে তক্তপোশ থেকে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা চটি বই বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এটা তোমায় হেল্প করবে। ভাল করে একবারটি পড়ে নিয়ো।’

বইটার নাম ‘এ গাইড টু দ্য কেভস অফ এলোরা।’

ফেলুদা বাড়ি এসেই জুপিটার ট্রাভেলসের মিস্টার বকসীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল আগামী কাল সকালের বম্বে ফ্লাইটে

টিকিট আছে কি না ; ওর তিনটে সিট দরকার। তিনটে শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সিধুজ্যাঠাও যাবেন নাকি সঙ্গে ? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও শুধু বলল, 'দলে আরেকটু ভারী হলে সুবিধে হয়।'

বকসী বললেন, 'এমনিতে জায়গা নেই, তবে ওয়েটিং লিস্টে ভাল পোজিশন। আমি টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি। আপনারা সকালে সাড়ে পাঁচটা মধ্যে এয়ারপোর্টে এসে যাবেন। মনে হয় হয়ে যাবে।'

সকালের ফ্লাইট নটার মধ্যে বম্বে পৌঁছে যাবে ; তারপর সেখান থেকে সাড়ে বারোটার সময় আরেকটা প্লেন ছেড়ে দেড়টায় আমাদের আওরঙ্গাবাদ পৌঁছে দেবে। এই পরের টিকিটটাও জুপিটার করে দেবে, আর করে দেবে আমাদের আওরঙ্গাবাদ ও এলোরায় থাকার ব্যবস্থা। আমরা পৌঁছে যাব কালই, মানে শনিবার, আর মল্লিক পৌঁছবেন রবিবার।

বুকিং-এর ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুদা আরেকটা নম্বর ডায়াল করছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি নাম্বার ওয়ান জনপ্রিয় রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। ফেলুদা যেন ভূত দেখেছে এমন ভাব করে রিসিভারটা রেখে দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য—এই মুহূর্তে আপনার নম্বর ডায়াল করছিলাম !'

জটায়ু তার ভাঁজ করা প্লাস্টিকের রেনকোটটা টেবিলের উপর রেখে সোফায় বসে পড়ে বললেন, 'তা হলে আমার সঙ্গে আপনার একটা টেলিপ্যাথেটিক যোগ রয়েছে বলুন। আমারও ক'দিন থেকেই আপনার কথা মনে হচ্ছে।'

কথাটা আসলে হবে টেলিপ্যাথিক, কিন্তু লালমোহনবাবুর ইংরিজি ওইরকমই। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে ; দেখে মনে হল বই লিখে বেশ দু' পয়সা রোজগার হচ্ছে।

'বেশ করে একটু লেবুর সরবত করতে বলুন তো আপনার সারভেন্টটিকে—বড্ড গুমোট করেছে। আর ফ্রিডিজেয়ার থেকে যদি একটু বরফ দিয়ে দেয়...'

সরবতের অর্ডার দিয়ে ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

'খুব ব্যস্ত নাকি ? নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন ?'

'হাত দিলে কী আর এখানে আসতে পারি ? ছক কেটিচি। খুব জমবে বলে মনে হয়। ভাল ফিলিম হয়। অবিশ্যি হিন্দি প্যাটার্নের। পাঁচখানা ফাইট আছে। বেলুচিস্তানের ব্যাকগ্রাউন্ডে ফেলিচি আমার হিরো প্রখর রুদ্রকে। আচ্ছা—অর্জুন মেরহোত্রাকে কেমন মানায় বলুন তো হিরোর পার্টে ? অবিশ্যি আপনি যদি অ্যাকটিং করতে রাজি হন তা হলে তো—'

'আমি হিন্দি জানি না। যাই হোক, আপাতত আমাদের সঙ্গে আসুন—কৈলাসটা ঘুরে আসি। ফিরে এসে না হয় বেলুচিস্তানের কথা ভাববেন।'

'কৈলাস ! সে কী মশাই—আপনার কি তিব্বতে কেস পড়ল না কী ? সেখানে তো শুনিচি চীনেদের রাজত্ব।'

'কৈলাস পাহাড় নয়। কৈলাস মন্দির। এলোরার নাম শুনেছেন ?'

'ও হো হো, তাই বলুন। তা সে তো শুনিচি সব মন্দির আর মূর্তি-টূর্তির ব্যাপার। আপনি হঠাৎ পাথর নিয়ে পড়লেন কেন ? আপনার তো মানুষ নিয়ে কারবার।'

'কারণ, কতগুলো মানুষ ওই পাথর নিয়ে একটা কারবার ফেঁদে বসেছে। বিশ্রী কারবার। সেটা বন্ধ করা দরকার।'

লালমোহনবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সব শুনেটুনে লালমোহনবাবুর গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে কী সব লিখেটিখে নিয়ে বললেন—

'এ এক নতুন খবর দিলেন আপনি। এই সব পাথরের মূর্তির এত দাম ? আমি তো জানতুম হিরে পান্না চুনি—এই সব হল দামি পাথর। যাকে বলে প্রেশাস স্টোনস। কিন্তু এও তো দেখছি কম প্রেশাস নয়।'

'আরও বেশি প্রেশাস। চুনি পান্না পৃথিবীতে হাজার হাজার আছে, ভবিষ্যতে সংখ্যায় আরও বাড়বে। কিন্তু কৈলাসের মন্দির বা

সাঁচির স্তূপ বা এলিফ্যান্টার গুহা—এ সব একটা বই দুটো নেই। হাজার দু' হাজার বছর আগে আমাদের আর্ট যে হাইটে উঠেছিল সে হাইটে ওঠার কথা আজকের আর্টিস্ট ভাবতেই পারে না। সুতরাং সে যুগের আর্ট দেশে যা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যারা তাকে নষ্ট করতে চায় তারা ক্রিমিন্যাল। আমার মতে ভুবনেশ্বরের যক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে। যে করেছে তার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।'

লালমোহনবাবুকে তাতাবার জন্য এ-ই যথেষ্ট। এমনিতেই ভদ্রলোকের নতুন দেশ দেখার শখ, তার উপর ফেলুদার সঙ্গে একজন অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করা—সব মিলিয়ে ভদ্রলোক ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ট্রেনের টাইম, জামা-কাপড় কী নিতে হবে, মশারি লাগবে কি না, সাপের ওষুধ লাগবে কি না ইত্যাদি জেনে নিয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'আমার আরও এক্সাইটেড লাগছে কেন জানেন তো ? কৈলাস নামটার জন্য। কৈলাস—কই লাশ বুঝতে পারছেন তো ?'

ক'দিনের জন্য যাচ্ছি জানা নেই, তবে দিন সাতেকের বেশি হবে না আন্দাজ করে প্যাকিং সেরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। ফেলুদাকে প্রায়ই তদন্তের ব্যাপারে বাইরে যেতে হয়, তাই ওর একটা আলাদা সুটকেশে কিছু জরুরি জিনিস আগে থেকেই প্যাক করে রেডি করা থাকে। তার মধ্যে ওষুধপত্র, ফার্স্ট-এড বক্স, মেক-আপ বক্স, বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ক্যামেরা, ইস্পাতের তৈরি পঞ্চাশ ফুট টেপ, একটা অল-পারপাস নাইফ, নানারকম সরু সরু তার—যা দিয়ে দরকার হলে চাবি ছাড়াই তালা-টালা খোলা যায়, একটা নিউম্যান কোম্পানির ব্র্যাডশ—তা রেল-প্লেন-বাসের টাইম টেবল, একটা রোড ম্যাপ, একটা লম্বা দড়ি, এক জোড়া হান্টিং বুট। এতে জায়গা যে খুব একটা বেশি নেয় তা নয়; তাই একই স্যুটকেসে ওর বাকি জিনিসও ধরে যায়। জামা-কাপড় বেশি নেয় না। এককালে পোশাকের শখ ছিল, এখন কমে গেছে। সিগারেট খাওয়াও দিনে বিশটা থেকে দশে নেমে

গেছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর চিরকালই যত্ন। যোগব্যায়াম করে, একগাদা খায় না, তবে নতুন গুড়ের সন্দেশ বা খুব ভাল মিহিদানা পেলে সংযমের তোয়াক্কা রাখে না।

ফেলুদার কাছে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো চটি বই ছিল, তার মধ্যে এবার যেগুলো লাগতে পারে তার কয়েকটা নিয়ে আমি উলটেপালটে দেখে নিলাম। দশটা নাগাদ শোবার আগে ফেলুদা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল, আর যদি কোনও কারণে অ্যালার্ম না বাজে তাই ওয়ান সেভেন থ্রিতে টেলিফোন করে সকালে চারটের সময় ঘুম ভাঙিয়ে দেবার কথা বলে দিল।

তার ঠিক দশ মিনিট বাদে মিস্টার মুৎসুদ্দির কাছ থেকে ফোন এল। বললেন, মল্লিক বম্বে থেকে একটা ট্রাঙ্ক কল পেয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। মল্লিক যে কথাগুলো বলে তা হল এই—'মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে গেছে। বাপ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বিশ পঁচাত্তর।' তাতে বম্বের লোক ইংরিজিতে বলে, 'ক্যারি অন। বেস্ট অফ লাক।'

আমি কথাগুলোর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। সেটা ফেলুদাকে বলাতে ও বলল, 'তোর মধ্যমনারায়ণ তেলের দরকার হয়ে পড়েছে।'

ভাগ্যিস এই তেলের ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, তা না হলে এটারও মানে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হত। মধ্যমনারায়ণ তেল মাথায় লাগালে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয় আর বুদ্ধি বাড়ে।

বম্বের প্লেন সাড়ে ছটায় না ছেড়ে ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। বেশ কয়েকটা ক্যানসেলেশন ছিল, তাই আমাদের জায়গা পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছিলেন লালমোহনবাবু। এটা বোধ হয় দ্বিতীয়বার। এবার দেখলাম টেক-অফের সময় দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে সেই বিশ্রী ব্যাপারটা আর করলেন না। কিন্তু প্রথম দিকটা যখন আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন প্লেনটা বেশ ধড়ফড় করছিল, আর

লালমোহনবাবুর অবস্থা আরও অনেকেরই মতো বেশ শোচনীয় বলে মনে হচ্ছিল। একবার একটা বড় রকম ঝাঁকুনির পর ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে বললেন, 'এ যে মশাই চিৎপুর রোড দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়িতে করে চলছি বলে মনে হচ্ছে। নাটবল্টু সব খুলে আসছে না তো?'

আমি আর ফেলুদা দুটো পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম, আর লালমোহনবাবু বসেছিলেন প্যাসেজের ওদিকে ফেলুদার ঠিক পাশেই। ব্রেকফাস্ট খাবার কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক একবার ফেলুদার

দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁত-খড়কের ইংরিজি কী মশাই?' তারপর সেটা জেনে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই বোতাম টিপে এয়ার হোস্টেসকে ডাকিয়ে এনে, 'এক্সকিউজ, টুথপিক প্লিজ' বলে খড়কে

আদায় করে নিলেন। তারপর ঘণ্টা খানেক পরে বম্বে সম্বন্ধে একটা বুকলেট পড়তে পড়তে বললেন, 'অ্যাপোলোটা আবার কীরকম বাঁদর মশাই?'

ফেলুদা এলোরার গাইড বুকটা চোখের সামনে থেকে নামিয়ে বলল, 'বাঁদর নয়, বন্দর। পোর্ট।'

'ও, পোর্ট! তা হলে ইংরিজিতে পোর্ট লিখলেই হয়, বান্দার লেখার কী দরকার? হুঁ!'

আমরা তিনজনের কেউই আগে বম্বে যাইনি। পশ্চিমে সবচেয়ে দূরে গেছি রাজস্থানের জয়সলমীর। এবার এমনিতে বম্বেতে থাকার কথা নয়, তবে ফেলুদা বলেছে এলোরায় সব ঠিক ভাবে উতরে গেলে ফিরবার পথে দু-তিনদিন বম্বে থেকে আসবে। ওর এক কলেজের বন্ধু ওখানে থাকে, গ্ল্যাক্সো কোম্পানিতে কাজ করে, সে অনেকদিন থেকেই নেমতন্ন করে রেখেছে।

প্লেন ল্যান্ড করার আগে যখন বেল্ট বাঁধতে বলছে, তখন আমি ফেলুদাকে একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। বললাম, 'মল্লিকের কাছে আসা টেলিফোনের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে?'

ফেলুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কী রে—তুই ওটা সত্যিই বুঝিসনি?'

'উঁহু।'

'মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। মেয়ে হল যক্ষীর মাথা, শ্বশুরবাড়ি হল সিলভারস্টাইন—যে মাথাটি কিনেছিল, আর বাপের বাড়ি হল মল্লিক—যার কাছে মাথাটা ছিল।'

বুঝিয়ে দিলে সত্যিই জলের মতো সোজা। বললাম, 'আর বিশ-পঁচাত্তর?'

ওটা ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড। ম্যাপ খুলে দেখবি ওটা আওরঙ্গবাদে পড়ছে।'

স্যান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে নামলাম দশটার সময়। আড়াই ঘণ্টা পরে আবার প্লেন ধরতে হবে, তাই শহরে যাবার কোনও মানে হয় না—যদিও আকাশ থেকে শহরের গম্‌গমে চেহারা দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্টের বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে রেস্টোরান্টে ভাত আর মুরগির কারি খেয়ে আওরঙ্গাবাদ যাবার প্লেনে উঠলাম পৌনে একটায়। মাত্র এগারোজন যাত্রী। ফেলুদা বলল এটা টুরিস্ট সিজন নয় তাই এত কম লোক। আওরঙ্গাবাদে যারা যায় তারা অনেকেই নাকি অজন্তা-এলোরা দেখতেই যায়।

এবার আমি আর লালমোহনবাবু পাশাপাশি, আর প্যাসেজের উলটো দিকে ফেলুদা, আর তার পাশে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক—তার চোখে মোটা কালো চশমা, নাকটা খাঁড়ার মতো লম্বা আর ব্যাঁকা, আর চওড়া কপালের পিছন দিকে একরাশ কাঁচাপাকা ঢেউ খেলানো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। আওরঙ্গাবাদের খুদে এয়ারপোর্টে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। হত না, কিন্তু তাঁর নাকি গাড়ি আসার কথা ছিল, আসেনি, তাই উনি আমাদের সঙ্গে এয়ারলাইনসের বাসে শহরে এলেন। বাঙালি বলে মনে হয়নি, তাই যখন ফেলুদার সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন তখন বেশ অবাক লাগল।

'কোথায় উঠছেন?' ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'আওরঙ্গাবাদ হোটেল।'

'আমিও তাই।...এদিকে কী? বেড়াতে?'

'হ্যাঁ, সেইরকমই। আপনি?'

'আমি এলোরা নিয়ে একটা বই লিখছি। আগে আরেকবার গেছি, এটা দ্বিতীয়বার। ইন্ডিয়ান আর্ট হিস্ট্রি পড়াই মিশিগানে।'

'ছাত্রদের উৎসাহ আছে?'

'আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজকাল তো ইন্ডিয়ার দিকেই চেয়ে আছে ওরা। বিশেষত ইয়াং জেনারেশন।'

'বৈষ্ণব ধর্মের খুব প্রভাব শোনা যাচ্ছে?' ফেলুদা একটু ঠাট্টার সুরেই প্রশ্নটা করেছিল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হরেকৃষ্ণর কথা বলছেন তো? জানি। তবে ওরা কিন্তু খুব সিরিয়াস। মাথা মুড়িয়ে ফোঁটা কেটে ধুতির কোঁচাটা দুলিয়ে কেমন খোল করতাল বাজান দেখেছেন তো? চোখে না দেখে দূর থেকে শুনলে খাঁটি কীর্তনের দল বলে ভুল হবে...'

এয়ারলাইনস আপিসের পাশেই আওরঙ্গাবাদ হোটেল, পৌঁছতে লাগল মাত্র পনেরো মিনিট। ছোট হোটেল, তবে থাকার ব্যবস্থা বেশ ভাল। খাতায় নামটাম লিখিয়ে আমরা দুজন গেলাম এগারো নম্বর ঘরে, লালমোহনবাবু চোদ্দয়। ফেলুদা স্যান্টাক্রুজ থেকে একটা বম্বের কাগজ কিনেছিল, রেস্টোরান্টে খাবার সময় ওটা পড়তে দেখেছিলাম। এবার ঘরে এসে চেয়ারে বসে মাঝখানকার একটা পাতায় কাগজটা খুলে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'ভ্যান্ডালিজম্ মানে জানিস?' পরিষ্কার না জানলেও, আবছা আবছা জানতাম। গুণ্ডামি ধরনের কোনও ব্যাপার কি? ফেলুদা বলল, 'পঞ্চম শতাব্দীতে যে বর্বর জাতি রোম শহরকে ধ্বংস করেছিল তাদের বলত ভ্যান্ডাল্‌স। সেই থেকে ভ্যান্ডালিজম বলতে বোঝায় কোনও সুন্দর জিনিসকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা।'

কথাটা বলে ফেলুদা কাগজটা আমার হাতে দিল। তাতে খবর রয়েছে—'মোর ভ্যান্ডালিজম্'। তার নীচে বলছে—মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে বিংশ শতাব্দীর কান্ডারিয় মহাদেও মন্দিরের গা থেকে একটা মেয়ের মূর্তির মাথা কে বা কারা যেন ভেঙে নিয়ে গেছে। বরোদার এক আর্ট স্কুলের চারজন ছাত্র মন্দিরটা দেখতে গিয়েছিল, তারাই নাকি প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করে। গত এক মাসে এই নিয়ে নাকি তিনবার এই ধরনের ভ্যান্ডালিজমের খবর জানা গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই মূর্তির টুকরোগুলোকে নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে।

আমি খবরটা হজম করার চেষ্টা করছি এমন সময় ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'যদ্দূর মনে হয়—অক্টোপাস একটাই। তার শুঁড়গুলো ভারতবর্ষের এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে এ-মন্দির ও-মন্দির থেকে মূর্তি সরাচ্ছে। যে-কোনও একটা শুঁড়কে জখম করতে পারলেই সমস্ত শরীরটা ধড়ফড় করে উঠবে। এই জখম করাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য।'

॥ ৫ ॥

আরওরঙ্গাবাদ ঐতিহাসিক শহর। আবিসিনিয়ার এক ক্রীতদাস—নাম মালিক অম্বর—ভারতবর্ষে এসে তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে ক্রমে আমেদনগরের রাজার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। তিনিই খাড়কে নামে একটা শহরের পত্তন করেন, যেটা আওরঙ্গজেবের আমলে নাম পালটে হয়ে যায় আওরঙ্গাবাদ। মোগল আমলের চিহ্ন ছাড়াও এখানে রয়েছে প্রায় তেরোশো বছরের পুরনো আট-দশটা বৌদ্ধ গুহা—যার ভেতরে দেখবার মতো কিছু মূর্তি রয়েছে। যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আজ আলাপ হল, তিনি বিকেলে আমাদের সঙ্গে আরেকটু বেশি ভাব জমাতে আমাদের ঘরে এসেছিলেন। এক সঙ্গে চা খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন, এই সব গুহার মূর্তির সঙ্গে নাকি এলোরার মূর্তির খানিকটা মিল আছে। 'আপনারা কাল যদি সময় পান একবার দেখে আসবেন।' আজ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে; কাল সকালে দিন ভাল থাকলে আমরা সেই গুহাগুলো, আর তার কাছেই আওরঙ্গজেবের রানির স্মৃতিস্তম্ভ বিবি-কা-মকবারা দেখে আসব। আমাদের কাল দুপুরটা পর্যন্ত থাকতেই হবে, কারণ এগারোটার সময় জয়ন্ত মল্লিকের আসার কথা। আমাদের বিশ্বাস তিনি এলোরা যাবেন, এবং আমরা যাব তাঁকে ফলো করে।

রাত্রে খাবার পর ফেলুদা তার এলোরার গাইডবুক নিয়ে বসল। আমি কী করি তাই ভাবছি, এমন সময় জটায়ু এসে বললেন, 'কী করছ তপেশবাবু? বাইরে বেশ চাঁদ উঠেছে, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধ হয় বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে ট্রানজিসটারে হিন্দি ফিলমের গান বাজছে। রাস্তার উলটো দিকে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা উঁচিয়ে তর্ক করছে—কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ ভাষাটা বোধ হয় মারাঠি। দিনের বেলায় রাস্তাটায় বেশ লোকজন

গাড়িটাড়ির চলাচল ছিল, এখন এই দশটার মধ্যেই সব কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসল শোনা গেল, একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোত্থেকে জানি একটা লোক 'এ মধুকর—এ মধুকর !' বলে চেঁচিয়ে উঠল—সবই যেন কেমন নতুন নতুন, সব কিছুর মধ্যেই যেন খানিকটা রহস্য, খানিকটা রোমাঞ্চ, খানিকটা অজানা ভয় মেশানো রয়েছে। আর তার মধ্যে লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'শুভঙ্কর বোসকে দেখে একটু সাস্‌পিশাস বলে মনে হচ্ছে না তোমার ?'

বলতে ভুলে গেছি ওই বাঙালি প্রফেসরটির নাম হল শুভঙ্কর বোস। আমি বললাম, 'কেন ?'

'ওর সুটকেসের মধ্যে কী আছে বলো তো ? পঁয়ত্রিশ কিলো ওজন হয় কী করে ?'

'পঁয়ত্রিশ কিলো !'—আমি তো অবাক।

'বম্বেতে প্লেনে ওঁর আগে মাল ওজন করছিল। আমার সামনেই উনি ছিলেন। আমি দেখেছি। পঁয়ত্রিশ কিলো। যেখানে তোমার দাদারটা বাইশ, তোমারটা চোদ্দো, আমারটা ষোলো। ভদ্রলোককে অতিরিক্ত মালের জন্য বেশ কিছু টাকা দিতে হল।'

এ খবরটা আমি জানতাম না। অথচ বাক্সটা বেশি বড় নয় ঠিকই। কী আছে ওটার মধ্যে ?

'পাথর !' লালমোহনবাবু নিজেই ফিসফিস করে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন।—'কিংবা পাথর ভাঙার জন্য লোহার সব যন্ত্রপাতি। তোমার দাদা বলছিলেন না—এইসব মূর্তি চুরির পেছনে একটা দল আছে ? আমি বলছি উনি সেই দলের একজন। ওর নাকটা দেখেছ ? ঠিক ঘনশ্যাম কর্কটের মতো।'

'ঘনশ্যাম কর্কট ? সে আবার কে ?'

'ও হো—তোমাকে বলা হয়নি। আমার নতুন গল্পের ভিলেন। তার নাকের বর্ণনা কীরকম দোব জান তো ? পাশ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন জলের উপর বেরিয়ে থাকা হাঙরের ডানা।'

জটায়ু আমার মাথাটা গণ্ডগোল করে দিলেন। আমার কিন্তু শুভঙ্কর বোসকে একটুও সন্দেহ হয়নি। কারণ যে লোক আর্ট সম্বন্ধে এত জানেন......। অবিশ্যি এখন ভাবলে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের নাম-করা মন্দিরগুলো থেকে যারা মূর্তি চুরি করবে তাদেরও তো আর্ট সম্বন্ধে কিছুটা জানতেই হবে। ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে সত্যিই একটা ধারালো ভাব আছে।

'তোমায় বলে দিলুম', লালমোহনবাবু বললেন, 'এবার থেকে খালি একটু চোখে চোখে রেখো। আমাকে আজকে একটা ল্যাবেঞ্চুস অফার করেছিলেন, নিলুম না। যদি বিষ-টিষ মেশানো থাকে! তোমার দাদাকে বোলো ওঁর নিজের পরিচয়টা যেন গোপন রাখেন। উনি যে ডিটেকটিভ সেটা জানতে পারলে কিন্তু...'

রাত্রে ফেলুদাকে শুভঙ্কর বোসের বাক্সের ওজনের কথাটা বলাতে ও বলল, 'পঁয়ত্রিশ নয়, সাঁইত্রিশ কিলো। জটায়ুকে বলে দিস যে শুধু পাথরেরই ওজন হয় না, বইয়েরও হয়। আমার বিশ্বাস লোকটা পড়াশুনো করার জন্য সঙ্গে অনেক বই এনেছে।'

পরদিন সকালে সাড়ে ছটায় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এখানকার 'নকল তাজমহল' বিবি-কা-মোকবারা দেখে তারপর বৌদ্ধ গুহা দেখতে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে তারপর গুহায় পৌঁছানো যায়। আমাদের সঙ্গে শুভঙ্কর বোসও রয়েছেন, সমানে আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে চলেছেন, তার অর্ধেক কথা আমার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাকি কথা কোনও কানেই ঢুকছে না। লোকটাকে অনেক চেষ্টা করেও চোর-বদমাইস হিসাবে ভাবতে পারছি না, যদিও লালমোহনবাবু বার বার আড়চোখে তাকে দেখছেন, আর তার ফলে সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছেন।

আমরা ছাড়া আরও দুজন লোক আমাদের আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছেন। তার মধ্যে একজন রংচঙে হাইওয়ান শার্ট পরা এক টেকো সাহেব, আর আরেকজন নিশ্চয়ই টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের মাইনে করা গাইড।

ফেলুদা তার নকশা করা ঝোলাটা থেকে তার পেনট্যাক্স ক্যামেরাটা বার করে মাঝে মাঝে ছবি তুলছে, কখনও পাহাড়ের উপর থেকে শহরের ছবি, কখনও বা আমাদের ছবি। আমাদের দিকে ক্যামেরা তাগ করলেই লালমোহনবাবু থেমে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে পোজ দিচ্ছেন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে হাঁটা অবস্থাতেও ছবি ওঠে, আর না-হাসলে অনেক সময় ছবি আরও বেশি ভাল ওঠে।

গুহার মুখে পৌঁছে ফেলুদা বলল, 'তোরা দ্যাখ আমি কটা ছবি তুলে আসছি।' শুভঙ্করবাবু বললেন, 'দু নম্বর আর সাত নম্বরটা মিস করবেন না। এক থেকে পাঁচ এই কাছাকাছির মধ্যেই পাবেন, আর ছয় থেকে নয় হল এখান থেকে হাফ-এ-মাইল পুব দিকে। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা পাবেন।'

একে জুন মাস, তার উপর ঝলমলে রোদ, তাই বাইরেটা বেশ গরম লাগছিল। কিন্তু গুহার ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ ঠাণ্ডা। এক নম্বরটায় বিশেষ কিছু নেই, আর দেখেই বোঝা যায় সেটার কাজ অর্ধেক করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর যেটুকু তৈরি ছিল তারও খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে। শুভঙ্করবাবু তাও ভারী আগ্রহের সঙ্গে বারান্দার থাম, সিলিং ইত্যাদি দেখে খাতায় কী সব নোট করে নিতে লাগলেন। আমি আর লালমোহনবাবু দু নম্বর গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। ফেলুদা আমার সঙ্গে একটা টর্চ দিয়ে দিয়েছিল, বারান্দা পেরিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে টর্চটা জ্বালতে হল। বেশ বড় একটা হল ঘর, তার শেষ মাথায় একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি। দু পাশের দেয়ালে টর্চ ফেলে দেখি সেগুলোতেও চমৎকার সব মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন, 'তখনকার আর্টিস্টদের শুধু আর্টিস্ট হলে চলত না, বুঝলে হে তপেশ, সেই সঙ্গে গায়ের জোরও থাকতে হত। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে পাহাড়ের গায়ের পাথর ভেঙে তৈরি করতে হয়েছে এ সব মূর্তি—চাট্টিখানি কথা নয়।'

তিন নম্বরের ভিতরে ঢুকে দেখি আরও বড় একটা হল ঘর, আর

সে ঘর সেই গাইডের বকবকানিতে এমন গম গম করছে যে সেখানে টেকা দেয়। বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'তোমার দাদা গেলেন কোথায় ? তাকে তো দেখছি না।'

সত্যিই তো। ফেলুদা কোথায় গিয়ে ছবি তুলছে ?

আর শুভঙ্করবাবুই বা কোথায় ?

'চলো, এগিয়ে চলো', বললেন লালমোহনবাবু।

পাশেই পর পর চার আর পাঁচ নম্বর গুহা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা না থাকায় কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে। কাছাকাছির মধ্যে কোথাও নেই আন্দাজ করে আমরা পুব দিকের গুহাগুলোর পথ ধরলাম। প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হবে, কিন্তু যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার চেয়ে পাথর আর ঝোপঝাড়ই বেশি। ঘড়িতে মাত্র সোয়া আটটা, তাই রোদের তেজ এখনও তেমন বেশি নয়। দশটার বেশি দেরি করা চলবে না, কারণ এগারোটার গাড়িতে জয়ন্ত মল্লিক আসবেন।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর রাস্তা থেকে কিছুটা উপর দিকে একটা গুহা দেখতে পেলাম। এটা বোধ হয় ৬ নম্বর। কাছে ফেলুদার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। লালমোহনবাবু গোয়েন্দার ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়ে পায়ের ছাপ খোঁজার বৃথা চেষ্টা করছেন। এ ধরনের পাহাড়ে পথে এমনিতেই বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, তার উপরে সকাল থেকে এক টানা দু ঘণ্টা রোদ হয়ে রয়েছে। রাস্তা একেবারে শুকনো খট্‌খটে।

আর এগোনোর কোনও মানে আছে কি ? তার চেয়ে ওর নাম ধরে ডাকলে কেমন হয় ?

'ফেলুদা ! ফেলুদা !'

প্রদোষবাবু ! ফেলুবাবু— ! ও মিস্টার মিত্তি—র !'

কোনও উত্তর নেই।

আমার পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ওপর দিকে কোথাও চলে গেল নাকি ? কোনও কিছুর সন্ধান পেয়েছে কি ? জরুরি কিছু ?—যার ফলে আমাদের কথা ভুলে গিয়ে তদন্তের কাজে লেগে যেতে হয়েছে ?

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'এদিকে নেই। থাকলে ডাক শুনতে পেতেন। নিশ্চয় ওদিকেই আছেন। চলো ফিরে চলো। এবার দেখা পাব নির্ঘাত। তোমার দাদা তো আর খামখেয়ালি নন, বা কাঁচা কাজ করার লোক নন। চলো।'

আমরা উলটোমুখে ঘুরলাম। কিছু দূর গিয়েই সেই সাহেব আর তার গাইডের সঙ্গে দেখা হল। এরা এক থেকে পাঁচ শেষ করে ছ'য়ের দিকে চলেছে। বেশ বুঝলাম গাইডের কথার ঠেলায় সাহেবের অবস্থা কাহিল।

'ওই তো শুভঙ্করবাবু!' লালমোহনবাবু বলে উঠলেন। ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। জটায়ুর গলা শুনে মুখ তুললেন। আমি ব্যস্তভাবে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার দাদাকে দেখেছেন কি?'

'কই না তো। উনি যে বললেন ছবি তুলতে যাবেন?'

'কিন্তু ওকে তো দেখছি না। আপনি গুহাগুলো...?'

'কেভের মধ্যে নেই। আমি সবগুলো দেখে আসছি।'

আমার ভয় ভয় ভাব দেখেই বোধ হয় ভদ্রলোক সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, 'কোথায় আর যাবেন—পাহাড়ের ওপর দিকে কোথাও গেছেন হয়তো। শহরটার একটা ভাল ভিউ পাওয়া যায় ওপর থেকে। একটু এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাক দাও—ঠিক শুনতে পাবেন।'

শুভঙ্কর বোস ছ নম্বর কেভের দিকে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বললেন, 'গতিক ভাল লাগছে না তপেশ। এলোরা না যেতেই একটা চিন্তার কারণ ঘটবে এটা ভাবিনি।'

মনে সাহস আনার চেষ্টা করে এগিয়ে চললাম। হাঁটার স্পিড আপনা থেকেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে সময়ের ভীষণ দাম, এগারোটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, মল্লিক এল কি না জানতে হবে। অথচ ফেলুদাই বেপাত্তা। ফেলুদা ছাড়া...ফেলুদা ছাড়া...

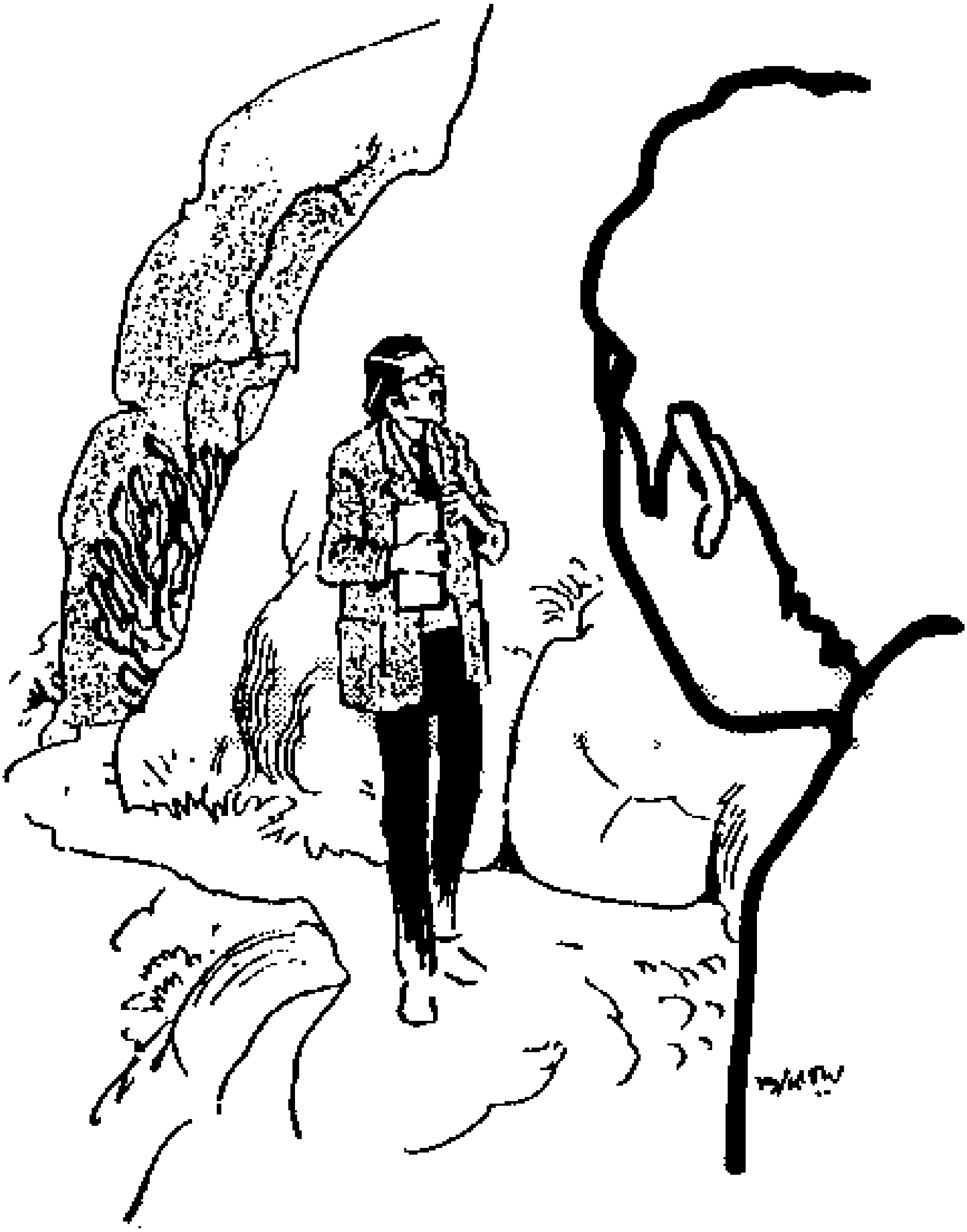

'চারমিনার'—লালমোহনবাবুর হঠাৎ-চিৎকারে চমকে লাফিয়ে উঠলাম।

সামনেই পাঁচ নম্বর গুহার থামগুলো দেখা যাচ্ছে। তার বাইরে একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে একটা হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। যাবার সময় সেটা হয় ছিল না, না হয় চোখে পড়েনি। খালি প্যাকেট কি ? নাকি সিগারেট থাকা অবস্থায় পকেট থেকে পড়ে গেছে ? কিংবা হাত থেকে ?...

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে তুললাম। খুলে দেখি খালি। ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় 'দেখি দেখি' বলে লালমোহনবাবু সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরও বেশি করে খুলতেই ভিতরের সাদা কাগজের গায়ে একটা ডট পেনের লেখা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদার হাতের লেখা—

'হোটেলে ফিরে যা।'

যদিও ফেলুদার একটা চিহ্ন পেয়ে হাঁপ ছাড়ার একটা কারণ হল, কিন্তু কী কারণে কী অবস্থায় সেটা লিখতে হয়েছে না জেনে পেটের ভিতরে খালি ভাবটা পুরোপুরি গেল না। লালমোহনবাবু বললেন, 'তা না হয় হোটেলে ফিরে গেলুম, কিন্তু মিস্টার বোসের কী হবে ? তাঁর তো আরও চারটে গুহা দেখতে বাকি।'

আমি বললাম, 'এক কাজ করি—আমরা ফিরে গিয়ে ট্যাক্সিটা ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

'এখানে থেকে ওঁর গতিবিধি একটু লক্ষ করলে হত না ?'

'মিস্টার বোসের ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কিন্তু মনে হয় ফেলুদার আদেশ মানা উচিত।'

'তবে চলো যাই হোটেলে ফিরে।'

লালমোহনবাবু নিজে রহস্যের গল্প লেখেন বলেই বোধহয় মাঝে মাঝে ওঁর গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক চাপে। বেশ বুঝতে পারছিলাম উনি শুভঙ্করবাবুকে ফলো করতে চাচ্ছেন, কিন্তু বাধ্য হয়েই বাধা দিতে হল। ট্যাক্সি আমাদের দুজনকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আবার গুহায় ফিরে গেল। এখন মাত্র নটা। এইভাবে ফেলুদার অপেক্ষায়

কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না।

ঘরে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই দুজনে হোটেলের বাইরে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম। সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন আবার মেঘ করে আসছে। এক হিসেবে ভাল। গরমটা কমবে।

পৌনে দশটা নাগাদ শুভঙ্করবাবু ফিরে এসে ফেলুদা তখনও আসেনি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন। অথচ আমরা যে একটা ক্রাইমের তদন্ত করতে এসেছি, বিপদের আশঙ্কা আছে, এটাও ওঁকে বলা যায় না, কারণ এখনও সেরকম আলাপ হয়নি, আর লালমোহনবাবুর এখনও বিশ্বাস উনি শত্রুপক্ষের লোক। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই এটা বোঝানোর জন্য বললাম, 'ও ওইরকমই লোক। ভীষণ ভুলো আর খামখেয়ালি। আগেও অনেক বার এরকম করেছে।'

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় পায়চারি করে ঘরে ফিরে এসে টিনটিনের বইটা খুলে ভুবঙ্ক মাল্লেকের রোমাঞ্চকর ঘটনায় মন দিতে চেষ্টা করলাম। এগারোটার কিছু পরে একবার মনে হল যেন একটা ট্রেনের হুইসল শুনতে পেলাম। পৌনে বারোটার সময় বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। গিয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি থেকে দুজন ভদ্রলোক নামলেন। একজন মাঝারি হাইট, কাঁধ চওড়া, ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, দেখেই কেন জানি মনে হয় কড়া সাহেবি মেজাজের লোক। অন্যজন লম্বা, বেলবটম প্যান্ট, ফুলকারি করা পাতলা শার্ট, গলায় চেন, লম্বা চুল, এলোমেলো গোঁফ দাড়ি। এরা দুজন ট্যাক্সি শেয়ার করে এসেছেন, এক জোটে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। লম্বার সঙ্গে একটা নতুন ক্যানভাসের ব্যাগ, আর ঘাড়ে-গর্দানের সঙ্গে পুরনো চামড়ার সুটকেশ। মাল নিয়ে দুজনে হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ট্যাক্সি এসে পড়ল।

দরজা খুলে নামলেন জয়ন্ত মল্লিক।

তাকে দেখে যতটা নিশ্চিন্ত হলাম, তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ফেলুদার কাণ্ড দেখে।

এরকম অবস্থায় কি এর আগে পড়েছি কখনও ? মনে তো পড়ে না।

॥ ৬ ॥

আরও দশ মিনিট ফেলুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় অগত্যা হোটেলে ফিরে গিয়ে লালমোহনবাবুর ঘরের দরজায় টোকা মারলাম। উনি দরজা খুলেই চোখ গোল করে বললেন, 'আমি এতক্ষণ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দারুণ সাসপিশাস সব লোকেরা এসে পড়েছে। এরা সবাই কি এলোরা যাবে নাকি ? একটা তো একেবারে হিপি না হিপো না কী বলে ঠিক সেইরকম ; নির্ঘাত গাঁজা-টাজা খায়। লম্বা চুল, এলোপাথাড়ি দাড়ি গোঁফ।'

আমি জানি লালমোহনবাবু কার কথা বলছেন। আমি বললাম, 'মিস্টার মল্লিকও এসে গেছেন।'

'বটে ? কীরকম দেখতে বলো তো ?'

আমি বর্ণনা দিতেই ভদ্রলোক বললেন, 'লোকটা আমার পাশের ঘরে রয়েছে। আমি দেখেই ডাউট করেছিলুম, কারণ ওর সুটকেসটা বইতে হোটেলের বেয়ারার কাঁধ বেঁকে গেল। ওর মধ্যেই তো যক্ষীর মাথাটা রয়েছে ?'

আমি ফেলুদার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না, তাই বললাম, 'যক্ষীর মাথার চেয়েও দরকার ফেলুদার সন্ধান পাওয়া। এলোরায় যাবার কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি। অথচ মল্লিক নিশ্চয়ই বসে থাকার জন্য আসেনি। আমরা যাবার আগে সে যদি গিয়ে আরেকটা মূর্তি-টুর্তি ভেঙে—'

'ওটা কী ?'

লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্নটা করে আমার কথা থামিয়ে দিলেন। তিনি চেয়ে আছেন দরজার দিকে। আমি ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি তার তলা দিয়ে কে যেন একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এক লাফে গিয়ে কাগজ তুলে ভাঁজ খুললাম। তিন লাইনের

চিঠি। ফেলুদার হাতের লেখা—

'দেড়টার সময় সব মাল নিয়ে দুজনে হোটেলের বাইরে গিয়ে পাঁচশো ত্রিশ নম্বর কালো অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করবি। লাঞ্চ সেরে নিস। হোটেলের ভাড়া অ্যাডভান্স দেওয়া আছে।'

চিঠিটা পড়েই দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই পাশের ঘর থেকে মল্লিক বেরিয়ে ব্যস্তভাবে আপিসের দিকে চলে গেল। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, কিন্তু মনে হল না যে ভদ্রলোক চিনতে পেরেছেন।

'ঘর খালি। দরজা খোলা। একবার যাব নাকি। যক্ষীর মাথাটা যদি...'

লালমোহনবাবুর সাহস বড্ড বেড়ে গেছে। বললাম, 'একটা বাজে। আমার মনে হয় আপনার তৈরি হয়ে নেওয়া উচিত। আমিও যাই।'

একটা পঁচিশে লাঞ্চ সেরে ফেলুদার সুটকেস সমেত আমাদের মাল নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লালমোহনবাবু এই ফাঁকে রাস্তার উলটো দিকের একটা দোকান থেকে পান কিনে আনলেন। মিঠে পান পাওয়া যায় না; এ হল সাদা মগাই পান৮ কলকাতায় কক্ষনও খাই না, কিন্তু এখানে দিব্যি লাগছে।

একটা ট্যাক্সি এল। কালো নয়, সবুজ। নম্বরও মিলছে না। ড্রাইভারটা বাইরে বেরিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড় ভাঙল।

তিন মিনিট পরে আরেকটা ট্যাক্সি। কালো অ্যাম্বাসাডর। নম্বর পাঁচশো ত্রিশ। আমরা দুজনে মাল নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

'মিস্টার মিটারকা পার্টি?' পাঞ্জাবি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' জটায়ু বেশ ভারিক্কি চালে হিন্দি মেজাজে উত্তর দিলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনটা খুলে দিল, সুটকেস তিনটে ভিতরে চলে গেল।

হোটেল থেকে লোক বেরোচ্ছে। মিস্টার মল্লিক আর শুভঙ্কর

বোস। এদের একটু আগেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেতে দেখেছি। সবুজ ট্যাক্সিতে উঠলেন দুজন। ট্যাক্সিটা দুবার গোঁ গোঁ করে স্টার্ট নিয়ে আদালত রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিল। এলোরা যেতে হলে ওই দিকেই যেতে হয়।

সাসপেন্সে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে ফেলুদার উপর যে একটু রাগও হচ্ছিল না তা নয়। অথচ মন বলছে ফেলুদা খামখেয়ালি লোক নয়, যা করে তা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করে করে।

আবার লোক। এবার সেই দিশি হিপি, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ। সোজা আমার দিকে এসে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়!'

কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম প্রায় ম্যাজিকের মতো আমি গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছি, সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে হিপি তাঁকেও গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল, আর নিজে এসে আমার পাশে ধপ করে বসে দরজাটা এক টানে বন্ধ করে বলল, 'চলিয়ে দীনদয়ালজি।'

ফেলুদা ভাল মেক আপ করতে পারে জানি, কিন্তু এমন আশ্চর্য রকম ভাল পারে, গলার স্বর হাঁটা চলা চোখের চাহনি—সব কিছু এমনভাবে পালটাতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি এর মধ্যেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন। চমক লাগার ফলে বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনাটাও জানতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ফেলুদা মুখ খুলল একেবারে শহর ছাড়িয়ে খোলা রাস্তায় পড়ে।

'সেই বারাসতের কারখানায় মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; ও যদি দেখত সেই একই লোক তার সঙ্গে এলোরা যাচ্ছে তা হলে গণ্ডগোল হয়ে যেত। তাই এই মেকআপ। তোদের বলিনি, কারণ তোরা দেখে চিনতে পারিস কি না সেটা জানা দরকার ছিল। পারলি না, কাজেই নিশ্চিন্ত হলাম।

'ঝোলার মধ্যে সব ছিল ; ছবি তোলার নাম করে ছ নম্বর কেভে চলে যাই। ওটা একটু ওপর দিকে বলে বিশেষ কেউ যায় না। মেক-আপ হলে পর সেই অবস্থায় হেঁটে শহরে ফিরে আসি।

প্রথমে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করি, তারপর স্টেশনে গিয়ে মনমডের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করি। মল্লিককে নামতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে ফলো করে ওর পিছনের ট্যাক্সিটায় উঠি। আরেকজন আসছিল হোটেলে, তাকে সঙ্গে তুলে নিই ভাড়াটা শেয়ার করতে পারব বলে। ...শুভঙ্কর বোস জিজ্ঞেস করলে বলিস দাদা একটা বিশেষ কাজে বম্বে চলে গেছে, কারণ এই মেক-আপ কেবল রাত্রে শোবার আগে ছাড়া খোলা যাবে না। তোতে আমাতে আলাপ আছে এটা জানলেও মুশকিল। তুই আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে এসেছিস, আমি আলাদা। তোরা এক ঘরে থাকবি, আমি আলাদা ঘরে।'

'তুমি বাঙালি তো?'—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ফেলুদার সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলতে হবে ভাবতে ভাল লাগছিল না।

'বাংলা জানি এটুকু বলে রাখছি। নাম জানার দরকার নেই। পেশা ফটোগ্রাফি; হংকং-এর এশিয়া ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তুলতে এসেছি।'

'আর আমরা?'

'মামা-ভাগনে। উনি সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তুই সিটি স্কুলের ছাত্র। ছবি আঁকার শখ আছে। সামনের বছর কলেজে ঢুকবি। ইতিহাসে অনার্স নিবি। তোর পদবি মুখার্জি। লালমোহনবাবুর নাম চেঞ্জ হচ্ছে না। আপনি এলোরা সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে নেবেন। মোটামুটি মনে রাখবেন যে, কৈলাসের মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা কৃষ্ণের আমলে।'

লালমোহনবাবু কথাটা বিড়বিড় করে আওড়ে নিয়ে চলন্ত গাড়িতেই কোনওমতে তাঁর খাতায় নোট করে নিলেন। ভীষণ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ফেলুদা আমাদের উপর। এখন বুঝতে পারছি ফেলুদা কেন নিজে গরজ করে লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নিতে চাইছিল। ও জানত যে মল্লিকের সন্দেহ এড়াবার জন্য ওকে ছদ্মবেশ নিতে হবে, আমার থেকে আলাদা থাকতে হবে। লালমোহনবাবু থাকলে দলটা ভারীও হবে, আর আমার একজন

অভিভাবকও হবে। লালমোহনবাবুকে মামা বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফেলুদাকে ভাল করে চিনি না—এটা বোঝাতে গেলে সত্যিই অ্যাকটিং করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী ?

আওরঙ্গাবাদ থেকে এলোরার রাস্তা চমৎকার। দূরে পাহাড়—যদিও বেশি উঁচু না—আর রাস্তার দু-পাশে রুক্ষ জমি। একটা নতুন ধরনের মনসার ঝোপ দেখতে পাচ্ছি যেটা ফণিমনসা নয়। রাজস্থানেও এরকম লম্বা মনসার পাতা দেখেছি। এর এক একটা ঝোপ প্রায় দেড় মানুষ উঁচু।

পিছনে কিছুক্ষণ থেকেই একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল, আমাদের ড্রাইভার সিগন্যাল করাতে সেটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তাতে রয়েছে সেই টেকো সাহেব, আর ফেলুদার সঙ্গে যে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল সেই ঘাড়ে-গর্দানে লোকটা।

আধ ঘন্টার মধ্যেই একটা পাহাড় ক্রমে কাছে এগিয়ে এল। রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁষে খানিকটা উপর দিকে উঠে, ডান দিকে পাহাড়টাকে রেখে এগোতে লাগল। বাঁ দিকে দূরে একটা ছোট্ট শহরের মতো দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার বলল সেটা খুলদাবাদ, আর খুলদাবাদেই নাকি এলোরার গুহা। আমরা ডাক বাংলোতে থাকব। অন্য সময় হলে হয়তো এত চট করে জায়গা পাওয়া যেত না, কিন্তু আগেই বলেছি এটা অফ-সিজন ; তার মানে টুরিস্টদের সংখ্যা কম। আর সেই কারণেই অবিশ্যি মূর্তি-চোরদেরও সুবিধে।

আরও খানিকটা যেতেই ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে প্রথম গুহাগুলো দেখতে পেলাম। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'পহিলে কেভ দেখনা, ইয়া বাংলোমে যানা ?'

ফেলুদা বলল, 'পহিলে বাংলো।'

বাঁ দিক দিয়ে একটা রাস্তা খুলদাবাদের দিকে চলে গেছে। গাড়ি সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেল। আমি তখনও অবাক হয়ে পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা সারি সারি গুহাগুলোর দিকে দেখছি। এর মধ্যে কৈলাস কোনটা কে জানে।

খুলদাবাদে দুটো থাকার জায়গা আছে—একটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস—সেটা ভাড়া বেশি—আর একটা ডাক বাংলো। আমরা

বাংলোতেই দুটো ঘর বুক করেছি। যাবার পথে আগে গেস্ট হাউসটা পড়ে। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সামনের বাগানের পাশে সবুজ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে জয়ন্ত মল্লিক এটাতেই উঠেছেন। গেস্ট হাউসের পরের বাড়িটাই বাংলো, দুটোর মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা। সাইজে বাংলোটা অনেক ছোট, বাহারও কম, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফেলুদা ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বলল সে যেন মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে। আমরা জিনিসপত্র রেখে কৈলাসে যাব, ও আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ ফিরে যাবে।

ডাক বাংলোয় সবসুদ্ধ চারটে ঘর, প্রত্যেকটায় তিনটে করে খাট। ফেলুদা ইচ্ছে করলে আমাদের ঘরে থাকতে পারত, কিন্তু থাকল না। ও নিজের ঘরে যাবার সময় চাপা গলায় বলে গেল, 'তোর পদবি মুখার্জি, লালমোহনবাবু তোর মেজোমামা, রাষ্ট্রকূট, সেভেনথ সেঞ্চুরি, রাজার নাম কৃষ্ণ...আমি দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

আমাদের ছেড়ে ফেলুদা তার নিজের ঘরে গিয়েই 'চৌকিদার' বলে হাঁক দিল এমন একটা গলায় যার সঙ্গে ওর নিজের গলার কোনও মিল নেই।

আমরা দুজনে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝখানের ডাইনিং রুমটায় এসে বুঝতে পারলাম যে আরেকজন লোক বাংলোয় এসে উঠেছেন। ইনিই ফেলুদার সঙ্গে স্টেশন থেকে এসেছিলেন, আর একেই আমরা একটু আগে ট্যাক্সিতে সেই সাহেবটার সঙ্গে দেখেছি। তখন দেখে বক্সার বা কুস্তিগির বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি চোখের কোণে একটা বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল হাসি হাসি ভাব রয়েছে, যাতে মনে হয় ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া জানেন—এমনকী হয়তো কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী-টিল্পীও হতে পারেন। আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, 'বেঙ্গলি?'

'ইয়েস স্যার', লালমোহনবাবু জবাব দিলেন।—'ফ্রম ক্যালকাটা। আই অ্যাম দি কী বলে প্রোফেসার অফ হিস্ট্রি ইন দি সিটি কলেজ। অ্যান্ড দিস ইজ কী বলে মাই নেফিউ।'

'কৈলাস দেখতে আসা হয়েছে?'—পরিষ্কার বাংলায় বললেন ভদ্রলোক।

'হে হে—আপনিও বাঙালি?'

'একশো বার। তবে কলকাতার নয়। এলাহাবাদের।'

ভদ্রলোকের বাংলায় একটা টান আছে যেটা অনেক প্রবাসী বাঙালির মধ্যেই থাকে।

আমাদের আর কিছু না বললেও চলত, কিন্তু ইংরিজি বলতে হবে না জেনে বোধ হয় খুশি হয়েই লালমোহনবাবু আরও একগাদা কথা বলে ফেললেন।

'ভাবলুম রাষ্ট্রকূট বংশের অতুল কীর্তিটা একবার দেখে আসি, হেঁ হেঁ। আমার ভাগ্নেটির আবার আর্টের দিকে খুব ইয়ে। বলছে বি এ পড়ে আর্ট কলেজে ঢুকবে। দিব্যি ছবি আঁকে। তপেশ, তোমার ড্রইং-এর খাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে নিয়ো!'

আমি চুপ করে রইলাম, কারণ ড্রইং-এর খাতা আমি আনিনি।

ফেলুদাও এই ফাঁকে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ক্যামেরাটা বাইরে বের করে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে, কারণ ছবি তাকে তুলতেই হবে। আমাদের তিনজনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে তার নতুন গলায় নতুন উচ্চারণে বলল, 'আপনাদের যদি কেভ দেখার ইচ্ছে থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে পারেন। ট্যাক্সিটা এখনও রয়েছে।'

'বাঃ—খুব সুবিধেই হল!' লালমোহনবাবু বললেন।—'আপনি যাবেন নাকি ওদিকে?'

প্রশ্নটা করা হল এলাহাবাদের বাবুটিকে। বাবু বললেন, 'আমি পরে যাব। আই মাস্ট হ্যাভ এ বাথ ফার্স্ট।'

বাইরে এসেই লালমোহনবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'আরও কিছু ছাড়ুন মশাই! ইতিহাসের স্টকটা আরেকটু না বাড়ালে চলছে না।'

ফেলুদা বলল, 'ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পিরিয়ডগুলোর নাম জানা আছে আপনার?'

'তার মানে?'

'এই যেমন মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, কুষাণ, চোল—বা এদিকে পাল বংশ, সেন বংশ—এগুলো জানেন ?'

লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, 'একটা কথা বলব মশাই ?—এমনও তো হতে পারে যে আমি কানে খাটো। কেউ কথা বললে যদি ঠিকমতো না শোনার ভান করি তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'আপত্তি নেই—যদি অভিনয়টা ঠিক হয়, আর যদি সেটা মেনটেন করে যেতে পারেন।'

'সেটা মশাই ইতিহাস-আওড়ানোর চেয়ে ঢের সহজ। দেখলেন তো কুট বলতে পুট বেরিয়ে গেল।'

গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম জয়ন্ত মল্লিক বাইরে বেরিয়ে এসে পকেটে হাত দিয়ে বাংলোর দিকে চেয়ে আছে, আর সবুজ ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা যেন মল্লিককে দেখেই তার ঝোলাটায় হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট চিরুনি বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'সিঁথিটা ডান দিকে করে নে তো ; পোর্ট্রেটটা একটু চেঞ্জ হোক।' উইন্ডস্ক্রিনের আয়নায় দেখে চুলটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলাম। শুধু সিঁথির এদিক ওদিকেই যে মানুষের চেহারা এতটা বদলে যায় সেটা আমার ধারণা ছিল না।

বাংলোয় যাবার রাস্তাটা যেখানে এসে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে খানিকটা গিয়েই সামনে বিখ্যাত কৈলাসের মন্দির। ফেলুদা বলেই দিয়েছিল যে আজ আর বেশি ঘোরা হবে না, কারণ কৈলাস দেখতে দেখতেই আলো পড়ে যাবে। ট্যাক্সি আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ চলে গেল।

কৈলাস যে কী ব্যাপার সেটা বাইরে থেকে তেমন বুঝতে পারিনি। সামনের প্রকাণ্ড পাথরের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই হঠাৎ যেন মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল। মূর্তিচোর, যক্ষীর মাথা, মিস্টার মল্লিক, শুভঙ্কর বোস—সব যেন ধোঁয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শুধু রইল একটা চোখ-ট্যারানো মন-ধাঁধানো অবাক হওয়ার ভাব। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, তেরোশো বছর আগে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে

দাক্ষিণাত্যের একদল কারিগর পাহাড়ের গা কেটে এই মন্দিরটা বার করেছে : কিন্তু পারলাম না। এ মন্দির যেন চিরকালই ছিল ; কিংবা কোনও আদিকালের যাদুকর কোনও আশ্চর্য মন্ত্রবলে এক সেকেন্ডে এটা তৈরি করেছে : কিংবা ফেলুদার সেই বইটাতে যেমন আছে—হয়তো মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানীগুণী কোনও প্রাণী অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে এটা তৈরি করে দিয়ে গেছে।

তিন দিকে পাহাড়ের দেয়ালের মাঝখানে কৈলাসের মন্দির। মন্দিরের এক পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে অন্য দিক দিয়ে আবার সামনে ফিরে আসা যায়। এই রাস্তা বা প্যাসেজ কোনওখানেই আট দশ হাতের বেশি চওড়া না। মন্দিরের ডাইনে আর বাঁয়ে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গুহার মতো ঘর করা আছে, আর তার মধ্যেও অনেক মূর্তি রয়েছে।

আমরা ডান দিকের প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, আর ফেলুদা বিড়বিড় করে ইনফরমেশন দিয়ে চলেছে—

'জায়গাটা তিনশো ফুট লম্বা, দেড়শো ফুট চওড়া...মন্দিরের হাইট একশো ফুট...দু লক্ষ টন পাথর কেটে সরানো হয়েছিল...প্রথমে তিন দিকে পাথর কেটে খাদ তৈরি করে তারপর চুড়ো থেকে শুরু করে কাটতে কাটতে নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছিল...দেব দেবী মানুষ জানোয়ার রামায়ণ মহাভারত কিছুই বাদ নেই এখানে। ক্যালকুলেশনের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ...আর্ট ছেড়ে দিয়ে শুধু এঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকটা দ্যাখ্...'

ফেলুদা আরও বলত, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে থেমে আমাদের দুজনের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে গিয়ে একটা গহ্বরের মধ্যে রাবণের কৈলাস নাড়ার মূর্তিটা দেখতে লাগল।

পায়ের শব্দ। মন্দিরের পিছন থেকে শুভঙ্কর বোস বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবুক, কাঁধে একটা ঝোলা। ভারী মন দিয়ে মন্দিরের কারুকার্যগুলো দেখছেন তিনি। এবার মূর্তি ছেড়ে আমাদের দুজনের দিকে এল তাঁর দৃষ্টি। প্রথমে একটা হাসি, তারপরেই একটা উদ্বেগের ভাব।

'তোমার দাদার কোনও খবর পেলে না ?'

যতদূর পারি স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'উনি একটা জরুরি কাজে হঠাৎ বম্বে চলে গেছেন। আজকালের মধ্যেই ফিরবেন।'

'ও...'

শুভঙ্কর বোসের চোখ আবার পাথরের দিকে চলে গেল। পিছনে একটা খচ শব্দ পেয়ে বুঝলাম ফেলুদা একটা ছবি তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফেলুদা আবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দুজন মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে উলটো দিকে গিয়ে পড়লাম। এবার আরেকজন লোককে দেখতে পেলাম। গায়ে নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট। মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক। ইনি সবেমাত্র এসে ঢুকেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখেই মন্দিরের দেয়ালে একটা হাতির মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। এর হাতের ব্যাগটা কলকাতাতেও দেখেছি। বারাসত থেকে ফেরার পথে এই ব্যাগ তার গাড়িতে ছিল, এই ব্যাগ নিয়ে উনি কুইনস ম্যানসনে নেমেছিলেন। ওটাতে কী আছে জানবার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল হল। ফেলুদা আমাদের কাছাকাছি এসে গেছে। এক এক সময় ইচ্ছে করছিল ফেলুদা সোজা গিয়ে মল্লিকের কলারটা চেপে ধরে বলুক—'কই, বার করুন মশাই যক্ষীর মাথা!'—কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে ও ও-রকম কাঁচা কাজ করবে না। মল্লিক সিদিকপুরে গিয়েছিল সেটা ঠিক; এখন এলোরায় এসেছে সেটা ঠিক, আর বম্বেতে কাকে জানি ফোন করে বলেছিল, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে—সেটাও ঠিক। কিন্তু এর বেশি কিছু ওর সম্বন্ধে এখনও জানা যায়নি। আরেকটু না জেনে, আরেকটু প্রমাণ না পেয়ে ফেলুদা কিছু করবে না।

যেটা এখনই করা যায় সেটা অবিশ্যি ফেলুদা করল। মল্লিকের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের শরীর দিয়ে ভদ্রলোকের ব্যাগটায় একটা ধাক্কা দিয়ে 'সরি' বলে একটা মূর্তির দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফোকাস করতে লাগল।

ধাক্কা খেয়ে ব্যাগটা যেভাবে নড়বড় করে উঠল, তাতে মনে হল না তার ভিতরে কোনও ভারী জিনিস রয়েছে।

কৈলাস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোককে দেখতে পেলাম। একজন আমাদের বাংলোর এলাহাবাদি বাবু, আরেকজন হলেন সেই টেকো সাহেব। বাবু হাত নেড়ে কথা বলছেন, সাহেব মাথা নেড়ে শুনছেন। হঠাৎ কেন জানি মনে হল—আমরা তিনজন ছাড়া যত জন লোক এখানে এসেছে সবাই গোলমেলে, সবাইকেই সন্দেহ করা উচিত। ফেলুদাও কি তাই করছে?

॥ ৭ ॥

কৈলাস থেকে ফেরার পথে ফেলুদার হঠাৎ কেন জানি গেস্ট হাউসে যাবার ইচ্ছে হল। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, 'একবার খোঁজ করে আসি এখানে খবরের কাগজ আসে কি না।' আমরা বাংলোয় চলে গেলাম। আমাদের দুজনেরই খিদে পাচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবু চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে চা আর বিস্কুট অর্ডার দিলেন। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনিং রুম। তার ডান দিকের এক নম্বরের ঘরটা আমাদের। আমাদের পরের ঘরটা দু নম্বর, সেটা খালি। ডাইনিং রুমের উলটো দিকে আরও দুটো ঘর। তার মধ্যে আমাদের ঠিক উলটো দিকের ঘরটায় থাকেন এলাহাবাদি, আর তার পাশের চার নম্বরে ফেলুদা।

আগেই বলেছি, লালমোহনবাবুকে মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরিতে পেয়ে বসে। ওঁর এখন বোধ হয় সেই রকম একটা মেজাজ এসেছে। ঘরে বসে চা খেতে খেতে বললেন, 'সাহেবকে না হয় ছেড়েই দিলাম; অন্য যে তিনজন আছে তার মধ্যে দুজনের বিষয় তো তবু কিছু জানা গেছে—সত্যি হোক মিথ্যে হোক—কিন্তু আমাদের বাংলোর বাবুটির তো নাম পর্যন্ত জানা যায়নি। ওঁর ঘরটায় একবার উঁকি দিয়ে এলে হত না? মনে হল দরজায় চাবি লাগায়নি!'

আমার আইডিয়াটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, 'চৌকিদার যদি দেখে ফেলে!'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমি যাই, তুমি পাহারা দাও।

চৌকিদার এদিকে আসছে মনে হলে গলা খাক্‌রানি দিলেই আমি চলে আসব। তোমার দাদার কাজ একটু এগিয়ে রাখতে পারলে উনি খুশিও হবেন। এলাহাবাদির সুটকেসটাও রীতিমতো ভারী বলেই মনে হল।'

আমি এরকম ব্যাপার কখনও করিনি। অন্তত ফেলুদা ছাড়া অন্য কারুর জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম। আমি চলে গেলাম পিছনের বারান্দায়। সামনে একটা খোলা জায়গার পরেই বাবুর্চিখানার পাশে চৌকিদারের ঘর। চৌকিদারের একটা সাইকেল আছে আগেই দেখেছি, এখন দেখলাম তার দশ বারো বছরের ছেলেটা খুব মন দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করছে। একটা ক্যাঁচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে দেখলাম, লালমোহনবাবু চোরের মতো তিন নম্বর ঘরে ঢুকলেন। মিনিট তিনেক পরে আমার বদলে উনিই একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর তদন্তের কাজ শেষ। ঘরে ফিরে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'পুরনো সুটকেস, ভাবলুম হয়তো চাবি লাগে না, কিন্তু টান দিয়ে খুলল না। টেবিলের ওপর দেখলুম একটা চশমার খাপ—তাতে কলকাতার স্টিফেন কোম্পানির নাম, একটা সোডা মিন্টের বোতল, আর একটা ওডোমসের টিউব। আলনায় সবুজ ডোরা-কাটা শার্ট আর পায়জামা, মেঝেতে এক জোড়া পুরনো চটি—কোম্পানির নাম উঠে গেছে। এ ছাড়া আর কিচ্ছু—'

লালমোহনবাবুর কথা থেমে গেল। ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

'কার জিনিসের ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে?'

ওকে ব্যাপারটা বলতেই হল। ও কিন্তু শুনে বিশেষ রাগটাগ করল না, খালি বলল, 'লোকটাকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ ঘটেছিল কি?'

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিছুই তো জানা যায়নি ওর সম্বন্ধে। এমন কী নামটাও না। এদিকে কী রকম ষণ্ডামার্কা চেহারা...একটা গ্যাঙের কথা বলছিলেন না?—তাই

ভাবলুম, মানে...'

'সন্দেহের কারণ না থাকলে এগুলো করতে যাওয়া অযথা রিস্ক নেওয়া। ভদ্রলোকের নাম আর এন রক্ষিত। সুটকেসের বাঁ ধারে ফ্যাকফেকে সাদা অক্ষরে লেখা, চোখ থাকলেই দেখা যায়। আপাতত এর বেশি জানার কোনও দরকার আছে বলে মনে করি না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'তা হলে বাকি রইল এক সাহেব।'

ফেলুদা বলল, 'সাহেবের নাম স্যাম ল্যুইসন। এও ইহুদি, এও ধনী। নিউ ইয়র্কে এর একটা আর্ট গ্যালারি আছে।'

'কী করে জানলে?' আমি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'গেস্ট হাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হল। বেড়ে লোক। ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। মূর্তি চুরির কথা কাগজে পড়ে অবধি দিন গুনছে কবে এইখানে সেই চোরের আবির্ভাব হবে।'

'তোমার পরিচয় দিলে?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে বলল, 'ওকে হাতে রাখা দরকার। লোকটা অনেক হেল্প করতে পারবে। ভুললে চলবে না, মল্লিক গেস্ট হাউসে থাকে। সে নাকি অলরেডি বম্বেতে একটা কল বুক করেছিল, লাইন পায়নি।'

রাত্রে ডিনার আমরা চারজনে একসঙ্গে বসে খেলাম। ফেলুদা একটাও কথা বলল না। সেটা তার ছদ্মবেশের জন্য, না মাথায় কোনও চিন্তা ঘুরছে বলে, তা জানি না। মিস্টার রক্ষিত একবার লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির কোনও বিশেষ পিরিয়ড নিয়ে তিনি চর্চা করেন কি না। তার উত্তরে লালমোহনবাবু অড়র ডালে ভেজানো হাতের রুটি চিবোতে চিবোতে বললেন যে পিরামিড নিয়ে তাঁর বিশেষ পড়াশুনো নেই, যদিও সেটা যে মিশরে রয়েছে সেটা তিনি জানেন। এতে রক্ষিতরা একটু থতমত খেয়ে আমার দিকে চাইলে আমি নিজের কানের দিকে দেখিয়ে লালমোহনবাবু যে কানে খাটো সেটা বুঝিয়ে দিলাম। এর পরে ভদ্রলোক আর 'মেজো মামাকে' কোনও প্রশ্ন করেননি।

খাওয়ার পরে আমি আর লালমোহনবাবু যখন বাংলোর বাইরে

এসে দাঁড়ালাম (ফেলুদা তার ঘরে চলে গিয়েছিল) তখন একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, আর টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা ফিকে জোৎস্না এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোত্থেকে জানি হাসনাহানা ফুলের গন্ধ আসছে, মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে, লালমোহনবাবু আ-আ-আ করে একটা ক্ল্যাসিক্যাল তান দিতে গিয়ে একদম বেসুরে চলে গেছেন, এমন সময় দেখলাম গেস্ট হাউসের দিক থেকে একজন লোক আমাদের দিকে আসছে। আরেকটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। শুভঙ্কর বোস। জটায়ু গান থামিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার দাদা থাকলে ভাল হত।'

'আপনারাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন দেখছি!'

শুভঙ্করবাবুর মধ্যে একটা উসখুসে ভাব লক্ষ করলাম। দুবার গলা খাকরালেন তিনবার পিছন দিকে চাইলেন, তারপর দুপা এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে—আপনারা নীল শার্টপরা বাঙালি ভদ্রলোকটিকে চেনেন?'

এর কাছে লালমোহনবাবুর কাল্পা ভাঁজা চলবে না, কারণ আগে অনেক কথা হয়েছে। বললেন, 'কই না তো। কেন, উনি কি আমাদের চেনেন বলে বললেন নাকি?'

শুভঙ্কর বোস আরেকবার পেছনদিকে দেখে বললেন, 'লোকটি, মানে, পিকিউলিয়ার। বলছে এলোরায় প্রথম এল, আর্টে ইন্টারেস্টেড, অথচ কৈলাস দেখে একটিবার পর্যন্ত তারিফ করল না, আহা উহু করল না। আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম, অথচ সেই প্রথমবারের মতোই থ্রিল অনুভব করলাম। ভালই যদি না লাগে তো আসাই বা কেন, আর ভান করাই বা কেন!'

আমরা দুজনে চুপ। এই কথাটাই কি বলতে এলেন ভদ্রলোক?

কাছেই একটা গাছ থেকে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে। ছোট্ট শহরটা মনে হচ্ছে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ বেজেছে মাত্র দশটা।

'ইয়ে, ইদানীং খবরের কাগজ পড়েছেন?' শুভঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কেন বলুন তো ?' জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

'ভারতবর্ষের শিল্পসম্পদ নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। মন্দির থেকে মূর্তি লোপাট হয়ে যাচ্ছে।'

'সত্যি ? খবরটা জানতুম না তো ! কী অন্যায় ! ছি ছি ছি।'

লালমোহনবাবুর অ্যাকটিং খুব পাকা নয়, তাই একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু শুভঙ্কর বোসের সেদিকে লক্ষই নেই। আরেক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'ভদ্রলোক কিন্তু গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

'কোন ভদ্রলোক ?'

'মিস্টার মল্লিক।'

'বেরিয়ে গেছেন ?'

প্রশ্নটা আমরা দুজনে একসঙ্গে করলাম। সত্যি, ফেলুদার এখানে থাকা উচিত ছিল।

'একবার যাবেন নাকি ?' শুভঙ্কর বোসের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'এখন ? কোথায় ?' লালমোহনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে।

'গুহার দিকে।'

'গুহায় পাহারা নেই ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে, তবে চৌত্রিশটা গুহার জন্য মাত্র দুজন লোক। কাজেই বুঝতেই পারছেন...। আর ভদ্রলোক একটা ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন—লক্ষ করেছেন তো ? উনি আর আপনাদের বাংলোর হিপি-টাইপের লোকটি—দুজনেই ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। ওরও কিন্তু ভাবগতিক ভাল না। উনি কে সেটা জানতে পেরেছেন ?

লালমোহনবাবু বিষম খেতে গিয়ে সামলে নিলেন।

'উনি ? উনি ফটোগ্রাফ তোলেন। ফার্স্ট ক্লাস ফটো। আমাদের দেখিয়েছেন। এলোরার ফটো তুলছেন। চুংকিং-এর কী একটা পত্রিকার জন্য।'

বাংলো থেকে কে বেরোল ? মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে টর্চ, গায়ে ঢাউস রেনকোট। ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর কানের কাছে এসে তারস্বরে 'আফটার ডিনার ওয়াক এ

মাইল !'—বলে হেসে গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেলেন।

শুভঙ্কর বোসও 'গুড নাইট' বলে রক্ষিতের পথ ধরলেন। লালমোহনবাবু ভ্রুকুটি করে বললেন, 'এক মাইল হাঁটতে বললে কেন বলো তো লোকটা ?'

আমি বললাম, 'ভাল হজম হবে বলে।...চলুন, এখন তো বাংলো খালি, একবার ফেলুদার খোঁজ করা যাক। ওকে খবরগুলো দেওয়া দরকার। এরা সবাই গুহার দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।'

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাংলোয় ঢুকলাম। মিস্টার বোস সত্যি বললেন কি মিথ্যে বললেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে একবার গুহার দিকে যাওয়া উচিত। যদি কিছু ঘটে তা হলে রাত্রেই ঘটবে। এখনও আলো রয়েছে, গুহার আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা করলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

বাংলোর ভিতরে অন্ধকার। বাইরের চৌকিদারের ঘরে বোধহয় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আর কোথাও আলো নেই। কোনও শব্দও নেই।

রক্ষিতের ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ফেলুদার দরজাও বন্ধ কেন ? আর দরজার তলার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন ? ও কি এই সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ?

বারান্দার দিকে ঘরের জানালা। পা টিপে টিপে গেলাম সেদিকে। জানালার পর্দা টানা। এগিয়ে গিয়ে পর্দা ফাঁক করে দুবার চাপা গলায় ফেলুদার নাম ধরে ডাকলাম। কোনও উত্তর নেই। ও যদি বেরিয়েও থাকে, সামনের দরজা দিয়ে বেরোয়নি সেটা আমরা জানি। তা হলে কি চৌকিদারের ঘরের পাশে খিড়কি দরজাটা দিয়ে বেরোল ?

আমরা দুজন আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। বাতিটা জ্বালাতেই জানালার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা দেখতে পেলাম। তাতে ফেলুদার হাতে লেখা দুটো কথা—

'ঘরে থাকিস।'

'একটা কথা বলব তোমায়?' লালমোহনবাবু বললেন। 'এবার কিন্তু তোমার দাদাটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছেন। আমি তো এমনিতে আর বিশেষ কোনও রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না, তবে তোমার দাদার কার্যকলাপ পদে পদে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা ঘরে থাকতে বলেছে, কিন্তু কখন ফিরবে সেটা বলে যায়নি। অথচ ও যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ ঘুমোনোর কোনও কথাই ওঠে না। কী আর করি—আধ ঘণ্টা কোনওরকমে লালমোহনবাবুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলে কাটিয়ে দিলাম। তারপর লালমোহনবাবু বললেন যে ওঁর লেটেস্ট গল্পের প্লটটা আমায় বলবেন।—'এবার একটা নতুন রকমের ফাইট ইন্ট্রোডিউস করিচি যাতে হিরোর হাত-পা বাঁধা রয়েছে—কিন্তু তাও শুধু মাথা দিয়ে ভিলেনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে।'

মাথা দিয়ে মানে বুদ্ধি দিয়ে না মাথার গুঁতো দিয়ে সেটা জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় দেখি ফেলুদা হাজির। আমরা দুজনেই চুপ, কারণ জানি ও নিজে থেকে কিছু বলতে চাইলেই বলবে, জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হবে না।

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'লালমোহনবাবু, অন্যান্যবারের মতো এবারও কি আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে নাকি?'

এখানে বলে রাখি লালমোহনবাবুর অস্ত্র সংগ্রহ করার বাতিক আছে। সোনার কেল্লার ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একটা ভুজালি ছিল, আর বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে ছিল একটা বুমেরাং। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। বললেন, 'এবার আছে একটা বম্ব!'

'বম্ব?' আমি আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলাম। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'বম্ব। বোমা।'

লালমোহনবাবু তাঁর সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেছেন।—'আমাদের পাড়ার দ্বিজেন তরফদারের ছেলে উৎপল আর্মিতে আছে। সে মার্চ মাসে এসেছিল। এইটে আমায় এনে দিয়ে বললে—কাকাবাবু দেখুন আপনার জন্য কী এনিচি! বড় বড় যুদ্ধে

ব্যবহার হয়। —ছোঁড়া আমার লেখার খুব ভক্ত।'

একটা মাঝারি সাইজের টর্চলাইটের মতো লম্বা খয়েরি রঙের একটা বেশ ভারী পাইপ জাতীয় জিনিস লালমোহনবাবু সুটকেস থেকে বের করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা সেটা কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'এটা আমার কাছেই থাক। আপনার পক্ষে জিনিসটা বড় বেশি ডেঞ্জারাস।'

'কত মেটাগন হবে বলুন তো ?'

কথাটা আসলে মেগাটন, আর সেটা ব্যবহার হয় অ্যাটমবোমা সম্পর্কে। এক মেগাটন মানে দশ লক্ষ টন। ফেলুদা লালমোহনবাবুর প্রশ্নে কান না দিয়ে বোমাটা ঝোলায় পুরে বলল, 'একবার বেরোনো দরকার। সবাই বেরিয়েছে, আমাদের ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।'

ডাক বাংলো থেকে যখন বেরোলাম তখন সাড়ে এগারোটা। ঝিঁঝিঁটা এখনও ডাকছে। চাঁদের আলো কমছে-বাড়ছে, কারণ আকাশ টুকরো টুকরো চলন্ত মেঘে ছেয়ে গেছে। গেস্ট হাউসের একটা ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে। সেটা নাকি সেই আমেরিকানের ঘর। কে কোন ঘরে থাকে সেটাও নাকি ফেলুদা ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। মল্লিক আর শুভঙ্কর ফিরেছে কি না বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ থেকেই ঘন ঘন মেঘ ডাকছিল ; যখন বড় রাস্তার উপর এসে পড়েছি তখন একটা বড়রকম গর্জন শুনে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি পুব দিকটা কালো হয়ে আসছে। 'এই মরেছে ! বৃষ্টি আসবে নাকি ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'এত গুহা থাকতে বৃষ্টি এলে আশ্রয়ের অভাব হবে না', বলল ফেলুদা।

কৈলাসের দিকে উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোনও চেষ্টা না করে ফেলুদা বাঁ দিকের পথ ধরল। কিন্তু সে পথেও বেশি দূর না। খানিকটা গিয়েই সে দেখি পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওর কায়দাকানুন একটু আধটু জানি বলে আন্দাজ করলাম যে সামনের দিক দিয়ে ছাড়া গুহায়-ঢোকার

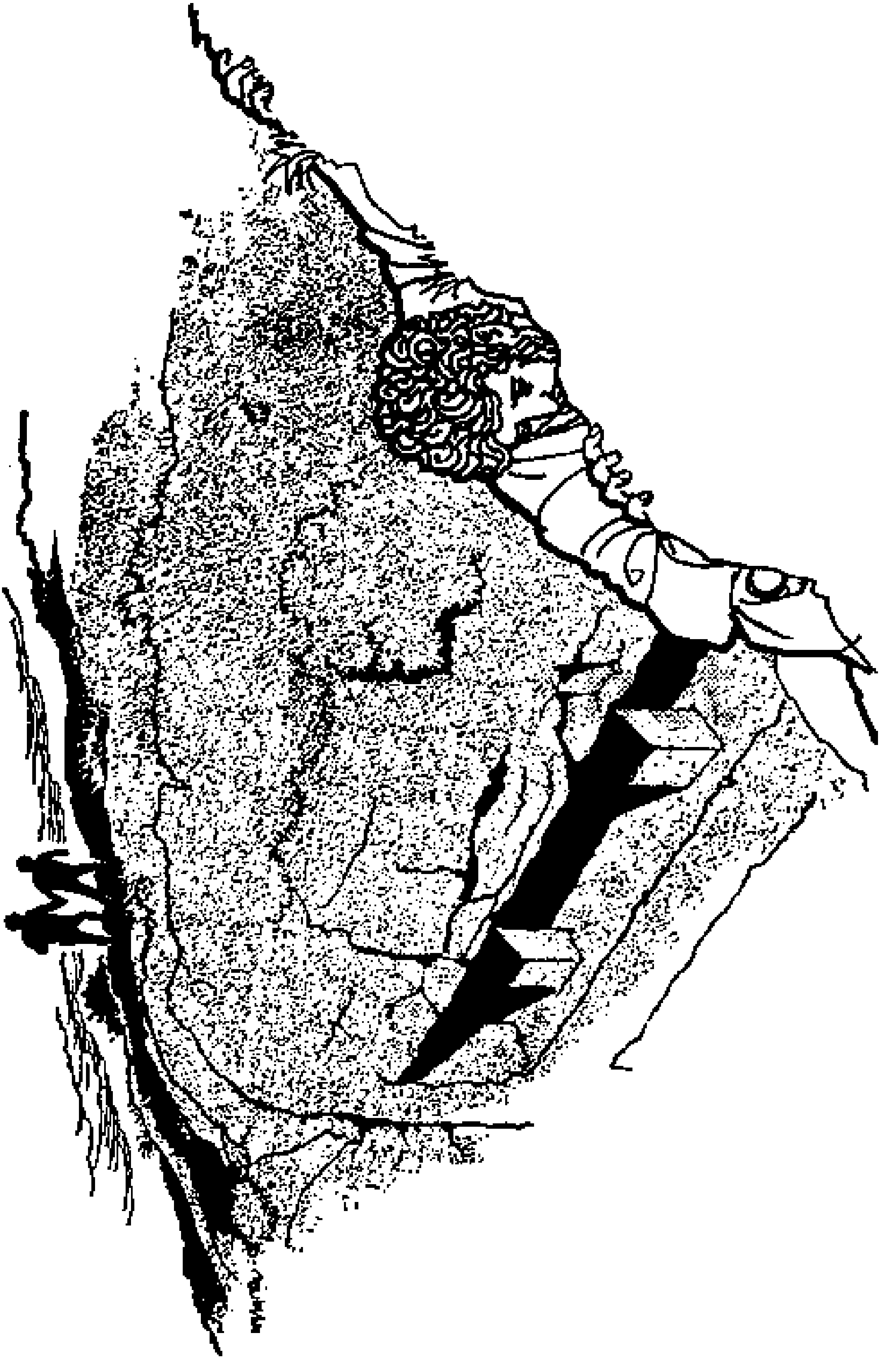

কোনও রাস্তা আছে কি না সেটাই ও একটু ঘুরে দেখতে চাইছে। আশেপাশে ঝোপঝাড় আর পাথরের টুকরো, কিন্তু এখনও চাঁদের আলো থাকায় সেগুলো কোনও বাধার সৃষ্টি করছে না।

এইবার ফেলুদা ডান দিকে মোড় নিল। বুঝলাম যে-দিক থেকে এসেছি সেদিকেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু রাস্তা দিয়ে নয় ; পাহাড়ের গা দিয়ে—রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে।

খানিকটা গিয়েই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দৃষ্টি ডান দিকে। আমরা থেমে সেইদিকে দেখলাম।

দূরে পশ্চিম দিকে ঠিক যেন মনে হচ্ছে জমির উপর একটা সিল্কের ফিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আসলে সেটা শহরে যাবার রাস্তা, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে।

সেই রাস্তা দিয়ে একজন লোক দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে গেস্ট হাউসের দিকে। অথবা বাংলোর দিকে। কারণ রাস্তা একটাই।

'মিস্টার রক্ষিত নন', ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু।

'কী করে বুঝলেন ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'রক্ষিতের গায়ে রেনকোট ছিল।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন লালমোহনবাবু।

লোকটা একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...

একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে আমরা তিনজন আবার থেমে গেলাম। কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা ?

ফেলুদা বসে পড়ল। আমরাও। সামনে একটা প্রকাণ্ড মনসার ঝোপ। সেটা আমাদের আড়াল করে রেখেছে।

আওয়াজটা আরও কিছুক্ষণ চলে থামল। তারপর সব চুপ।

এ কী—চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কেন ? আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সেই কালো মেঘটা চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে। আমরা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম। খানিকটা হাঁটার পর ডানদিকে কৈলাসের খাদটা পড়ল। খাদের পাশেই...ওই যে মন্দির। মন্দিরের চুড়ো এখন আমাদের সঙ্গে সমান লেভেলে।

চুড়োর পিছনে বেশ খানিকটা নিচুতে একটা ছাত—তার মাথায় চারটে সিংহ চারিদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে নীচে দুটো হাতি দুটো দেখা যাচ্ছে।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। আওয়াজটা এদিক থেকেই এসেছে সেটা বুঝেছিলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। হয়তো আছে, অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না। আমি জানি ফেলুদা টর্চ জ্বালাবে না, কারণ তা হলে অন্য লোক আমাদের কথা জেনে যাবে।

কৈলাসের খাদের পর কিছু দূর গিয়ে আরেকটা খাদ। এটা পনেরো নম্বর গুহা। সেটা ছাড়িয়ে তার পরের গুহাটার দিকে এসেছি। এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ থেমে টান হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস কথা—

'টর্চ জ্বেলেছে। পনেরো নম্বর গুহার ভিতরে। তার ফলে গুহার বাইরের আলোটা একটু বেড়েছে।'

আমি ব্যাপারটা লক্ষ করিনি। লালমোহনবাবুও না। ফেলুদার চোখই আলাদা।

দু মিনিট প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ফেলুদা একটা ব্যাপার করল। একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ওপর থেকে গুহার সামনের চাতালটায় ফেলল। টুপ করে একটা শব্দ পেলাম।

তারপর বুঝতে পারলাম চাতালটা হঠাৎ যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। তার মানে টর্চটা নিভল। আর তার পরেই একটা লোক নিঃশব্দে চোরের মতো গুহা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।

'মিস্টার রক্ষিত না', আবার ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু। লোকটাকে চিনতে না পারলেও, তার গায়ে যে রেনকোট নেই সেটা আমিও বুঝেছিলাম।

এরপর এল আমার জীবনের সবচেয়ে লোমখাড়া করা সময়। ফেলুদা ইতিমধ্যে নীচে যাবার একটা রাস্তা বার করে ফেলেছে। রাস্তা না বলে বোধ হয় উপায় বলা উচিত। খানিকটা লাফিয়ে,

খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে, খানিকটা বাঁদরের মতো ঝুলে, খানিকটা মাটির উপর ঘসটে, সে দেখতে দেখতে নীচে গুহার সামনেটায় পৌঁছে গেল। লালমোহনবাবু চাপা গলায় বললেন, 'গোয়েন্দাগিরিতে ফেল করলে সার্কাসের চাকরি বাঁধা।' পরমুহূর্তেই দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মানে গুহার ভিতর ঢুকেছে। আমার কিন্তু ঘাম ছুটে লোমটোম খাড়া হয়ে গেছে।

প্রায় তিন মিনিট (মনে হচ্ছিল তিন ঘন্টা) পরে আবার দেখতে পেলাম ফেলুদাকে। তারপর আরম্ভ হল উলটো কসরত। উপর থেকে নীচের বদলে নীচের থেকে উপরে। এক হাতে টর্চ কাঁধে ব্যাগ আর কোমরে রিভলভার নিয়ে কী ভাবে এরকম ওঠা নামা সম্ভব তা ও-ই জানে। উপরে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এটার নাম দশাবতার গুহা। দোতলা। দুর্দান্ত সব মূর্তি আছে। লোভনীয়।'

'লোকটা কে ছিল বুঝলে ?'—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'যত সহজ ভেবেছিলাম, তা নয়। প্যাঁচ আছে। রহস্য আছে। মাথা খাটাতে হবে।'

পাহাড় থেকে নেমে এসে বুঝলাম তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। ফেলুদা কৈলাসের সামনে গিয়ে পাহারাদারের সঙ্গে দেখা করল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে গত ঘন্টাখানেকের মধ্যে কোনও গোলমেলে ব্যাপার লক্ষ করেনি। অবিশ্যি ও যেখানে পায়চারি করছে সেখান থেকে খাদের উপরটা দেখা যায় না ; মন্দিরের চুড়োয় ঢাকা পড়ে।

'কোনও শব্দ-টব্দ শোনোনি ?'—ফেলুদা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল।

না, শব্দও শোনেনি। এমনিতেই মেঘ ডাকছে ঘন ঘন, শব্দ কী করে শুনবে ?

'একবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখতে পারি ?'

জানতাম লোকটা না বলবে, আর বললও তাই।

'নেহি বাবু, অর্ডার নেহি হ্যায়।'

ফেরার পথে বাংলোর কাছাকাছি এসে একটা অদ্ভুত জিনিস

দেখলাম। আমরা আসছিলাম পুব দিক দিয়ে। বাংলোর পুব দিকের দেয়ালে দুটো জানালা রয়েছে—একটা রক্ষিতের ঘরের, একটা ফেলুদার ঘরের। ফেলুদার ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু রক্ষিতের ঘরের ভেতর একটা আলোর তাণ্ডব চলেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা টর্চের আলো, কিন্তু সেটা কেন যে পাগলের মতো এদিক ওদিক করছে সেটা বোঝা মুশকিল। একবার আলোটা জানালার কাছে এল। বুঝলাম সেটা গেস্ট হাউসের দিকে ফেলা হচ্ছে। আলোটা ঝোপঝাড়ের উপর ঘোরাফেরা করে আবার ঘরে ফিরে গেল। ফেলুদা চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং।'

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

॥ ৮ ॥

আমি অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো কখন যে কোন রাস্তায় চলবে সেটা আগে থেকে বোঝা ভারী মুশকিল হয়। কিছুদূর হয়তো আন্দাজ-মাফিক গেল, তারপর হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য রাস্তার মোড় গেল ঘুরে; ফেলুদার মাথা আশ্চর্য ঠাণ্ডা বলে ও বাধা পেলেও বা বেকায়দায় পড়লেও কখনও দিশেহারা হয় না। কিন্তু আজ একটা ব্যাপারে তাকে বেশ বিরক্ত হতে দেখলাম।

কাল রাত্রে কৈলাসের ওপরে গিয়ে যে শব্দটা শুনেছিলাম, সে ব্যাপারে একটু তদন্তের দরকার বলে আমরা ঠিক করেছিলাম ভোরে ভোরেই কৈলাস চলে যাব। ফেলুদা রাত্রে মেক-আপ তুলে শুয়েছিল, আজ সকালে আমাদেরও আগে উঠে সে তৈরি হয়ে নিয়েছে, আর আমিও সিঁথিটা ডান দিকে করে নিয়েছি। লালমোহনবাবুও কোনও একটা কিছু মেক-আপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা বারণ করাতে চুপ করে গেলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুহা খুলে যায়, লোক ঢুকে দেখতে পারে। সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে বেরিয়ে ছ'টার মধ্যে গুহায় পৌঁছে বাইরে

বড় বড় গাড়ি আর লোকজনের ভিড় দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম।

আরেকটু কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। ফিল্ম কোম্পানি এসেছে, কৈলাসে শুটিং হবে! একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে সুটিং দেখেছিলাম, তখন রিফ্লেক্টর জিনিসটা দেখে চিনে রেখেছিলাম; এবারও সেই রিফ্লেক্টর দেখেই শুটিং-এর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, 'সেরেছে—এরা আর জায়গা পেল না? শেষটায় কৈলাসের শ্রাদ্ধ করতে এসেছে?'

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে দলটা বোম্বাই থেকে এসেছে, হিন্দি ফিল্মের শুটিং হচ্ছে। যারা অ্যাকটিং করবে তারা নাকি এখনও এসে পৌঁছয়নি, তবে অন্য সব কাজের লোক বেশির ভাগই এসে পড়েছে।

একজন ইয়ং ছেলের প্যান্টের পকেট থেকে একটা বাংলা ফিল্ম পত্রিকার খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে দেখে লালমোহনবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বই হচ্ছে ভাই?' ছেলেটি বলল, 'ক্রোড়পতি।'

'কে কে পার্ট করচে?'

'টপ কাস্টিং। এখানে আসছে রূপা, অর্জুন মেরহোত্রা আর বলবন্ত চোপরা। হিরোইন, হিরো আর ভিলেন।'

অর্জুনের নাম শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'গান হবে নাকি ভাই?'

'না। ফাইট। স্টান্টম্যান, ডাবল—সব এসেছে। হিরো ভিলেনকে চেজ করবে, ভিলেন গুহা থেকে মন্দিরের ভেতর ঢুকে যাবে।'

'আর হিরোইন?'

'হিরোইন সাইডের একটা কেভের মধ্যে রয়েছে। ওখানে ভিলেন ওকে অ্যাটাক করছে। হিরো এসে পড়ছে, ভিলেন পালাচ্ছে। ক্লাইম্যাক্স মন্দিরের চুড়োয়।'

'চুড়োয়!'

'চুড়োয়।'

'পরিচালক কে?'

'মোহন শর্মা। কিন্তু এই শুটিংটায় থাকছে ফাইট ডাইরেক্টর আপ্পারাও।'

আরও জিজ্ঞেস করে জানলাম যে শুটিং হতে হতে দশটা, আর দুপুরেই কাজ শেষ। তার মানে আজকের দিনটা এরাই কৈলাসটা দখল করে রাখবে।

'তাজ্জব ব্যাপার!' ফেলুদা বলল।—'এই পারমিশনটা পাওয়া কীভাবে সম্ভব হল জানতে ইচ্ছে করে। টাকায় কীই না করে।'

ভেতরে না ঢুকতে পারলেও কাল রাত্রে যেখানে পাহাড়ের উপরে খাদের পাশটায় গিয়েছিলাম, সেখানে যেতে আশা করি কোনও অসুবিধা নেই। তাই ভেবে কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু সে গুড়েও বালি। আমাদের আগেই ফিল্মের দলের কিছু লোক সেখানে হাজির হয়ে গেছে। তার মধ্যে একজন বোধহয় ক্যামেরাম্যান, কারণ সে ডান হাতের আঙুলগুলো ফুটোস্কোপের মতো করে চোখের সামনে পাকিয়ে ধরে মন্দিরের চুড়োর দিকে দেখছে। মন্দিরের ভিতর কিন্তু এখনও কোনও লোক ঢোকেনি। নীচে থাকতেই জেনেছিলাম পারমিশনের চিঠিটা নাকি অন্য গাড়িতে আসছে। দারোয়ান যতক্ষণ না চিঠিটা দেখছে ততক্ষণ কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।

ফেলুদা জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এরা আমাদের কাজটা পণ্ড করতেই এসেছে। চল, একবার পনেরো নম্বর গুহাটায় যাই—ভাল মূর্তি আছে। এই উদাত্ত পরিবেশে ফিল্ম কোম্পানির কচকচি ভাল লাগছে না।'

আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম তার উলটোদিক দিয়ে নেমে পনেরো নম্বর গুহার দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম মেন রোড দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হলদে আমেরিকান গাড়ি কৈলাসের দিকে আসছে। বুঝলাম হিরো হিরোইন ভিলেন আর ফাইট ডাইরেক্টর এসে গেছেন।

পনেরো নম্বর গুহাই হল দশাবতার গুহা। তার সামনে পৌঁছানোর আগেই দুই অবতারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন হলেন মিস্টার রক্ষিত, আর অন্যজন মিস্টার ল্যাইসন। গুহার মুখটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দুজন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমেরিকানটি, 'আই সি নো পয়েন্ট ইন মাই স্টেইং হিয়ার এনি লঙ্গার' বলে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মিস্টার রক্ষিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে তেতো হাসি হেসে বললেন, 'এখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্বন্ধে কমপ্লেন করছিল। বলছে ডিমটা পর্যন্ত ঠিক করে ভাজতে জানে না, আর আশা করে যে আমরা এখানে এসে ডলার ঢেলে দিয়ে যাব। টাকার গরম আর কী!'

ফেলুদা বলল, 'আশ্চর্য তো। শুনেছিলাম আর্টের সমঝদার, আর এখানে এসে ডিম ভাজার কথাটাই মনে হল?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমেরিকায় ডিম কী করে ভাজে মশাই?'

রক্ষিত কী জানি একটা উত্তর দিতে গিয়ে আর দিতে পারলেন না। কৈলাসের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার এসে আমাদের সকলেরই পিলে চমকে দিয়েছে। লালমোহনবাবু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ফাইট শুরু হয়ে গেছে মশাই! ভিলেন চ্যাঁচাচ্ছে!'

চিৎকারের পর আরও অন্য গলায় চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। ফাইট হলে এত লোক চেঁচাবে কেন? আমরা ফেলুদার পিছন পিছন ব্যস্তভাবে কৈলাসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এত ছুটোছুটি গোলমাল কীসের জন্য?

যখন গেটের কাছাকাছি এসে গেছি তখন দেখলাম চার পাঁচজন লোক চ্যাংদোলা করে একটি বেগুনি হাওয়াইয়ান শার্ট পরা লোককে হলদে গাড়িটার দিকে নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এল হিরো হিরোইন আর ভিলেন। এদের তিনজনেরই মুখ চেনা। রূপা

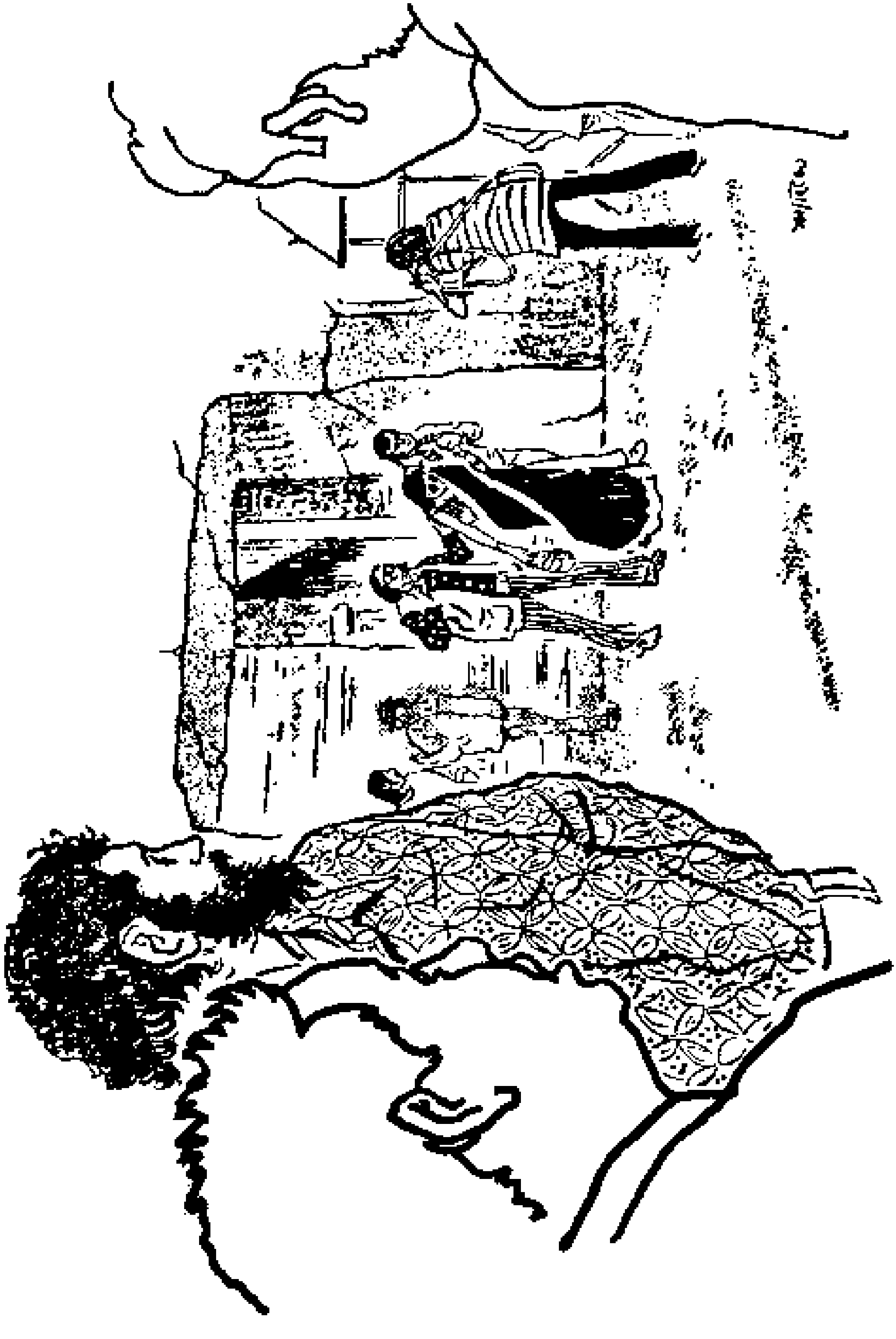

অর্জুনের কাঁধে ভর করে এগিয়ে আসছে, বলবন্ত তাদের পাশেই মাথা হেঁট করে রূপার কাঁধে একটা হাত দিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এবারে সেই বাঙালি ছেলেটিকে দেখে আমরা চারজনেই তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কী হয়েছে মশাই ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'লাশ পড়ে আছে মন্দিরের পেছন দিকে...হরিবল ব্যাপার...হাড়গোড় সব...'

'চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল কাকে ?'

'আপ্পারাও। উনিই প্রথম দেখলেন, আর দেখেই সেন্সলেস।'

ফেলুদা আর মিস্টার রক্ষিত আগেই মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিল। এবার আমরা দুজনও গেলাম। ফিল্মের লোকজন সব বেরিয়ে আসছে, বুঝলাম শুটিং আর হবে না।

মন্দিরের বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, ডানদিকে কৈলাসের নীচের দিকটায় সারি সারি হাতি আর সিংহের মূর্তি ; মনে হয় তারাই যেন মন্দিরটাকে কাঁধে করে রয়েছে। সামনে মোড় ঘুরে ডান দিকে গিয়েই বোধহয় মৃতদেহ, কারণ সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা পৌঁছানোর আগেই মিস্টার রক্ষিত ভিড় থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওদিকে যাবেন না। বিশ্রী ব্যাপার।' আমারও যে খুব একটা যাবার ইচ্ছে ছিল তা নয়, কারণ এ ধরনের রক্তাক্ত দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে না ; তবু কে মারা গেছে জানার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। সে কৌতূহলটা মিটিয়ে দিল ফেলুদা। মিস্টার রক্ষিত চলে আসবার এক মিনিটের মধ্যেই ফেলুদাও ফিরে এসে বলল, 'শুভঙ্কর বোস। মনে হয় পাহাড়ের উপর থেকে সোজা পড়েছেন পাথরের মাটিতে।'

লালমোহনবাবু শুনলাম বিড়বিড় করে বলছেন, 'আশ্চর্য। ঠিক এইভাবেই মরবার কথা ঘনশ্যাম কর্কটের।'

ফেলুদা আবার বাইরের দিকে চলেছে, আমরা দুজন তার পিছনে। মিস্টার রক্ষিত এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের আসতে দেখে থেমে বললেন, 'কাল রাত্রে যখন এদিকটায় বেড়াতে আসি,

তখনই দেখলাম ভদ্রলোক পাহাড়ের উপর উঠছেন। আমি বারণ করেছিলাম। ভদ্রলোক আমার কথায় কানই দিলেন না। তখন কি জানি যে লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?'

মিস্টার রক্ষিত চলে গেলেন। একটা নতুন কথা বলে গেলেন বটে ভদ্রলোক। আত্মহত্যার কথাটা আমার মনেই হয়নি। ফেলুদা মিস্টার রক্ষিতের কথায় যেন আমল না দিয়েই আবার কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল।

আধঘণ্টা আগেই দেখেছিলাম খাদের পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, এখন দেখছি একটি লোকও নেই। মনে মনে বললাম শুভঙ্কর বোস মরে গিয়ে আমাদের কাজের সুবিধে করে দিয়েছেন।

ফেলুদা দেখলাম বেশ বেপরোয়াভাবে এগিয়ে গিয়ে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাড় নিচু করে মন্দিরের পিছনে যেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানটা দেখছে। যেখান থেকে পড়েছেন শুভঙ্কর বোস, সেই জায়গাটা আন্দাজ করে ও খাদের আশপাশটা খুব ভাল করে দেখতে লাগল।

মাটিতে একটা গর্ত। লোক চলাচলে মাটি ঢুকে সেটা খানিকটা বুজে এসেছে, কিন্তু তাও ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা স্কেলটা খুলে তার মধ্যে ঢোকাতে সেটা প্রায় দেড় হাত ভেতরে চলে গেল। গর্তটা খাদ থেকে হাত তিনেক দূরে। এবার ফেলুদা গর্তটার ঠিক সামনে খাদের ধারটা পরীক্ষা করতে লাগল। আমি আর লালমোহনবাবুও দেখছি আর বেশ বুঝতে পারছি কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খাদের ধারের মাটির উপর একটা গভীর খাঁজ পড়েছে।

'কিছু বুঝতে পারছিস, তোপ্‌সে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। আমি চুপ করে আছি দেখে সে নিজেই উত্তর দিল—

'এটা দড়ির দাগ। একটা শাবল গোছের জিনিস গভীরভাবে পুঁতে সেটায় একটা দড়ি বেঁধে খাদের ভিতর ঝুলিয়ে সেটা ধরে কেউ নেমেছিল বা নামতে চেষ্টা করেছিল। কাল রাত্রে খস খস শব্দটা মনে পড়ছে? সেটা ছিল দড়িটাকে টেনে তোলার শব্দ। সামনে দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, তাই পিছন দিয়ে ঢোকার এই

ব্যবস্থা।'

লালমোহনবাবু বললে, 'কিন্তু দড়ি হলে...একশো ফুট...মানুষ ধরে নামবে...সে তো মোক্ষম দড়ি হতে হবে মশাই!'

'নাইলনের দড়ি। হালকা, অথচ প্রচণ্ড শক্ত', বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'তার মানে তো শুভঙ্কর বোস ছাড়া আরেকজন লোক ছিল!'

'ন্যাচারেলি। সেই লোকই দড়ি টেনে তুলেছে, সেই শাবল-দড়ি সরিয়ে ফেলেছে। সে শুভঙ্কর বোসের শত্রু বা মিত্র সেটা এখনও ষোলো আনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে একটা কারণে শত্রু বলেই মনে হয়।'

আমরা ফেলুদার দিকে চাইলাম। ফেলুদা তার শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে হাতের তেলোয় ধরে আমাদের দেখাল।

একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। নীল রঙের কাপড়। কাল কাকে দেখেছি নীল শার্ট গায়ে?

মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক।

'কোথায় পেলে ওটা?'—কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। ফেলুদা বলল, 'উপুড় হয়ে পড়েছিল শুভঙ্কর বোস। হাত দুটো ছড়ানো। বাঁ হাতটা মুঠো অবস্থায়। দু আঙুলের মাঝখান দিয়ে টুকরোটা বেরিয়ে ছিল। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় খাদের ধারে। শুভঙ্কর শার্ট খামচিয়ে ধরে। তারপর পড়ে যায়। টুকরোটা হাতে ছিঁড়ে আসে।'

'ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন। 'ত্-তার মানে তো ম্-মার্ডার!'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় কোনও মন্তব্য না করে গম্ভীরভাবে বলল, 'একটা কথা বলতেই হবে—কৈলাস এখনও অক্ষত রয়েছে, আর সেটার জন্য দায়ী শুভঙ্কর বোস। তিনি মরলেন বলেই মূর্তি চোরকে কাজ না সেরেই পালাতে হল। আর সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে গেল। কৈলাসে সত্যিই লাশ পাওয়া গেল!'

খাদের মাথা থেকে যখন নীচে নামলাম ততক্ষণে ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা সরে পড়েছে। তার বদলে এখন স্থানীয় লোকের ভিড়। আর আমেরিকান গাড়ির বদলে রয়েছে একটা জিপ। একজন বছর পঁয়ত্রিশের স্মার্ট ভদ্রলোক ফেলুদাকে দেখে এগিয়ে এলেন। ইনিই নাকি মিস্টার কুলকার্নি—টুরিস্ট গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। ফেলুদার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা হল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল রাত্রে যে মিস্টার বোস ফেরেননি সেটা আজ ভোরে জানা গেছে। একটি বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম ওর খোঁজ করতে, সে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে।'

'এখন কী ব্যবস্থা হচ্ছে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। কুলকার্নি বললেন, 'আওরঙ্গাবাদে খবর পাঠানো হয়েছে। সি ডি ভ্যান আসছে, ডেডবডি মর্গে নিয়ে যাবে। মিস্টার বোসের ভাই আছেন দিল্লিতে। লাশ সনাক্ত করার ব্যাপারে তাকে খবর পাঠানো হচ্ছে। ভেরি স্যাড। ভদ্রলোক সত্যিই পণ্ডিত ছিলেন। আগেও একবার এসেছিলেন—সিক্সটি এইটে। গেস্ট হাউসেই ছিলেন। এলোরার ওপর বই লিখছিলেন।

'আপনাদের এখানে থানা নেই?'

'একটা পুলিশ আউটপোস্ট আছে। ছোট জায়গা তো! একজন অ্যাসিসস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর চার্জে আছেন। মিস্টার ঘোটে। আপাতত ডেডবডি ইনসপেক্ট করছেন।'

'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?'

'সার্টেনলি!...ভাল কথা—'

কুলকার্নি কী যেন একটা গোপনীয় কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু আমরা দুজন বাইরের লোক রয়েছি বলে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি এদের সামনে বলতে পারেন।' কুলকার্নি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আজ সকালে বম্বেতে একটা ট্রাঙ্ক কল হয়েছে।'

'মল্লিক?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল নোট করেছেন ?'

কুলকার্নি পকেট থেকে একটা কাগজের স্লিপ বার করে সেটা থেকে পড়ে বললেন, 'মে বালু আচে । আজ রওয়ানা হচি ।'

মেয়ে ভাল আছে, আজ রওনা হচ্ছি। আবার সেই মেয়ের ব্যাপার।

'যাবার কথা বলেছে কিছু ?' ফেলুদা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন করল।

কুলকার্নি বললেন, 'উনি তো আজই সকালে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবেই একটা ফন্দি বার করে যাওয়াটা পিছিয়ে দিয়েছি। ওর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টিপে দিয়েছি। ডিফারেনসিয়াল গণ্ডগোল—গাড়ি সারাতে টাইম লাগবে।'

'ব্রাভো ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

ফেলুদার তারিফে কুলকার্নির চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'ভাল কথা—আপনার এই ঘোটে লোকটি কেমন ?'

'বেশ লোক। তবে মনমরা হয়ে থাকে। এ জায়গা তার ভাল লাগে না। কবে প্রোমোশন হবে, আওরঙ্গাবাদে পোস্টেড হবে, তাই দিন গুনছে। ...আসুন না, আলাপ করিয়ে দিই।'

মিস্টার ঘোটে কেভ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কাছাকাছির মধ্যেই ছিলেন, কুলকার্নি তাঁকে ডেকে এনে ফেলুদাকে 'বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ' বলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট, চওড়াতেও প্রায় ততখানিই বলে মনে হয়, তার উপরে আবার চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ। কিন্তু মোটা হলে কী হবে, হাঁটাচলা বেশ চটপটে।

ঘোটের সঙ্গে কথা বলার আগে ফেলুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা বরং বাংলোয় ফিরে যা—আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।'

কী আর করি। গেলাম ফিরে বাংলোয়। ভোরে শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তাই বেশ খিদে পাচ্ছিল। বারান্দায় গিয়ে চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে দুজনের জন্য ডিমরুটি করতে বলে

দিলাম।

ঘরে ফিরে এসে দেখি লালমোহনবাবু কেমন যেন বোকা বোকা ভাব করে খাটে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আমরা কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম ?'

আমি বললাম, 'না তো। নেবার মতো কীই বা আছে বলুন! তা ছাড়া এরা তো সকালবেলা ঘর ঝাড়পোঁছ করে, তাই...কেন, কিছু হারিয়েছে নাকি ?'

'না, কিন্তু জিনিসপত্তর সব ওলটপালট হয়ে আছে। আমার খাটে বসে আমার বাক্স ঘেঁটেছে। এই কিছুক্ষণ আগে। খাট এখনও গরম হয়ে আছে। তোমার বাক্সটা দেখো তো।'

সুটকেসটা খোলামাত্র বুঝতে পারলাম সেটা কেউ ঘাঁটাঘাটি করেছে। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানে নেই। শুধু বাক্স না, বালিশ-টালিশও এদিক ওদিক হয়ে আছে। এমন কী খাটের তলাতেও যে খুঁজেছে সেটা আমার চটি জোড়া যেভাবে রাখা হয়েছে তার থেকে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবু বললেন, 'কীসের জন্য সবচেয়ে ভয় ছিল জান ? আমার নোটবুকটা। সেটা দেখছি নেয়নি।'

'অন্য কিছু নিয়েছে নাকি ?'

'কই, কিছুই তো নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তোমার ?'

'আমারও তাই। কিছুই নেয়নি। যে এসেছিল সে বিশেষ কোনও একটা জিনিস খুঁজতে এসেছিল। সেটা পায়নি।'

'একবার চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ?'

কিন্তু চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। সে বাজার করতে গিয়েছিল, তখন যদি কেউ এসে থাকে। এখানে কোনওদিন কিছু চুরিটুরি যায় না, কাজেই বাইরের লোক এসে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাটি করে যাবে এটা তার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগল।

হঠাৎ মনে হল ফেলুদার ঘরে লোক ঢুকেছিল কি না জানা দরকার। গিয়ে দেখি ফেলুদা দরজা লক করে গেছে। সেটার অবিশ্যি একটা কারণ আসছে। ও নিজে ছদ্মবেশে রয়েছে বলে ওর

একটু সাবধান হতে হয়। লালমোহনবাবু বললেন, 'একবার মিস্টার রক্ষিতকে জিজ্ঞেস করবে নাকি ?'

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে টর্চের খেলা দেখে আমার এমনিই রক্ষিত সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবুর প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে দুজনে ভদ্রলোকের দরজায় গিয়ে আস্তে করে টোকা মারলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা খুলে গেল।

'কী ব্যাপার ? ভেতরে এসো।'

ভদ্রলোক যে খুব একটা খুশি খুশি ভাব দেখালেন তা নয় ; তাও যখন ডাকছেন তখন গেলাম।

'আপনার ঘরেও কি লোক ঢুকেছিল ?' লালমোহনবাবু ঢুকেই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে তাকাতেই বুঝলাম ভাবগতিক ভাল না। চাপা অথচ ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আপনাকে বলে তো লাভ নেই, কারণ আপনি কানে শোনেন না, কাজেই আপনার ভাগনেটিকেই বলছি—লোক শুধু ঢোকেনি, আমার একটি অত্যন্ত কাজের জিনিস সযত্নে তুলে নিয়ে গেছে।'

'কী জিনিস ?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার রেনকোট। বিলিতি রেনকোট। আজ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবহার করছি !'

মেজোমামা চুপ। কালা সেজে আছেন। আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে তাকে খবরটা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'কাল রাত্রে নিয়েছিল কি ? কাল দেখলুম আপনি কী যেন খুঁজছেন। আপনার টর্চটা...'

'না। কাল রাত্রে একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছিল। বাতি নিভিয়ে টর্চ জ্বেলে সেটাকে তাড়াতে চেষ্টা করছিলুম। কাল আমার কোনও জিনিস খোয়া যায়নি। গেছে আজ সকালে। আর আমার ধারণা সেটা নিয়েছে চৌকিদারের ওই ছেলেটা।'

এ কথাটাও চেঁচিয়ে মেজোমামাকে শুনিয়ে দিলাম। উনি বললেন, 'শুনে দুঃখিত হলাম। ছেলেটির দিকে চোখ রাখতে হয় এবার থেকে।'

এর পরে আর কিছু বলার নেই। আমরা ভদ্রলোককে ডিসটার্ব করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চৌকিদার ডিমরুটি এনে দিয়েছিল, দুজনে খাবার ঘরে বসে খেলাম। আমেরিকায় ডিম কী করে ভাজে জানি না, আমাদের এই খুলদাবাদের ডিম ফ্রাই বেশ ভালই লাগছিল। ঘরে কে ঢুকে থাকতে পারে সেটা ভাবতে মনটা খচ খচ করছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা হয়তো সত্যিই চৌকিদারের ওই ছেলেটা। ও মাঝে মাঝে বাংলোর পশ্চিমদিকের মাঠটায় পায়চারি করে, আর পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে দেখে, সেটা লক্ষ করেছি।

যদিও ফেলুদা বাংলোয় ফিরে যেতে বলেছিল, তার মানে যে ঘরেই বসে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে কি? চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা বাংলোর বাইরে রাস্তায় এলাম।

বাংলোর ঠিক সামনে থেকে গেস্ট হাউসটা দেখা যায় না, একটা অচেনা গাছ সামনে পড়ে। গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ পেয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। এবার গেস্ট হাউসটা দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গাবাদ থেকে যে ট্যাক্সিটা মিস্টার রক্ষিত আর ল্যুইসনকে নিয়ে এসেছিল, সেটা যাবার জন্য তৈরি, ছাতের উপর মাল চাপানো রয়েছে, আমেরিকান ক্রোড়পতি মিস্টার স্যাম ল্যুইসন বেয়ারাকে বকশিশ দিচ্ছেন।

কিন্তু ইনি আবার কে?

আরেকটি লোক গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ল্যুইসনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছেন। ল্যুইসন দুবার মাথা নাড়ল। তার মানে কোনও একটা প্রস্তাবে রাজি হল। এবার অন্য ভদ্রলোকটি আবার গেস্ট হাউসে ঢুকে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে বেরোলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ডালা খুলে দিল। বাক্স ভিতরে ঢুকে গেল। ডালা বন্ধ হল। আমার বুকের ভিতর ভীষণ ধুকপুকুনি। লালমোহনবাবু আমার হাত খামচে ধরলেন।

জয়ন্ত মল্লিক নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে আমেরিকানের সঙ্গ নিয়ে পালাচ্ছেন।

ড্রাইভার তার জায়গায় গিয়ে বসল।

'চৌকিদারের সাইকেল !'—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট দেবার শব্দ পেলাম।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে কোনও রকমে টেনে হিঁচড়ে সাইকেলটি বাইরে আনলাম।

'উঠে পড়ুন।'

লালমোহনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি জীবনে এই প্রথম সাইকেলের পিছনে চাপলেন। আমি জানি অন্য সময় হলে চাপতেন না—কিন্তু অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া গতি নেই।

ট্যাক্সি বেরিয়ে চলে গেছে। আমি প্রাণপণে পেডাল করে চলেছি। জটায়ু আমার কোমর খামচে ধরেছেন। সাত বছর বয়সে সাইকেল চালাতে শিখেছি। ফেলুদাই শিখিয়েছিল। অ্যাদ্দিনে সেটা কাজে দিল।

বিশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেলাম। ওই যে ফেলুদা—ওই যে ঘোটে, কুলকার্নি।

'ফেলুদা ! মিস্টার মল্লিক পালিয়েছেন—সেই আমেরিকানের ট্যাক্সিতে—এই পাঁচ মিনিট আগে !'

এই একটা খবরের দরুন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটে গেল যে, এখনও ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। জিপও যে ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম জানলাম। আমি আর জটায়ু পিছনে ঘাপটি মেরে বসে আছি, সামনে ড্রাইভারের পাশে ঘোটে আর ফেলুদা, দেখতে দেখতে ট্যাক্সি কাছে চলে আসছে, তারপর হর্ন দিতে দিতে সেটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল, ক্রোড়পতি ল্যাইসনের চোখরাঙানি আর বাছাই বাছাই মার্কিনি গালির বিস্ফোরণ, আর তারই মধ্যে মল্লিকের ফ্যাকাসে মুখ, একবার বাধা দিতে গিয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়া, আর তারপর ঘোটে তার সুটকেস খুলল, আর তা থেকে টার্কিশ টাওয়েলের পাঁচ খুলে বেরোল যক্ষীর মাথা, আর লালমোহনবাবুর হাঁফ ছেড়ে বলা এন্ডস ওয়েল দ্যাট অলস ওয়েল, আর ল্যুইসনের হাঁ হয়ে যাওয়া আর দুবার 'বাট...বাট' বলা, আর সবশেষে ল্যুইসন ট্যাক্সি করে আওরঙ্গাবাদ, আর আমরা বামাল সমেত চোর গ্রেপ্তার করে

খুলদাবাদ।

মল্লিক অবিশ্যি এখন ঘোটের জিম্মায়। অর্থাৎ তিনি এখন খুলদাবাদ পুলিশ আউটপোস্টের বাসিন্দা। ভদ্রলোক এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনও কথাই বলতে পারেননি।

ঘোটে আমাদের গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিলেন, কারণ কুলকার্নি ওখানে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 'মিশন সাকসেসফুল' শুনে কুলকার্নি অবিশ্যি দারুণ খুশি হলেন, কিন্তু ফেলুদা যেন তার উৎসাহে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলেই বলল যে, এখনও কাজ বাকি আছে। —'আর তা ছাড়া আপনি বম্বের ওই নাম্বারটা নিয়ে কিন্তু এনকোয়ারিটা করবেন, আর খবর পেলেই আমাকে জানাবেন।'

শেষের ইনস্ট্রাকশনটার ঠিক মানে বোঝা গেল না, তবে এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন আছে বলেও মনে হল না।

কুলকার্নি সকলের জন্য কফি বলেছিলেন, সেটা খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ল আমাদের ঘরে যে লোক ঢুকে জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, আর রক্ষিতের ঘর থেকে রেনকোট চুরি গেছে, সে খবরটা ফেলুদাকে দেওয়া হয়নি। সেটা ওকে বলাতে ও কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুটি করে ভাবল। তারপর কুলকার্নিকে জিজ্ঞেস করল চৌকিদার লোকটি কেমন।

'কে, মোহনলাল? ভেরি গুড ম্যান। সতেরো বছর চৌকিদারি করছে, কোনও দিন কেউ কমপ্লেন করেনি।'

ফেলুদা আরেকটু ভেবে বলল, কোনও জিনিস নেয়নি বলছিস?'

আমি বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললাম, আর সেই সঙ্গে এটাও বললাম যে রক্ষিত চৌকিদারের ছেলেকে সন্দেহ করছে।

'চলুন, লালমোহনবাবু—আপনি বলছেন লোকটা আপনার খাটে বসে খাট গরম করে দিয়েছিল—আপনার বাক্সে কী আছে একবার দেখে আসি। আমরা চলি, মিস্টার কুলকার্নি। এটা আপাতত আপনার জিম্মাতেই থাক।'

তোয়ালেতে মোড়া যক্ষীর মাথাটা ফেলুদা কুলকার্নিকে দিয়ে

দিল। তিনি সেটা তাঁর আপিসের সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে চাবি দিয়ে দিলেন। ফেলুদা বলে এল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।

বাংলোয় এসে আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর জিনিস খুব ভাল করে ঘেঁটে দেখল। জামাকাপড় ছাড়া লালমোহনবাবুর সুটকেসে যা ছিল তা হল একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, দু খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, তাঁর নোটবুক, আর বেলুচিস্তানের বিষয়ে একটা ইংরিজি বই। নোটবুকটা ফেলুদা এতক্ষণ ধরে উলটে পালটে দেখল কেন সেটা বুঝতে পারলাম না। সব দেখাটেখা হয়ে গেলে বলল, 'যা আন্দাজ করছি তা যদি ঠিক হয়, তা হলে এসপার ওসপার যা হবার আজই হবে। আর তাই যদি হয়, তা হলে মনে হচ্ছে তোদের একটা জরুরি ভূমিকা নিতে হবে। সব সময় মনে রাখবি যে আমি আছি পেছনে, ভয়ের কিছু নেই। মল্লিকের অ্যারেস্টের কথা কাউকে বলবি না, এখন ঘর থেকে বেরোবি না। এমনিতেও হয়তো বেরোতে পারবি না, কারণ, মনে হয় বৃষ্টি আসছে।'

ফেলুদা কথাগুলো বলতে বলতে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, এখন দেখলাম ও নিঃশব্দে হেঁটে জানালার কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল। আমারও চোখ গেল জানালার দিকে। এটা পশ্চিম দিক। এদিকে খানিক দূর ঘাস জমির পরে কতগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছটা আমার চেনা। একজন লোককে গাছপালার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ঘাস পেরিয়ে আমাদের বাংলোর সামনের দিকে চলে আসতে দেখলাম। তার এক মিনিট পরেই লোকটা আমাদের খাবার ঘরে এসে ঢুকল, আর তার পরেই একটা দরজা চাবি দিয়ে খোলা, আর তারপর সেটাকে ভিতর থেকে বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

ফেলুদা দুবার মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

লোকটা আর কেউ নন—আমাদের প্রতিবেশী মিস্টার রক্ষিত।

'আমার কাছ থেকে সময় মতো নির্দেশ পাবি, সেই অনুযায়ী কাজ করবি।'

এই শেষ কথাটুকু বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমরা দুজনে ঘরে বসে রইলাম। বাইরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বোধহয় কালো মেঘে সূর্যটা ঢেকে দিয়েছে বলে আলো কমে এসেছে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, মিস্টার রক্ষিতের চেয়ে বেশি রহস্যময় লোক আর কেউ নেই, কারণ ওঁর সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানতে পারিনি।

আর মল্লিক? মল্লিক সম্বন্ধেও কি সব জেনে ফেলেছি?

জানি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে যে অন্ধকারে ছিলাম, এখনও সেই অন্ধকারেই আছি।

॥ ১০ ॥

বারোটার পর থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল, আর তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। ফেলুদা বলে গেছে আজকেই ক্লাইম্যাক্স, আর তাতে আমাদের হয়তো একটা ভূমিকা নিতে হবে। আমার কাছে সবই অন্ধকার, লালমোহনবাবুর কাছেও তাই। কাজেই ভূমিকাটা যে কী হতে পারে সেটা ভেবে কোনও লাভ নেই। মল্লিক অ্যারেস্টেড, যক্ষীর মাথা সিন্দুকে বন্দি, এর পরেও যে আর কী ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ভেবে বার করার সাধ্যি আমাদের নেই।

একটার সময় চৌকিদার এসে বলল খানা তৈয়ার হ্যায়। ফেলুদাকে ছাড়াই খেতে গেলাম। সে নিশ্চয়ই গেস্ট হাউসের বাবুর্চির রান্না খাচ্ছে। আমরা দুজনে টেবিলে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিস্টার রক্ষিতও এসে পড়লেন। সকালে তাঁকে গোমড়া মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি বেশ স্বাভাবিক মেজাজ। বললেন, 'এমন দিনে চাই খিচুড়ি। বাংলাদেশের খিচুড়ি কি আর এরা করতে জানে? সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, ডিমের বড়া, বেগুনি...এ খাওয়ার জুড়ি নেই। এলাহাবাদেও আমি বাংলাদেশের অভ্যাস ছাড়িনি।' ভদ্রলোক যে খেতে ভালবাসেন সেটা বেশ বোঝা যায়। লালমোহনবাবুও তাঁর চেহারার অনুপাতে ভালই খান, তবে এখানের

চালে কাঁকরটা তাঁর একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। দাঁতে পড়লেই এমন ভাব করছেন যেন মাথায় বাজ পড়ল।

ডালটা শেষ করে যখন মাংসটা পাতে ঢেলেছি তখন একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। আর তারপরেই খ্যানখ্যানে গলায় 'চৌকিদার' বলে একটা হাঁক। চৌকিদার ব্যস্তভাবে একটা ছাতা নিয়ে বাইরে চলে গেল। মিস্টার রক্ষিত হাতের রুটিতে মাংস পুরে মুখে দিয়ে বললেন, 'এই দুর্যোগের দিনে আবার টুরিস্ট।'

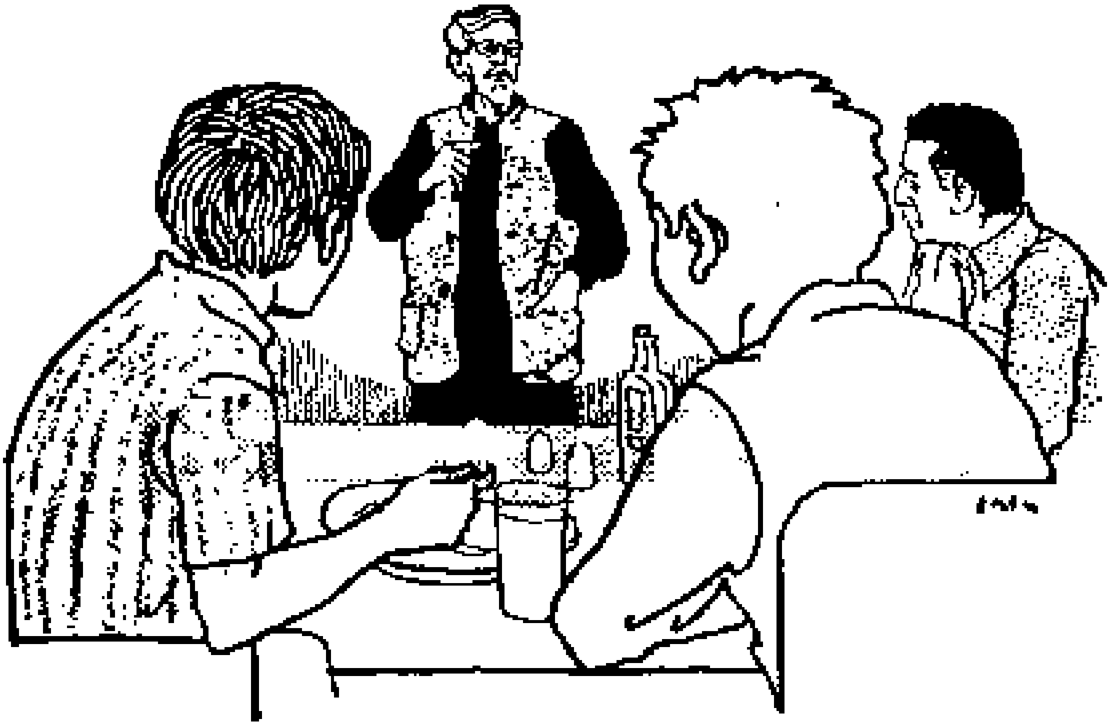

সাদা গোঁফ সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা চশমা পরা একজন ভদ্রলোক বর্ষাতি খুলতে খুলতে ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছনে চৌকিদার, তার হাতে কুমিরের চামড়ার একটা আদ্যিকালের সুটকেস। ভদ্রলোক হিন্দিতে বলে দিলেন তিনি লাঞ্চ করে এসেছেন, তার জন্যে আর কোনও হ্যাঙ্গাম করতে হবে না। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বাংলায় বললেন, 'কাকে নাকি অ্যারেস্ট করেছে শুনলাম?'

ফেলুদার বারণ, তাই আমরা বোকার মতো চুপ করে রইলাম। রক্ষিত যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কাকে? কখন?'

'সাম ভাণ্ডাল। গুহার ভেতর থেকে মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিচ্ছিল—ধরা পড়েছে। আন্দুর এসে যদি দেখি কেভে ঢুকতে দিচ্ছে না তা হলেই তো চিত্তির। আপনারা এখনও কিছু শোনেননি?'

রক্ষিত বললেন, 'এখনও খবরটা এসে পৌঁছয়নি বাংলোয়!'

'এনিওয়ে—ধরা যে পড়েছে সেইটেই বড় কথা। এখানকার পুলিশের এলেম আছে বলতে হবে।'

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে ঢুকে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি শুনলাম তিনি আপন মনে বকবক করছেন। ছিটগ্রস্ত।

আড়াইটে নাগাদ বৃষ্টি থামল।

তিনটের কিছু পরে পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখলাম সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দূরের ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরে দেখলাম তিনি ফিরে আসছেন।

প্রায় সাড়ে চারটের সময় যখন চা নিয়ে এল তখন হঠাৎ খেয়াল করলাম যে দরজার সামনে মেঝেতে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ পড়ে আছে। খুলে দেখলাম সেটা ফেলুদার মেসেজ—

'পনেরো নম্বর গুহায় যাবি সন্ধ্যা সাতটায়। দোতলায় দক্ষিণ পূর্ব কোণে অপেক্ষা করবি।'

ফেলুদা নেপথ্যে থেকে ক্যাম্পেন চালিয়ে যাচ্ছে। এ এক নতুন ব্যাপার বটে।

এ জিনিস এর আগে কখনও হয়নি।

বৃষ্টি আর নামেনি। সাড়ে ছটায় যখন বাংলো থেকে বেরোচ্ছি তখন ফ্রেঞ্চকাট আর রক্ষিত দু-জনেই যে-যার ঘরে রয়েছে, কারণ দুটো ঘরেই বাতি জ্বলছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বার আষ্টেক বিড়বিড় করে দুর্গা দুর্গা বললেন। আমার নিজের মনের ভাব আমি লিখে বোঝাতে পারব না, তাই চেষ্টাও করব না। হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই পকেটের ভিতর গুঁজে দিলাম।

সাতটা বাজতে দশ মিনিটে আমরা কৈলাসের কাছে পৌঁছলাম। পশ্চিমের আকাশে এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, কারণ জুন মাসে

এখানে সাড়ে ছটার পরে সূর্যাস্ত হয়। যেদিকে পাহাড় আর গুহা সেদিকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, তবে আকাশে মেঘ নেই।

আমরা কৈলাস থেকে ডানদিকে মোড় নিলাম। পরের গুহাটাই পনেরো নম্বর গুহা। দশাবতার গুহা। খাদের উপর থেকে এরই সামনে ফেলুদা নুড়ি পাথর ফেলেছিল।

গুহার সামনে পাহারা নেই। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম প্রথমে একটা প্রকাণ্ড চাতাল, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট মন্দির। আশেপাশে দেখার সময় নেই, তাই আমরা চাতাল পেরিয়ে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গুহার মধ্যে ঢুকলাম।

এটা নীচের তলা। আমাদের যেতে হবে দোতলায়। সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হচ্ছে না। উত্তর-পশ্চিম কোণে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আর কেউ গুহার মধ্যে আছে কি না জানি না, তাই যতটা সম্ভব শব্দ না করে আমরা দোতলায় উঠতে লাগলাম।

দোতলায় উঠে একটা খোলা জায়গা। সেখানে দেয়ালের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। আরও খানিকটা উঠে গিয়ে আমরা তিন দিক বন্ধ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে পৌঁছলাম। সারি সারি কারুকার্য করা থাম হলের ছাতটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর আর দক্ষিণের দেয়ালে আশ্চর্য সব পৌরাণিক দৃশ্য খোদাই করা।

ফেলুদার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকটা ক্রমে আলো থেকে দূরে সরে এসেছে, তাই টর্চ জ্বালতে হল। নিশ্চয় আর কেউ নেই, অন্তত শত্রুপক্ষের কেউ নেই, না হলে ফেলুদা আমাদের আসতে বলত না—এই ভরসাতেই আমরা টর্চ জ্বেলেছি। ওই যে থামের ডানদিকের পিছনে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ঘুপচি কোণ।

আমরা এগিয়ে গেলাম। নীচে সিঁড়ি ওঠার আগেই পা থেকে স্যান্ডাল খুলে নিয়েছিলাম, এখন দেখছি পাথর বেশ ঠাণ্ডা। জায়গায় পৌঁছে আবার স্যান্ডাল পরে নিলাম। তেরোশো বছর আগে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি খোদাই করা পৌরাণিক দৃশ্যে ভরা

গুহার ভেতর কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার কোনও ধারণা এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না; একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে পা ধরে যাবে বলে আমরা দুজনেই গুহার কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি জিনিসে চোখ পড়াতে বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল।

আমাদের সামনে হাত পাঁচেক দূরে একটা থামের পাশে আবছা অন্ধকারে একটা আলগা জিনিস পড়ে আছে। একটা লাল রঙের জিনিস। আর তার তলায় চাপা দেওয়া একটা চৌকো সাদা জিনিস।

লালমোহনবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'একটা কাগজ বলে মনে হচ্ছে।'

দুজনে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মাথাটা বেশ কয়েকবার ঘুরে গেল, আর সেই সঙ্গে রহস্যটা আরও ভালভাবে জট পাকিয়ে গেল।

সাদা জিনিসটা কাগজই বটে, আর পেপার ওয়েট-টা হল—ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা!—যেটা আজই সকালে মল্লিকের সুটকেস থেকে বেরিয়ে কুলকার্নির সিন্দুকে লুকিয়ে ছিল।

অন্ধকার বেশ বেড়েছে, তাই কাগজের লেখাটা পড়তে আবার টর্চ জ্বালতে হল।—

'মাথাটা আপনার কাছে রাখুন। চাইলে দিয়ে দেবেন।'

এটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে লিখেছে। লালমোহনবাবু ধরা গলায় 'জয় মা তারা' বলে মাথাটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বগলদাবা করে নিজের জায়গায় নিয়ে এলেন। আমি কাগজটা পকেটে পুরলাম।

বাইরে ফিকে চাঁদের আলো। থামের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের আকাশ দেখা যাচ্ছে, সে আকাশের রং এখন আশ্চর্যরকম বেগুনি।

ক্রমে সে রং বদলাল। চাঁদ বোধহয় বেশ ভাল ভাবে উঠেছে। গুহার মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকারটা আর নেই।

'আটটা!'—লালমোহনবাবু যেন অনেকক্ষণ চেপে রাখা নিশ্বাস

ছেড়ে কথাটা বললেন।

একটা অতি ক্ষীণ শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পা ফেলছে। এইবার শব্দ বদলাল। এবার সমতল মেঝেতে হাঁটছে। এবারে দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল। লোকটা থেমেছে—এদিক ওদিক দেখছে। একটা খচ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইটার জ্বলে উঠল। এক সেকেন্ডের আলো, কিন্তু তাতেই মুখ চেনা হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মল্লিক।

আবার মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এবার যদি মরা মানুষ শুভঙ্কর বোসও এসে হাজির হন তা হলেও আশ্চর্য হব না।

মল্লিক এগিয়ে এলেন, তবে আমাদের দিকে নয়। তিনি অন্য দিকের কোণে যাচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব দিক। ওদিকে গাঢ় অন্ধকার। ভদ্রলোক সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর আমার মন বলছে—ফেলুদা কোথায়?...ফেলুদা কোথায়?...ফেলুদা কোথায়?...লালমোহনবাবু বাক্স রহস্যের ঘটনার পর বলেছিলেন ডিকেটটিভ উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেবেন, কারণ বাস্তব জীবনে বানানো গল্পের চেয়ে অনেক বেশি অবিশ্বাস্য আর রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটে। এই যক্ষীর মাথার ঘটনার পরে উনি কী বলবেন কে জানে!

চাঁদের আলো বেড়েছে। দূরে একটা কুকুর ডাকল। তারপর আরেকটা। তারপর থমথমে চুপ।

তারপর আরেকটা শব্দ।

আরেকজন উঠছে সিঁড়ি দিয়ে।

এবার মেঝে দিয়ে হাঁটছে। এবার দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তাকে। এখনও চেনা যাচ্ছে না। এবার সে লোক এগিয়ে এল। এবার আমাদেরই দিকে। প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। এক পা এক পা করে।

হঠাৎ চোখের সামনে চোখধাঁধানো আলো। লোকটা টর্চ জ্বেলেছে। শুধু টর্চই দেখছি, লোকটাকে দেখছি না। টর্চটা

আমাদের উপর ফেলা। সেটা এগিয়ে এল। থামল। তারপর একটা চেনা গলার স্বর—চাপা, কিন্তু কথাগুলো ভীষণ স্পষ্ট—

'বামন হয়ে চাঁদে হাত ? অ্যাঁ, বাছাধন ? আবার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতে শেখা হয়েছে ?—দশাবতার গুহায় আটটার সময় আসিবেন...সঙ্গে পাঁচশত টাকা আনিবেন...তবে আপনার যাহা খোয়া গিয়াছে তাহা পাইবেন, নতুবা...এ সব কোত্থেকে শেখা হল, ইতিহাসের অধ্যাপক ? কথাগুলো কানে ঢুকছে না, এখনও কালা সেজে বসে আছ ? এই ব্যাপারে তুমি জড়ালে কী করে ? খাতায় আবার নোট করা রয়েছে দেখলাম—ফকার ফ্রেন্ডশিপ ক্র্যাশ, ভুবনেশ্বরের যক্ষী, কৈলাসের মন্দির, প্লেনের টাইম... । আবার সঙ্গে একটা নাবালককে রেখেছ কেন ? ও কি তোমার বডিগার্ড ? আমার ডান হাতে কী আছে দেখতে পাচ্ছ কি ?'

মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে পিস্তল, এক হাতে টর্চ।

লালমোহনবাবু দুবার 'আমি' 'আমি' বলে থেমে গেলেন। রক্ষিতের চাপা হুমকিতে গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠল—

'আমি আমি খুঁজে ! আসল মাল কোথায় ?'

'এই যে। আপনার জন্যই...'

লালমোহনবাবু যক্ষীর মাথাটা রক্ষিতের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক পিস্তলের হাত ঠিক রেখে, টর্চের হাত দিয়ে মাথাটাকে বগলদাবা করে নিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'এ সব ব্যবসা সকলকে মানায় না, বুঝেছ ? যেমন ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, তেমন ছোট বুকে বড় সাধ মানায় না।'

মিস্টার রক্ষিতের কথা হঠাৎ থেমে গেল। কারণ, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে গুহার ভিতর।—বাইরের দিক থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী গুহার ভিতর ঢুকে চারদিক ছেয়ে ফেলছে, আর তার ফলে কালো কালো থামগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে আসছে।

সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ একটা গমগমে গলার স্বর শোনা গেল। ফেলুদার গলা। পাথরের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন সে গলা—

'মিস্টার রক্ষিত, আপনার দিকে, একটি নয়, এক জোড়া পিস্তল সোজা তাগ করা রয়েছে। আপনি নিজের পিস্তলটা নামিয়ে ফেলুন।'

'কী ব্যাপার? এ সবের অর্থ কী?' মিস্টার রক্ষিত কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'অর্থ খুবই সহজ', ফেলুদা বলল—'আপনার অপরাধের শাস্তি দিতে এসেছি আমরা। অপরাধ একটা নয়—অনেকগুলো। প্রথম হল—ভারতের অমূল্য শিল্পসম্পদকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা; দ্বিতীয়, এই শিল্পসম্পদকে অর্থের লোভে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করা; আর তৃতীয়—শুভঙ্কর বোসকে নির্মমভাবে হত্যা করা।'

'মিথ্যে! মিথ্যে!'—রক্ষিত চিৎকার করে উঠলেন।—'শুভঙ্কর বোস খাদের উপর থেকে পা হড়কে...'

'মিথ্যেটা আমি বলছি না, বলছেন আপনি। যে শাবল দিয়ে আপনি তাকে মেরেছিলেন সেই শাবল রক্তমাখা অবস্থায় খাদ থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা মনসার ঝোপের ভিতর পাওয়া গেছে। শুভঙ্কর বোস জ্যান্ত অবস্থায় খাদে পড়লে তিনি নিশ্চয় চিৎকার করতেন; অথচ কৈলাসের পাহারাদার কোনও চিৎকার শোনেনি। আর তা ছাড়া আপনার একটা নীল শার্ট আপনি বাংলোর পূর্বদিকে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। সেটা আমিই গিয়ে উদ্ধার করি। এই শার্টের একটা অংশ একটু ছেঁড়া। মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে শুভঙ্কর বোসের—'

মিস্টার রক্ষিত হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই নিমেষের মধ্যে তিনজন জাঁদরেল লোকের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন। ডানদিকে জয়ন্ত মল্লিকের টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম মেক-আপ ছাড়া ফেলুদাকে, মিস্টার ঘোটেকে, আর আরেকটি লোক, যে মিস্টার ঘোটের হুকুমে রক্ষিতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ফেলুদা এবার জয়ন্ত মল্লিকের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার মল্লিক, এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ওই যে পিছনের গুহাটা দেখছেন, ওর মধ্যে গিয়ে দেখুন, বাঁদিকের কোনায় মিস্টার রক্ষিতের

রেনকোটটা রয়েছে। ওটা নিয়ে আসুন। আয় তপ্‌সে—এই ধোঁয়ার মধ্যে আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। আসুন লালমোহনবাবু!'

গেস্ট হাউসের ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার খেতে খেতে ফেলুদা আমাদের মনের ধোঁয়া দূর করছে। আমরা তিনজন ছাড়া রয়েছে মিস্টার মল্লিক, কুলকার্নি আর ঘোটে। হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে কথা হচ্ছে, আমি সেটা বাংলাতেই লিখছি। ফেলুদা বলল—

'প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার রক্ষিতের আসল নাম হল চট্টোরাজ। উনি একটি গ্যাং বা দলের সভ্য, যার ঘাঁটি হল দিল্লি। এই দলের উদ্দেশ্য হল ভারতের ভাল ভাল মন্দির থেকে মূর্তি বা মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করা। এই ধরনের দল হয়তো আরও আছে। আপাতত এই একটি দলকে শায়েস্তা করার রাস্তা আমরা পেয়েছি, কারণ চট্টোরাজকে আমরা এই ঘাঁটির হদিস এবং এর অন্যান্য সভ্যদের নাম বলতে বাধ্য করেছি। ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা চট্টোরাজই চুরি করেন, চট্টোরাজই সেটা কলকাতায় আনেন, চট্টোরাজই সেটা সিলভারস্টাইনের কাছে বিক্রি করেন, আবার প্লেন ক্র্যাশ হবার পর চট্টোরাজই সিদিকপুরে গিয়ে পানু নামক ছেলেটির কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে সেটা উদ্ধার করে আনেন, এবং সেই মূর্তি সমেত চট্টোরাজই ল্যুইসনকে ধাওয়া করে এলোরায় আসেন। এখানে আসার কারণ হল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। এক পাখি হল ল্যুইসনের কাছে সেটা বিক্রি করা, আর দ্বিতীয় হল কৈলাস থেকে আরেকটি কোনও টাটকা নতুন মাথা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা জানি এই দুটোর একটা উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। ল্যুইসন মূর্তি কিনতে রাজি হন, কিন্তু সেটা তাঁকে দেবার আগেই চট্টোরাজের হাত ছাড়া হয়ে যায়, ফলে তাকে ল্যুইসনের গালিগালাজ শুনতে হয়। আর মূর্তি চুরির ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয় একবার শুভঙ্কর বোসের অতর্কিত আবির্ভাবে, আর তার কিছু পরেই দশাবতার গুহার সামনে একটি নুড়ি পাথর ফেলার

দরুন।'

ফেলুদা বোধহয় দম নেবার জন্য চুপ করল। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। আমি না বলে পারলাম না—'আর মিস্টার মল্লিক?'

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, 'মিস্টার মল্লিকের ব্যাপারটা খুবই সহজ। এতই সহজ যে প্রথমে আমিও ধরতে পারিনি। মিস্টার মল্লিক চট্টোরাজকে ধাওয়া করছিলেন।'

'কেন?'

'যে কারণে আমি মিস্টার মল্লিককে ধাওয়া করছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে। অর্থাৎ তিনিও মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন। অবিশ্যি এইখানেই মিলের শেষ নয়। ওঁর আর আমার পেশাও এক। উনিও আমারই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

আমি অবাক হয়ে মিস্টার মল্লিকের দিকে চাইলাম। ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি, তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে।

ফেলুদা বলে চলল, 'আমরা ফোন করে জেনেছি উনি বম্বের ভার্গব এজেন্সি নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। এই কোম্পানির মালিক বাঙালি, নাম ঘোষ। এদেরই একটা তদন্তের ব্যাপারে মল্লিক কিছুদিন হল কলকাতায় আসেন, ওঁর এক বন্ধুর অবর্তমানে কুইন্‌স ম্যানসনে তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন, তাঁর গাড়ি ব্যবহার করেন। এই সব এজেন্সি সাধারণত মামুলি অপরাধের তদন্ত করে থাকে। কিন্তু মিস্টার মল্লিকের তাতে মন ভরছিল না। তিনি চাইছিলেন গোয়েন্দা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে। তাই না, মিস্টার মল্লিক?

মিস্টার মল্লিক বললেন, 'ঠিক কথা। আর সেই সুযোগটা এসে যায় খুব আশ্চর্যভাবে। তদন্তের ব্যাপারেই গত বিষ্যুদবার গিয়েছিলাম নগরমলের দোকানে। সেখানে আমারই সামনে একটি মার্কিন ভদ্রলোক নগরমলকে একটা মূর্তির মাথা দেখালেন। আমার আর্ট সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান আছে, কিন্তু মাথাটা তখন আমার মনে কোনও দাগ কাটেনি। শুধু জেনেছিলাম যে সাহেবের নাম সিলভারস্টাইন, আর উনি অত্যন্ত ধনী। পরদিন সকালে কাগজে

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খবরটা পড়ি, আর তার আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডিয়োতে শুনি যে সিলভারস্টাইন সিদিকপুরের কাছে প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে। তখনই মনে হয় মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে পারলে আমার নাম হতে পারে। সে কথা তক্ষুনি বম্বেতে ফোন করে আমার বসকে জানিয়ে দিই। উনি তাতে রাজি হন। বলেন—কী হয় আমাকে ফোন করে জানিয়ো। আমি কাজে লেগে যাই। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। আমি সিদিকপুরে পৌঁছানোর পাঁচ মিনিট আগে আরেকটি ভদ্রলোক গিয়ে গ্রামের ছেলেদের কাছ থেকে মূর্তি আদায় করে নেন। ঘটনাটা ঘটে আমার চোখের সামনে, কিন্তু তখন আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। আমি ঠিক করি ভদ্রলোককে ফলো করব। কিন্তু—'

'ভদ্রলোকের গাড়ির রংটা মনে আছে?'—ফেলুদা মল্লিকের কথার উপর প্রশ্ন করল।

'আছে বইকী। নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি। সেটাকে ফলো করলাম, কিন্তু সেখানেও ব্যাড লাক—বারাসতের কাছাকাছি টায়ার পাংচার হয়ে গেল; ভদ্রলোক তখনকার মতো আমার হাতছাড়া হয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমার গোঁ চেপে গেছে। আমি জানি উনি আবার মূর্তিটা বেচবেন। চলে গেলাম গ্র্যান্ড হোটেলে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের দেখা পেলাম, তাকে ধাওয়া করে রেলওয়ে আপিসে গিয়ে তার দেখাদেখি আওরঙ্গাবাদের টিকিট কিনলাম। তার হাতের ব্যাগের ওজন দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তখন পর্যন্ত মূর্তিটা বিক্রি করতে পারেননি। টিকিট কিনে বম্বেতে আমার আপিসে খবরটা জানিয়ে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'জানি। আপনি বলেছিলেন মেয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। বাপ যে আসলে চট্টোরাজ, আপনি নন, সেটা তখন বুঝতে পারিনি।'

মল্লিক বললেন, 'যাই হোক এখানে এসে প্রথম থেকেই আমি মূর্তিটা হাত করার সুযোগ খুঁজি। আমি জানতাম যে চোরাই মাল উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে যদি চোরকে ধরে দিতে পারি তা হলে আরও বেশি নাম হবে; কিন্তু সেটা সাহসে কুলোল না। যাই

হোক—কাল রাত্রে কৈলাসের কাছে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। যখন দেখলাম একে একে বাংলোর সবাই ঘুরতে বেরিয়েছে, তখন বাংলোয় গিয়ে জমাদারের দরজা দিয়ে চট্টোরাজের ঘরে ঢুকে মাথাটা নিয়ে আসি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার পেছনেও যে একজন গোয়েন্দা লেগেছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কি?'

'মোটেই না! আর সেজন্যেই তো হঠাৎ ধরা পড়ে এত বোকা হয়ে গিয়েছিলাম!'

মিস্টার ঘোটে হো হো করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 'যখন দেখলাম আপনি এতখানি ল্যুইসনের সঙ্গে গিয়েও তাকে মূর্তিটা গছাননি, তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম যে আপনি নির্দোষ। তার আগে পর্যন্ত, আপনি গোয়েন্দা জেনেও, আপনার উপর থেকে আমার সবটুকু সন্দেহ যায়নি।'

'কিন্তু আপনি তো চট্টোরাজকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই না?'—প্রশ্ন করল মিস্টার মল্লিক।

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে সেটা ছিল শুধু একটা খটকা। যখন দেখলাম একটা পুরনো সুটকেসে নতুন করে নাম লেখা হয়েছে আর এন রক্ষিত, তখনই সন্দেহ হল—নামটা ঠিক তো? তারপর কাল রাত্রে উনি রেনকোট পরে বেরিয়েছিলেন সে কথা লালমোহনবাবুর কাছে শুনি। পনেরো নম্বর গুহাতে একজন লোক ঢুকেছে সন্দেহ করে ওপর থেকে গুহার সামনে একটা নুড়ি পাথর ফেলি। ফলে অন্ধকারে লোকটা পালায়। ভেতরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পেছন দিকের একটা ছোট গুহায় দেখি রেনকোট, আর তার বিরাট স্পেশাল পকেটে হাতুড়ি, ছেনি আর নাইলনের দড়ি। আমি ওগুলো সেইখানেই রেখে আসি। বুঝতে পারি চট্টোরাজ হলেন মূর্তিচোর। সেই রাত্রেই দেখলাম চট্টোরাজ তার ঘরে পাগলের মতো কী জানি খুঁজছেন। পরদিন সকালে শুনলাম আপনি বম্বেতে টেলিফোন করেছেন—মেয়ে ভাল আছে। বুঝলাম মূর্তি এখন আপনার কাছে। অথচ মুশকিল এই যে, মূর্তিটা হাত ছাড়া হলে আসল চোরকে শায়েস্তা করা যাবে না। তাই

আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হল।

'এ দিকে শুভঙ্কর বোসের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। তার ডেডবডি দেখতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে নীল কাপড়ের টুকরো পাওয়া গেল। আপনি রাত্রে নীল শার্ট পরেছিলেন, কিন্তু এদিকে আমার সন্দেহ চট্টোরাজের উপর পড়েছে। আসলে আমারও আগে চট্টোরাজ পৌঁছেছিলেন ডেডবডির কাছে। উনিই নাড়ি দেখার ভান করে নিজের একটা নীল শার্ট থেকে ছেঁড়া টুকরো শুভঙ্করের হাতে গুঁজে দেন—কারণ শুভঙ্করের মৃত্যুর জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার প্রয়োজন ছিল। উনি নিজের শার্টটি অবিশ্যি পরে বাংলোর পশ্চিম দিকে গাছপালায় ভর্তি একটা নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে রাখেন, আর আমি গিয়ে সেটা উদ্ধার করি।

'কিন্তু এত করেও যে সমস্যাটা বাকি রইল, সেটা হল কী করে চট্টোরাজকে ধরা যায়। একটা পথ পেলাম যখন শুনলাম যে কে জানি লালমোহনবাবুর ঘরে ঢুকে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে চট্টোরাজ। ফলস্বরূপ তাঁরই একটি মূল্যবান জিনিস খোওয়া গেছে। লালমোহনবাবুর বাক্সে লালমোহনবাবুর নোটবই ছিল, এবং তাতে যক্ষীর মাথা, প্লেন ক্র্যাশ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এই খাতা চট্টোরাজ না পড়ে পারেন না এই আন্দাজে আমি লালমোহনবাবুর হাতের লেখা নকল করে চট্টোরাজকে যে চিঠিটা লিখলাম সেটার কথা জানেন। তার আগেই আমি চট্টোরাজকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জানিয়ে দিলাম যে মূর্তি চোর ধরা পড়েছে—'

'সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি!'—আমি আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ!'—ফেলুদা হেসে বলল।—'সেটা আমার দু নম্বর ছদ্মবেশ। তোদের কাছাকাছি থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস। যাই হোক—চিঠির টোপ উনি বেমালুম গিলে ফেললেন। এবং তার ফলে যে কী হল সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এবার এইটুকুই বলতে বাকি যে, এই যে গ্যাংটা ধরা হল, এর কৃতিত্বের অংশীদার ভার্গব এজেন্সির মিস্টার মল্লিক যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি পান সেটা আমি নিশ্চয় দেখব, আর—মিস্টার

ঘোটের যাতে পদোন্নতি হয় সেটাও একান্তভাবে কামনা করব। মিস্টার কুলকার্নির ভূমিকাও যে সামান্য নয় সেটা বলাই বাহুল্য, আর সাহসের জন্য যদি মেডাল দিতে হয় তা হলে সেটা অবশ্যই পাবেন শ্রীমান তপেশ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী।'

সকলের হাততালি শেষ হলে জটায়ু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আমার বোমটা তা হলে আর কোনও কাজে লাগল না বলছেন?'

ফেলুদা চোখ গোল গোল করে বলল, 'সে কী মশাই—এত যে ধোঁয়া হল সেটা এল কোত্থেকে? ওটা তো আর এমনি এমনি বোমা নয়—একেবারে তিনশো ছাপ্পান্ন মেগাটন খাস মিলিটারি স্মোক-বম্ব!'

সত্যজিৎ রায়

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

॥ ১ ॥

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে॥

ফেলুদা বলল, 'আমাদের এবারের জঙ্গলের ঘটনাটা যখন লিখবি তখন এই ছ'লাইনের সংকেতটা দিয়ে আরম্ভ করিস।' সংকেতের ব্যাপারটা ঘটনার একটু পরের দিকে আসছে; তাই যখন জিগ্যেস করলাম ওটা দিয়ে শুরু করার কারণটা কী, তখন ও প্রথমে বলল, 'ওটা একটা কায়দা। ওতে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবে।' উত্তরটা আমার পছন্দ হল না বুঝতে পেরেই বোধহয় আবার দু'মিনিট পরে বলল, 'ওটা শুরুতে দিলে গল্পটা যারা পড়বে তারা প্রথম থেকে মাথা খাটাতে পারবে।'

আমি ফেলুদার কথা মতোই সংকেতটা গোড়ায় দিচ্ছি বটে, কিন্তু এটাও বলে দিচ্ছি যে মাথা খাটিয়ে বোধহয় বিশেষ লাভ হবে না, কারণ সংকেতটা সহজ নয়। ফেলুদাকে অবধি প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল। অবিশ্যি ও বুঝিয়ে দেবার পর ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ সহজ বলেই মনে হয়েছিল।

এতদিন ফেলুদার সব লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারগুলো লেখার সময় আসল লোক আর আসল জায়গার নাম ব্যবহার করে এসেছি, এবার একজন বারণ করায় সেটা আর করছি না। নকল নামের ব্যাপারে অবিশ্যি ফেলুদার সাহায্য নিতে হয়েছে। ও বলল, 'জায়গাটা যে ভুটান-সীমানার কাছে সেটা বলতে কোনো আপত্তি নেই। নামটা করে দে লক্ষ্মণবাড়ি। যে ভদ্রলোক গল্পের প্রধান চরিত্র, তার পদবীটা সিংহরায় করতে পারিস। ও নামের জমিদার এদেশে অনেক ছিল, আর তাদের মধ্যে অনেকেরই আদি নিবাস ছিল রাজপুতানায়, অনেকেই

বাংলাদেশে এসে তোডরমল্লের মোগল সৈন্যের হয়ে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে বাংলাদেশেই বসবাস করে একেবারে বাঙালী ব'নে গিয়েছিল।'

আমি ফেলুদার ফরমাশ মতোই ঘটনাটা লিখছি। নামগুলোই শুধু বানানো, ঘটনা সব সত্যি। যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম, তার বাইরে কিছুই লিখছি না।

ঘটনার আরম্ভ কলকাতায়। ২৭শে মে, রবিবার, সকাল সাড়ে নটা। তাপমাত্রা একশো ডিগ্রী ফারেনহাইট। গরমের ছুটি চলেছে। ফেলুদা কলকাতাতেই ফরডাইস লেনে একটা খুনের ব্যাপারে অপরাধীকে একটা আলপিনের ক্লু-এর সাহায্যে ধরে দিয়ে বেশ নাম-টাম কিনে দু'পয়সা কামিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, আমি আমার ডাকটিকিটের অ্যালবামে কয়েকটা ভুটানের স্ট্যাম্প আটকাচ্ছি, এমন সময় জটায়ুর আবির্ভাব।

রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু আজকাল মাসে অন্তত দু'বার করে আমাদের বাড়িতে আসেন। ওঁর বইয়ের ভীষণ কাটতি, তাই রোজগারও হয় ভালই। সেই নিয়ে ভদ্রলোকের বেশ একটু দেমাকও ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে ফেলুদা ওঁর গল্পের নানারকম তথ্যের ভুল দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে লালমোহনবাবু ওকে বিশেষ সমীহ করে চলেন, আর নতুন কিছু লিখলেই ছাপার আগে ফেলুদাকে দেখিয়ে নেন।

এবার কিন্তু হাতে কাগজের তাড়া নেই দেখে বুঝলাম, ওঁর আসার কারণটা অন্য। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সোফায় বসে পকেট থেকে একটা সবুজ তোয়ালের টুকরো বার করে ঘাম মুছে ফেলুদার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'জঙ্গলে যাবেন?'

ফেলুদা তক্তাপোশের উপর কাত হয়ে শুয়ে থর হাইয়ারডালের লেখা আকু-আকু বইটা পড়ছিল; লালমোহনবাবুর কথায় কনুইয়ে ভর করে খানিকটা উঠে বসে বলল, 'আপনার জঙ্গলের ডেফিনিশনটা কী?'

'একেবারে সেন্টপারসেন্ট জঙ্গল। যাকে বলে ফরেস্ট।'

'পশ্চিম বাংলায়?'

'ইয়েস স্যার।'

'সে ত এক সুন্দরবন আর তেরাই অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও নেই। সব ত কেটে সাফ করে দিয়েছে।'

'মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনেছেন?'

প্রশ্ন করেই লালমোহনবাবু একটা মেজাজী হাসিতে তাঁর ঝকঝকে দাঁতের প্রায় চল্লিশটা এক সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন। মহীতোষ সিংহরায়ের নাম আমিও শুনেছি। ফেলুদার কাছে ওঁর একটা শিকারের বই আছে—সে নাকি দারুণ বই।

'তিনি ত উড়িষ্যা না আসাম না কোথায় থাকেন না?'

লালমোহনবাবু বুক পকেট থেকে সড়াৎ করে একটা চিঠি বার করে বললেন, 'নো স্যার। উনি থাকেন ডুয়ার্সে—ভুটান বর্ডারের কাছে। আমার লাস্ট বইটা ওঁকে উৎসর্গ করেছিলুম। আমার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি হয়েছে।'

'আপনি তাহলে জ্যান্ত লোককেও বই উৎসর্গ করেন?'

এখানে লালমোহনবাবুর উৎসর্গের ব্যাপারটা একটু বলা দরকার। ভদ্রলোক বিখ্যাত লোকদের ছাড়া বই উৎসর্গ করেন না, আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মারা গেছে এমন লোক। যেমন, মেরু-মহাতঙ্ক উৎসর্গ করেছিলেন 'রবার্ট স্কটের স্মৃতির উদ্দেশে', গোরিলার গোগ্রাস 'ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতির উদ্দেশে', আণবিক দানব (যেটা ফেলুদার মতে ম্যাক্সিমাম গাঁজা) 'আইনস্টাইনের স্মৃতির উদ্দেশে'। শেষটায় হিমালয়ে হৃৎকম্প উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখে বসলেন 'শেরপা-শিরোমণি তেনজিং নোরকের স্মৃতির উদ্দেশে'। ফেলুদা ত ফায়ার: বলল, 'আপনি জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেলে দিলেন?' লালমোহনবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'ওরা ত কনস্ট্যান্ট পাহাড়ে চড়ছে—অনেক দিন কাগজে নামটাম দেখিনি তাই ভাবলুম পা-টা হড়কে গিয়ে বোধহয়...।' দ্বিতীয় সংস্করণে অবিশ্যি উৎসর্গটা শুধরে দেওয়া হয়েছিল।

মহীতোষ সিংহরায় খুব বড় শিকারী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে কি আর এদের মতো বিখ্যাত? তবু তাকে উৎসর্গ করা হল কেন জিগ্যেস করাতে লালমোহনবাবু বললেন—বইটাতে জঙ্গলের ব্যাপারের অনেক কিছুই নাকি মহীতোষবাবুর 'বাঘে-বন্দুকে' বইটা থেকে নেওয়া। তারপর মুচকি হেসে জিভ কেটে বললেন, 'মায় একটি আস্ত ঘটনা পর্যন্ত। তাই ভদ্রলোককে একটু খুশি করা দরকার ছিল।'

'সে ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

লালমোহনবাবু খাম থেকে চিঠিটা বার করে বললেন, 'নইলে আর এভাবে ইনভাইট করে?'

'ইনভাইট ত আপনাকে করেছে, আমাকে ত করেনি।'

লালমোহনবাবু এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই ভুরুদুটো কুঁচকে বললেন, 'আরে মশাই, আপনি একজন এলেমদার লোক, আপনার একটা ইয়ে আছে, আপনাকে না ডাকলে আপনি যাবেন না—এসব কি আর আমি জানি না? চার মাসে বইটার চারটে এডিশন হওয়াতে ওঁকে আমি সুখবরটা দিয়ে একটা চিঠি লিখি। তাতে আপনার সঙ্গে যে আমার একটু মাখামাখি আছে তারও একটা হিন্ট দিয়েছিলুম আর কি। তাতেই এই চিঠি। আপনি পড়ে দেখুন না। আমাদের দুজনকেই যেতে বলেছে।'

মহীতোষ সিংহরায়ের চিঠির শুধু শেষের কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি—

'আপনার বন্ধু শ্রীপ্রদোষ মিত্র মহাশয়ের ধুরন্ধর গোয়েন্দা হিসাবে খ্যাতি আছে বলিয়া শুনিয়াছি। আপনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিলে তিনি হয়ত আমার একটা উপকার করিতে পারেন। কী স্থির করেন পত্রপাঠ জানাইবেন। ইতি।'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখে বলল, 'ভদ্রলোক কি বৃদ্ধ?'

'বৃদ্ধের ডেফিনিশন?' লালমোহনবাবু আধবোজা চোখে প্রশ্ন করলেন।

'এই ধরুন সত্তর-টত্তর।'

'নো স্যার। মহীতোষ সিংহরায়ের জন্ম নাইনটীন ফোরটীনে।'

'হাতের লেখাটা দেখে বুড়ো বলে মনে হয়েছিল।'

'সে কি মশাই, মুক্তোর মতো লেখা ত!'

'চিঠি না, সই। চিঠিটা লিখেছে সম্ভবত ওর সেক্রেটারি।'

ঠিক হল আগামী বুধবার আমরা লক্ষ্মণবাড়ি রওনা হব। নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ট্রেন, তারপর ছেচল্লিশ মাইল যেতে হবে মোটরে। মোটরের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে না, মহীতোষবাবু তাঁর নিজের গাড়ি স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন।

জঙ্গলে যাবার কথা শুনে ফেলুদার মন যে নেচে উঠবে, আর সেই সঙ্গে আমারও, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আমাদের বংশেও শিকারের একটা ইতিহাস আছে। বাবার কাছে শুনেছি বড় জ্যাঠামশাই নাকি রীতিমতো ভালো শিকারী ছিলেন। আমাদের দেশ ছিল ঢাকায় বিক্রমপুর পরগণার সোনাদীঘি গ্রামে। বড় জ্যাঠা-

মশাই ময়মনসিংহের একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ময়মনসিংহের উত্তরে মধুপুরের জঙ্গলে উনি অনেক বাঘ হরিণ বুনো শুয়োর মেরেছেন। আমার মেজোজ্যাঠা—মানে ফেলুদার বাবা—ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অঙ্ক আর সংস্কৃতের মাস্টার ছিলেন। মাস্টার হলে কী হবে—মুগুর ভাঁজা শরীর ছিল তাঁর; ফুটবল ক্রিকেট সাঁতার কুস্তি সব ব্যাপারেই দুর্দান্ত ছিলেন। উনি যে এত অল্প বয়সে মারা যাবেন সেটা কেউ ভাবতেই পারেনি। আর অসুখ-টাও নাকি আজকের দিনে কিছুই না। ফেলুদার তখন মাত্র ন'বছর বয়স। মেজোজেঠিমা তার আগেই মারা গেছেন। সেই থেকে ফেলুদা আমাদের বাড়িতেই মানুষ।

আমার আরেক জ্যাঠামশাই ছিলেন, তিনি তেইশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পশ্চিমে চলে যান; আর ফেরেননি। তাঁরও নাকি অসাধারণ গায়ের জোর ছিল। আমার বাবা হলেন সব চেয়ে ছোট ভাই; বড় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ বছর বয়সের তফাত। বাবার বোধহয় খুব বেশি গায়ের জোর নেই; তবে মনের জোর যে আছে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি।

ফেলুদার প্রিয় বাংলা বই হল বিভূতিভূষণের আরণ্যক। করবেট আর কেনেথ অ্যান্ডারসনের সব বই ও পড়েছে। নিজে শিকার করেনি কখনো, যদিও বন্দুক চালানো শিখেছে, রিভলভারে দুর্দান্ত টিপ, আর দরকারে পড়লে যে বাঘও মারতে পারে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ফেলুদা বলে—জানোয়ারের গতিগতি বোঝা মানুষের চেয়ে অনেক সহজ, কারণ জানোয়ারের মন মানুষের মতো জট পাকানো নয়। মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাসিধে, তারও মন একটা বাঘের মনের চেয়ে অনেক বেশি প্যাঁচালো। তাই একজন অপরাধীকে সায়েস্তা করাটা বাঘ মারার চেয়ে কম কৃতিত্ব নয়।

ট্রেনে যেতে যেতে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে এই ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিল। লালমোহনবাবুর হাতে মহীতোষ সিংহরায়ের লেখা তাঁর প্রথম শিকারের বই। বইয়ের প্রথমেই মহীতোষবাবুর ছবি, একটা মরা রয়াল বেঙ্গলের কাঁধে পা দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাপাটা তত ভালো না বলে মুখটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবে চওড়া চোয়াল, চওড়া কাঁধ, আর সরু লম্বা নাকের নিচে চাড়া দেওয়া চওড়া গোঁফটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লালমোহনবাবু বললেন,

'ভাগ্যে আপনি যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। এরকম একটা পার্সোনালিটির সামনে আমি ত একেবারে কেঁচো মশাই।'

লালমোহনবাবুর হাইট পাঁচ ফুট বার ইঞ্চি। প্রথমবার দেখে মনে হবে বাংলা ফিল্মে কিংবা থিয়েটারে হয়ত কমিক অভিনয়-টভিনয় করেন। কাজেই উনি অনেকের সামনেই কেঁচো। ফেলুদার সামনে ত বটেই।

ফেলুদা বলল, 'সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করে দেবার ফলেই হয়ত ভদ্রলোক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন।'

'আশ্চর্য বলতে হবে', লালমোহনবাবু বললেন, 'পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রথম বই লিখলেন, কিন্তু পড়লেই মনে হয় একেবারে পাকা লিখিয়ে।'

'শিকারীদের মধ্যে এ জিনিসটা আগেও দেখা গেছে। করবেটের ভাষাও আশ্চর্য সুন্দর। হয়ত এটা জংলী আবহাওয়ার গুণ। পৌরাণিক যুগে যে সব মুনি-ঋষিরা বেদ-উপনিষদ লিখেছেন তাঁরাও জঙ্গলেই থাকেন।'

শেয়ালদা ছাড়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝ রাত্তিরে যখন নিউ ফারাক্কা স্টেশনে গাড়ি থামল, তখন ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখি বাইরে তেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, আর তার সঙ্গে ঘন ঘন মেঘের গর্জন। সকালে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছে বুঝলাম এদিকটায় মেঘলা হলেও, গত ক'দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয়নি।

যে ভদ্রলোকটি আমাদের নিতে এলেন তিনি অবিশ্যি মহীতোষবাবু নন। ত্রিশের নিচে বয়স, রোগা, ফরসা, মাথার চুল উসকো-খুসকো, চোখে মোটা কাঁচের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক আমাদের দেখে যে খুব একটা বাড়াবাড়ি রকম খাতিরের ভাব করলেন তা নয়, তবে তার মানে যে তিনি খুশি হননি সেটা নাও হতে পারে। মানুষের বাইরের ব্যবহার থেকে ফস করে তার মনের আসল ভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়াটা যে কত ভুল, সেটা ফেলুদা বার বার বলে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি মহীতোষবাবুর সেক্রেটারি। নাম তড়িৎ সেনগুপ্ত। আমাদের মধ্যে কোনজন প্রদোষ মিত্তির আর কোনজন লালমোহন গাঙ্গুলী সেটা ভদ্রলোক দিব্যি আন্দাজে ধরে ফেললেন।

স্টেশনের বাইরে মহীতোষবাবুর জীপ অপেক্ষা করছিল। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশনেই চা আর ডিমটোস্ট খেয়ে নিয়ে জীপে

গিয়ে উঠলাম। আমাদের তিনজনের দুটো সুটকেস, আর ফেলুদার একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া মাল বলতে আর কিছুই নেই, কাজেই জীপে জায়গার অভাব হল না। গাড়ি ছাড়ার মুখে তড়িৎবাবু বললেন, 'মহীতোষবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত। ওঁর দাদার শরীরটা ভালো নেই; ডাক্তার এসেছিল, তাই ওঁকে থাকতে হল।'

মহীতোষবাবুর যে দাদা আছে সেটাই জানতাম না। ফেলুদা বলল, 'বেশি অসুখ কি?' আমি বুঝতে পারছিলাম অসুখের বাড়িতে অতিথি হয়ে গিয়ে হাজির হতে ফেলুদার একটা কিন্তু কিন্তু ভাব হচ্ছিল।

তড়িৎবাবু বললেন, 'না। দেবতোষবাবুর অসুখ অনেকদিনের। মাথার ব্যারাম। এমনিতে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। উন্মাদ নন মোটেই। দু'মাসে তিন মাসে এক-আধবার মাথাটা একটু গরম হয়, তখন ডাক্তার এসে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দেন।'

'বয়স কিরকম?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'চৌষট্টি। মহীতোষবাবুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন।'

গাড়ি থেকে উত্তর দিকে হিমালয় দেখা যাচ্ছে। ওই দিকেই দার্জিলিং। দার্জিলিং আমি তিনবার গেছি, কিন্তু এবার যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে আগে কখনো যাইনি। আকাশে মেঘ জমে আছে, তাই গরমটা কম। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে চা বাগান পড়ছে। শহর ছাড়ার পর থেকেই দৃশ্য ক্রমে বদলে যাচ্ছে। এবার পুব দিকেও পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তড়িৎবাবু বললেন, 'ওটাই ভুটান।'

তিস্তা পেরোবার কিছু পর থেকেই পথের ধারে জঙ্গল পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু এক পাল ছাগল দেখে হঠাৎ হরিণ হরিণ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 'তাও ভাল, বাঘ বলেননি।'

তড়িৎবাবুর কথায় জানলাম মহীতোষবাবুর বাড়ির পশ্চিম দিকে মাইল খানেকের মধ্যেই নাকি একটা জঙ্গল রয়েছে, তার নাম কালবুনি। সেখানে এককালে অনেক বাঘ ছিল, আর সে-সব বাঘ সিংহ-রায়রা শিকারও করেছেন। কিন্তু এখন বড় বাঘ বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর আছে কি না সন্দেহ, যদিও মাস তিনেক আগে নাকি কালবুনিতে মানুষখেকো বাঘ আছে বলে একটা শোরগোল উঠেছিল।

'আসলে নেই?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

তড়িৎবাবু বললেন, 'একদিন একটি আদিবাসী ছেলের মৃতদেহ

পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে, তার গায়ে বাঘের আঁচড় ছিল।'

'কিন্তু মাংস খায়নি?'

'খেয়েছিল, কিন্তু সেটা বাঘ না হয়ে হায়না-জাতীয় কোনো জানোয়ারও হতে পারে।'

'মহীতোষবাবু কী বলেন?'

'উনি তখন ছিলেন না। হাসিমারার দিকে ওঁর চা বাগান আছে, সেখানে গিয়েছিলেন। বনবিভাগের কর্তাদের ধারণা বাঘ, কিন্তু মহীতোষবাবু বিশ্বাস করতে রাজী হননি। অবিশ্যি বনবিভাগের লোক এই তিন মাস খোঁজাখুঁজি করেও সে বাঘের কোনো সন্ধান পায়নি।'

'আর-কোনো মানুষ খাওয়ার ঘটনাও ঘটেনি?'

'না।'

মানুষখেকোর কথাটা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অবিশ্যি এ ব্যাপারে মহীতোষবাবুর কথাটাই মানতে হবে নিশ্চয়ই। লালমোহনবাবু সব শুনেটুনে 'হাইলি ইন্টারেস্টিং' বলে আরো বেশি ভুরু কুঁচকে জঙ্গলের দিকে দেখতে লাগলেন।

একটা ছোট নদী আর একটা বড় জঙ্গল পেরিয়ে, বাঁয়ে একটা গ্রামকে ফেলে আমাদের জীপ পিচ বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরল। তবে ঝাঁকুনি বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। মিনিট পাঁচেক চলার পর গাছের উপর দিয়ে একটা পুরোন বাড়ির মাথা দেখা গেল। আরো এগোতে ক্রমে গাছপালা পেরিয়ে গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়িটার পুরোটাই দেখতে পেলাম। বাড়ির রঙ এককালে হয়ত সাদা ছিল, এখন সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়ে গেছে। রঙ যা আছে তা শুধু জানালার কাচগুলোতে; রামধনুর সাতটা রঙের কোনোটাই বাদ নেই।

শ্বেতপাথরের ফলকে 'সিংহরায় প্যালেস' লেখা গেটটা পেরিয়ে আমাদের জীপ বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

॥ ২ ॥

মহীতোষবাবু যে এত ফরসা সেটা ছবি দেখে বোঝা যায়নি। লম্বায় ফেলুদার কাছাকাছি, যতটা রোগা ভেবেছিলাম ততটা না, মাথার চুল ছবির চেয়ে অনেক বেশি পাকা, আর বয়সের তুলনায় বেশ ঘন। শিকারীরা জঙ্গলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকে বলে শুনেছি। ইনিও হয়ত তাই করেন, কিন্তু বাড়িতে কথা বলার সময় গলা থেকে যে গুরুগম্ভীর তেজীয়ান আওয়াজ বেরোয় সেটা শুনলে হয়ত বাঘেরও চিন্তা হবে।

ভদ্রলোক আমাদের খাতির-টাতির করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় বসানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ওঁর লেখার প্রশংসা করে বলল, 'আমি শুধু ঘটনার কথা বলছি না—সেগুলো ত খুবই আশ্চর্য—আমার মনে হয় সাহিত্যের দিক দিয়েও আপনার লেখার আশ্চর্য মূল্য আছে।'

বেয়ারা আমের শরবত এনে আমাদের সামনে শ্বেতপাথরের নিচু টেবিলের উপর রেখেছিল, মহীতোষবাবু 'আসুন' বলে সেগুলোর দিকে দেখিয়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বললেন, 'অথচ জানেন, আমি সবে এই বছর চারেক হল কলম ধরেছি। আসলে লেখাটা বোধ হয় রক্তে ছিল। আমার বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। অবিশ্যি তার আগে বিশেষ কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা রাজপুতানার লোক, জানেন ত? ক্ষত্রিয়। এক কালে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পরে মানুষ ছেড়ে জানোয়ার ধরেছি। এখন অবিশ্যি বন্দুক ছেড়ে একরকম বাধ্য হয়েই কলম ধরেছি।'

'উনি কি আপনার ঠাকুরদা?'

আমাদের বাঁ দিকের দেয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেন্টিং-এর দিকে দেখিয়ে ফেলুদা প্রশ্নটা করল।

'হ্যাঁ, উনিই আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়।'

একখানা চেহারা বটে। জ্বলজ্বলে চোখ, পঞ্চম জর্জের মতো দাড়ি আর গোঁফ, বাঁ হাতে বন্দুক ধরে ডান হাতটা আলতো করে

একটা টেবিলের উপর রেখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সোজা চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

'ঠাকুরদার সঙ্গে বঙ্কিমের চিঠি লেখালেখি ছিল, জানেন? ঠাকুরদা তখন কলেজে পড়েন। বঙ্গদর্শন বেরোচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন দেবী চৌধুরানী। আর সেই সূত্রেই ঠাকুরদা চিঠি দিলেন বঙ্কিমকে।'

'দেবী চৌধুরানী ত এই অঞ্চলেরই গল্প—তাই না?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তা ত বটেই', মহীতোষবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'এই যে তিস্তা নদী পেরিয়ে এলেন, এই তিস্তাই হল গল্পের ত্রি-স্রোতা নদী—যাতে দেবীর বজরা ঘোরাফেরা করত। অবিশ্যি বৈকুণ্ঠপুরের সে জঙ্গল আর নেই; সব চা-বাগান হয়ে গেছে। গল্পে যে রংপুর জেলার কথা বলা হয়েছে, একশো বছর আগে আমাদের এই জলপাইগুড়ি সেই রংপুরের ভেতরেই পড়ত। পরে যখন পশ্চিম ডুয়ার্স বলে নতুন জেলা তৈরি হল, তখন জলপাইগুড়ি পড়ল তার মধ্যে, আর রংপুর হয়ে গেল আলাদা।'

'আপনারা শিকার আরম্ভ করলেন কবে?'

প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু। মহীতোষবাবু হেসে বললেন, 'সে এক গল্প। আমার ঠাকুরদার খুব কুকুরের শখ ছিল, জানেন। ভালো কুকুরের খবর পেলেই গিয়ে কিনে আনতেন। এইভাবে জমতে জমতে পঞ্চাশটার উপর কুকুর হয়ে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। দিশি বিলিতি ছোট বড় মাঝারি হিংস্র নিরীহ কোনোরকম কুকুর বাদ ছিল না। তার মধ্যে ঠাকুরদার সবচেয়ে প্রিয় যেটি ছিল সেটি একটি ভুটিয়া কুকুর। আমাদের এদিকে জল্পেশ্বরের শিব মন্দির আছে জানেন ত? এককালে সেই মন্দিরকে ঘিরে শিবরাত্রির খুব বড় মেলা বসত। সেই মেলায় বিক্রির জন্য ভুটিয়ারা তাদের দেশ থেকে কুকুর আনত। ইয়া গাব্দাগাব্দা লোমশ কুকুর। ঠাকুরদা সেই কুকুর একটা কিনে পোষেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে সেই কুকুর চিতাবাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ঠাকুরদার তখন জোয়ান বয়স। রোখ চাপল বাঘের বংশ ধ্বংস করে শোধ তুলবেন। বন্দুক এল। বন্দুক ছোঁড়া শেখা হল। ব্যস......দেড়শোর উপর শুধু বড় বাঘই মেরেছেন ঠাকুরদা তাঁর বাইশ বছরের শিকারী জীবনে। তাছাড়া আরো অন্য কত কী যে মেরেছেন তার হিসেব নেই।'

'আর আপনি?'

এ প্রশ্নটাও করলেন লালমোহনবাবু।

'আমি?' মহীতোষবাবু হেসে ঘাড় কাত করে ডান দিকে চেয়ে বললেন, 'বল না হে শশাঙ্ক।'

একটি ভদ্রলোক কখন যে ঘরে ঢুকে এক পাশে চেয়ারে এসে বসেছেন তা টেরই পাইনি।

'টাইগার?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন নতুন ভদ্রলোকটি, 'তুমি লিখছ তোমার শিকার কাহিনী, তুমিই বল না!'

মহীতোষবাবু এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'থ্রি ফিগারসে পৌঁছতে পারিনি সেটা ঠিকই, তবে তার খুব কমও নয়। বাঘ মেরেছি একাত্তরটা, আর লেপার্ড পঞ্চাশের উপর।'

মহীতোষবাবু নতুন ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

'ইনি হচ্ছেন শশাঙ্ক সান্যাল। আমার বাল্যবন্ধু। আমার কাঠের কারবারটা ইনিই দেখাশোনা করেন।'

বন্ধু হলে কী হবে, চেহারায় আর হাবভাবে আশ্চর্য বেমিল। শশাঙ্কবাবু লালমোহনবাবুর মতো বেঁটে না হলেও, পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির বেশি নন, গায়ের রং মাঝারি, কথাবার্তা বলেন নিচু গলায়, দেখলেই মনে হয় চুপচাপ শান্ত স্বভাবের মানুষ। কোথাও নিশ্চয়ই দুজনের মধ্যে মিল আছে, যেটা এখনো টের পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে বন্ধুত্ব হবে কি করে?

'তড়িৎবাবুর কাছে একটা ম্যানইটারের কথা শুনছিলাম, সেটার আর কোনো খবর আছে কি?' জিগ্যেস করলে ফেলুদা।

মহীতোষবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন

'ম্যানইটার বললেই তো আর ম্যানইটার হয় না। আমি থাকলে দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম। তবে যে জানোয়ারেই খেয়ে থাক, সে আর দ্বিতীয়বার নরমাংসের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'যদি সত্যিই ম্যানইটার বেরোত তাহলে আপনি অন্তত সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতেন।'

'তা ধরতাম বৈকি। আমারই এলাকায় যদি নরখাদক বাঘ উৎপাত আরম্ভ করে তবে তাকে সায়েস্তা করাটা ত আমার ডিউটি!'

আমাদের শরবত খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মহীতোষবাবু বললেন, 'আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, আপনারা স্নান খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নিন। বিকেলের দিকে আমার জীপে করে আপনাদের একটু ঘুরিয়ে আনবে। জঙ্গলের

ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে, হরিণ-টরিণ চোখে পড়তে পারে, এমন কি হাতিও! তড়িৎ, যাও ত, এঁদের ট্রোফি রুমটা একবার দেখিয়ে সোজা নিয়ে যাও এঁদের ঘরে।'

ট্রোফি রুম মানে বাঘ ভাল্লুক পাইসন হরিণ কুমীরের চামড়া আর মাথায় ভরা একটা বিশাল ঘর। ঘরের মেঝে আর দেয়ালে তিল ধরার জায়গা নেই। এতগুলো জানোয়ারের জোড়া জোড়া পাথরের চোখ চারিদিক থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখলেই গা-টা ছমছম করে। শুধু জানোয়ার নয়; যেসব অস্ত্র দিয়ে এই জানোয়ার মারা হয়েছে সেগুলোও ঘরের এক পাশে একটা খাঁজকাটা র‍্যাকের উপর রাখা রয়েছে। দোনলা একনলা পাখি-মারা, বাঘ-মারা হাতি-মারা কতরকম যে বন্দুক তার ঠিক নেই।

এইসব দেখতে দেখতে ফেলুদা তড়িৎবাবুকে জিগেস করল 'আপনিও শিকার করেছেন নাকি?'

তড়িৎবাবু একটু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'একেবারেই না। আপনি গোয়েন্দা, আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না?'

ফেলুদা বলল, 'শিকারী হলেই যে ষণ্ডা লোক হতে হবে এমন ত কোনো কথা নেই। আসলে ত নার্ভের ব্যাপার। আপনাকে দেখে ও জিনিসটার অভাব আছে বলে মনে করার ত কোনো কারণ দেখছি না।'

'তা হয়ত নেই, তবে শিকারে প্রবৃত্তি নেই। আমি কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শিকার-টিকারের কথা কোনোদিন ভাবতেই পারিনি।'

ট্রোফি রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দা দিয়ে দোতলা সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'শহরের ছেলে জঙ্গলের দেশে এলেন যে বড়?'

তড়িৎবাবু বললেন, 'পেটের দায়ে। বি এ পাস করে বসেছিলাম। কাগজে সেক্রেটারির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন মহীতোষবাবু। অ্যাপ্লাই করি, ইন্টারভিউয়ে ডাক পড়ে, আসি, চাকরিটা হয়ে যায়।'

'কদ্দিন আছেন?'

'পাঁচ বচ্ছর।'

'শিকার না করলেও জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেন বোধ হয়?'

'মানে?' তড়িৎবাবু একটু অবাক হয়েই ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'আপনার ডান হাতে তিনটে আঁচড়ের দাগ দেখছি। মনে হয়

কাঁটাগাছ থেকে হতে পারে।'

তড়িৎবাবুর গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল। বললেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কালই লেগেছে আঁচড়। জঙ্গলে ঘোরা একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'হাতিয়াড় ছাড়াই?' অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তড়িৎবাবু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'ভয়ের ত কিছু নেই। এক সাপ আর পাগলা হাতির জন্য দৃষ্টিটা একটু সজাগ রেখে চললে জঙ্গলে কোনো ভয় নেই।'

'কিন্তু ম্যানঈটার?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটার অস্তিত্ব প্রমাণ হলে জঙ্গলে যাওয়া ছাড়তে হবে বৈকি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে একটা দরজা পেরোতেই একটা প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দায় এসে পড়লাম। বাঁ দিকে রেলিং, ডান দিকে

সারি সারি ঘর। প্রথম ঘরটাই নাকি মহীতোষবাবুর কাজের ঘর, তড়িৎবাবুকেও দিনের বেলা এখানেই বসতে হয়। কিছুদূর গিয়ে বারান্দাটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। এটা হল পশ্চিম দিক। এটারও ডান দিকে ঘরের সারি, আর তারই মধ্যে একটা ঘর হল আমাদের ঘর। ফেলুদা বলল, 'এত ঘরে কারা থাকে মশাই?'

তড়িৎবাবু বললেন, 'বেশির ভাগই ব্যবহার হয় না, বন্ধ থাকে। পুবের বারান্দায় একটা ঘরে মহীতোষবাবু থাকেন, আরেকটায় ওঁর দাদা দেবতোষবাবু। শশাঙ্কবাবুর ঘর দক্ষিণে। আমারও তাই। আরো দুটো ঘর মহীতোষবাবুর দুই ছেলের জন্য রয়েছে। দুজনেই কলকাতায় চাকরি করে, মাঝে মধ্যে আসে।'

এবার চোখে পড়ল আমাদের উল্টোদিকে পুবের বারান্দায় বেগুনী ড্রেসিং গাউন পরা একজন লোক রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'উনিই কি মহীতোষবাবুর দাদা?'

তড়িৎবাবু কিছু বলার আগেই গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন শোনা গেল—'তোমরা রাজুকে দেখেছ, রাজু?'

দেবতোষবাবু আমাদেরই উদ্দেশে প্রশ্নটা করেছেন। ভদ্রলোক এর মধ্যেই পুব থেকে উত্তরের বারান্দায় চলে এসেছেন, তাঁর লক্ষ্য আমাদেরই দিকে। এখন বুঝতে পারছি ভদ্রলোকের চেহারায় মহী-তোষবাবুর সঙ্গে বেশ মিল আছে, বিশেষ করে চোয়ালের কাছটায়। তড়িৎবাবু আমাদের হয়ে জবাব দিয়ে দিলেন, 'না, এ'রা দেখেননি।'

'দেখেনি? আর হোসেন? হোসেনকে দেখেছে?'

ভদ্রলোক ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এবার বুঝতে পারছি ওঁর চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। মাথার সব চুল পাকা, আর মহীতোষবাবুর মতো ঘন নয়। লম্বায় হয়ত ভাইয়ের কাছাকাছি, কিন্তু কুঁজো হয়ে পড়াতে অতটা মনে হয় না।

তড়িৎবাবু, 'না, হোসেনকেও দেখেননি' বলে আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে ইশারা করলেন।

'দেখেনি?' দেবতোষবাবুর গলায় যেন একটা হতাশার সুর।

'না', তড়িৎবাবু বললেন, 'এ'রা নতুন এসেছেন, কিছু জানেন না।'

'রাজু আর হোসেন কারা মশাই।' ঘরে ঢুকে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তড়িৎবাবু হেসে বললেন, 'রাজু হল কালাপাহাড়ের আরেক নাম; আর হোসেন হল হোসেন শা। গৌড়ের সুলতান ছিল। দুজনেই

বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। জল্পেশ্বরের মন্দিরের মাথা হোসেন খাঁ-ই ভাঙে।'

'আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না। সাহিত্য। মহীতোষবাবু জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখছেন, তাই সেক্রেটারি হিসেবে আমাকেও কিছুটা জেনে ফেলতে হচ্ছে।'

তড়িৎবাবু চলে যাবার পর আমরা তিনজন প্রথম হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেলাম। ঘরটি দিব্যি ভাল। এ ঘরেও দুটো দরজার উপর দুটো হরিণের মাথা রয়েছে। অন্য ঘরে জায়গা হয়নি বলেই বোধ হয় মেঝেতেও একটা মাথা সমেত চিতাবাঘের ছাল দুটো খাটের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুটো খাট আর একটা খাটিয়া গোছের জিনিস, সেটা বোধ হয় আগে ছিল না, আমরা তিনজন লোক বলে এনে রাখা হয়েছে। ফেলুদা খাটিয়াটা দেখে বলল, 'দেখে মনে হয় এটাকে শিকারের মাচা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, দড়ি বাঁধার দাগ রয়েছে এখনো। তোপ্‌সে, তুই ওটাতে শুবি।'

তিনটে খাটের উপরে মশারি খাটানো রয়েছে, আর রয়েছে প্রায় আট ইঞ্চি পুরু গদি, দুটো করে নকশা করা ওয়াড় লাগানো বালিশ, আর একটা করে পাশ বালিশ। লালমোহনবাবু সব দেখেটেখে বললেন, 'তিনটে দিন দিব্যি আরামে কাটবে বলে মনে হচ্ছে মশাই। তবে আশা করি, দাদাটি আর রাজু-টাজুর খবর নিতে বেশি আসবেন না এদিকটায়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং, পাগলের সান্নিধ্যটা আমার কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর।'

এ কথাটা আমারও যে মনে হয়নি তা নয়। তবে ফেলুদা ও নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হল না। বাক্স খুলে জিনিস বার করতে করতে একবার খালি ভুরু কুঁচকে বলল, 'মহীতোষবাবু আমার কাছে কী ধরনের উপকার আশা করছেন সেটা এখনো বোঝা গেল না।'

॥ ৩ ॥

তড়িৎবাবু কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে বিকেলে আর আমাদের সঙ্গে বেরোতে পারলেন না। তার বদলে এলেন মহীতোষবাবুর বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল। ইনিও দেখলাম এদিকে এতদিন থেকে জঙ্গল আর জানোয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন। সাড়ে চারটেতেই প্রায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে জীপে করে যেতে যেতে কতরকম গাছপালা আর কতরকম পাখির ডাক যে আমাদের চিনিয়ে দিলেন! ত্রিশ বছর আগে এ জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা কত বেশি ছিল তাও বললেন। ত্রিশ বছর ধরেই আছেন ভদ্রলোক লক্ষ্মণবাড়িতে। আসলে কলকাতার লোক, ইস্কুল আর কলেজে মহীতোষবাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছেন।

রোদ যখন প্রায় পড়ে এসেছে তখন একটা সরু নদীর ধারে এসে আমাদের গাড়িটা থামল। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'একবার নামবেন নাকি? চলন্ত গাড়ির ভিতর থেকে জঙ্গলের পরিবেশটা ঠিক ধরতে পারবেন না।'

জীপ থেকে নেমেই প্রথম বুঝতে পারলাম জঙ্গলটা কত গভীর আর নিস্তব্ধ। বাসায় ফিরে যাওয়া পাখির ডাক আর নদীর ঝুরিয়ে আসা জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। সঙ্গে বন্দুক না থাকলে ভয়ই করত। বন্দুক রয়েছে যার হাতে সে নাকি এখানকার একজন নামকরা পেশাদারী শিকারী। নাম মাধবলাল। আগে যখন বিদেশ থেকে শিকারীরা এখানে আসত তখন মাধবলালই নাকি তাদের গাইডের কাজ করত। কোন রাস্তায় বাঘ চলাফেরা করে, কোন গাছে মাচা বাঁধা উচিত, কোন জন্তুর ডাকের কী মানে, এসব নাকি মাধবলালই বলে দিত। বছর পঞ্চাশ বয়স, পেটানো শরীর, তাতে চর্বির লেশমাত্র নেই।

আমরা জীপ থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বালি আর নুড়ি পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। একথা সেকথার পর ফেলুদা শশাঙ্কবাবুকে জিগ্যেস করল, 'দেবতোষবাবু পাগল হলেন কি করে?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'এদের বংশে ইনিই প্রথম পাগল নন। মহীতোষের ঠাকুরদাদারও শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'তাই বুঝি? তাহলে শিকারের ব্যাপারটা...?'

'সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতের কাছ থেকে বন্দুক-টন্দুক সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। একদিন হঠাৎ বৈঠকখানার দেয়াল থেকে একটা পুরোনো তলোয়ার খুলে নিয়ে সেটাই হাতে করে জঙ্গলে চলে গেলেন বাঘ মারতে। ইস্কুলে থাকতে ইতিহাসের বইয়ে শের শা-র কথা পড়েছেন ত?—"ইনি উত্তরকালে তরবারির এক আঘাতে একটি বাঘের মস্তক ছেদন করিয়া শের আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"? —পাগল অবস্থায় আদিত্যনারায়ণের শের শা হবার শখ জাগে!'

'তারপর?' লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে চাপা গলায় প্রশ্নটা করলেন।

'সেই যে গেলেন, আর ফেরেননি। এক তলোয়ার ছাড়া আর প্রায় সব কিছুই বাঘের পেটে গিয়েছিল।'

ঠিক এই সময় কাছেই একটা জানোয়ারের চীৎকার শুনে লাল-মোহনবাবু প্রায় তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন। শশাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আপনি এত অ্যাডভেঞ্চারের বই লেখেন, আর শেয়ালের ডাক শুনেই এই অবস্থা?'

'না, মানে লেখক বলেই কল্পনাশক্তিটা একটু বেশি কিনা। আপনি বাঘের কথা বললেন, আর আমিও দেখলুম হলদে মতো কী জানি একটা ওই ঝোপটার পিছন দিয়ে চলে গেল।'

'এখনো যায়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে যেতে পারে।'

কথাটা খুব নিচু গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

'ওটাই কি বার্কিং ডিয়ারের ডাক?' ফেলুদাও ফিসফিস করে জিগ্যেস করল।

একটা জন্তু ডেকে উঠেছে কয়েকবার। অনেকটা কুকুরের মতো ডাক। বাঘ কাছাকাছি এলেই বার্কিং ডিয়ার বা কাকর হরিণ ডেকে ওঠে এটা আমি ফেলুদার কাছে শুনেছি। শশাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে আমাদের জীপে গিয়ে বসতে ইশারা করলেন। আমরা প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম। অন্ধকার আরো বেড়েছে। হরিণটা আবার ডেকে উঠল। জীপের হুড ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই আশেপাশে কোনো জানোয়ার এলে আমরা সবাই দেখতে পাব। আমার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছে। মাধবলালও

গাড়ির কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লালমোহনবাবু একবার আমার হাতটা ধরাতে বুঝতে পারলাম ওঁর হাতের তেলো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

প্রায় ছ'টা পর্যন্ত দম বন্ধ করে অপেক্ষা করেও কোনো জানোয়ার দেখতে না পেয়ে আমরা বাড়ি চলে এলাম।

সন্ধ্যার দিকে পশ্চিমের আকাশ দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল, আর চোখ ধাঁধানো শিকড় বার করা বিদ্যুতের আকাশটা বার বার চিরে যেতে লাগল। আমরা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলাম, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খোলাই ছিল, ঘুরে দেখি মহীতোষবাবু।

'কিরকম বেড়ালেন?' ভদ্রলোক তাঁর জাঁদরেল গলায় প্রশ্ন করলেন।

'আমরা আরেকটু হলেই বাঘ দেখে ফেলেছিলাম!' ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'বছর দশেক আগে এলে নিশ্চয়ই দেখে ফেলতেন,' বললেন মহীতোষবাবু, 'আজ যে দেখতে পেলেন না, তার জন্যে অবিশ্যি আমাদের মতো শিকারীরাই খানিকটা দায়ী। শিকারটাকে যে স্পোর্টের মধ্যে ধরা হত কিনা। আজকে নয়, আদ্যিকাল থেকে। পৌরাণিক যুগে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন। মোগল বাদশারাও যেতেন। ইদানিংকালে আমাদের দু'শো বছরের প্রভু সাহেবরাও যেতেন, আর আমরাও গেছি। এই দু'হাজার বছরে তীরের ফলা আর বন্দুকের গুলিতে কত জানোয়ার মরেছে ভাবতে পারেন? তারপর সার্কাস আর চিড়িয়াখানার জন্য কত জন্তু-জানোয়ার ধরা হয়েছে তার কোনো হিসেব আছে কি?'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ার এগিয়ে দেওয়াতে ভদ্রলোক বললেন, 'বসব না। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি। চলুন, আমার ঠাকুরদার ঘরে চলুন। ঘরটা দেখেও আনন্দ পাবেন।'

মহীতোষবাবুর ঠাকুরদার ঘর উত্তর দিকের বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণে। ঘরের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ঠাকুরদার শেষ বয়সে পাগল হয়ে যাওয়ার গল্প শুনেছিলাম শশাঙ্কবাবুর কাছে।'

মহীতোষবাবু একটু হেসে বললেন, 'পাগল হবার আগে ষাট বছর বয়স অবধি তার মতো পরিষ্কার মাথা খুব কম লোকেরই দেখেছি।'

'যে তলোয়ারটা দিয়ে বাঘ মারতে গিয়েছিলেন সেটা এখনো আছে কি?'

'সেটা ঠাকুরদার ঘরেই আছে। চলুন দেখাচ্ছি।'

আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়ের ঘরের তিন দিকের দেয়ালে আলমারীতে ঠাসা বই, পুঁথিপত্র আর খবরের কাগজের ডাঁই। অন্য দিকের দেয়ালের সামনে রয়েছে দুটো সিন্দুক আর একটা কাঁচের আলমারি। আলমারির মধ্যে খুঁটিনাটি কত রকম যে জিনিস রয়েছে তা একবার দেখে মনে রাখা অসম্ভব। বাঘের নখ, গণ্ডারের সিং,

হাতির দাঁত আর ধাতুর তৈরি নানারকম ছোটবড় মূর্তি, পাথর বসানো ভুটিয়া গয়নাগাটি, তাঁর প্রিয় ভুটিয়া কুকুরের গলার বকলস—তাতেও লাল নীল হলদে পাথর বসানো। এ ছাড়া আছে একটা রুপোর কলম আর দোয়াত, একটা মোগল আমলের দূরবীন, আর দুটো মড়ার মাথার খুলি। ওপরের দুটো তাকের এই জিনিসগুলোর কথা আমার মনে আছে। নিচের দুটো তাকে রয়েছে খালি অস্ত্রশস্ত্র। কারুকার্য করা তিনশো বছরের পুরোন পিস্তল, গোটা অষ্টেক ছোরা, ভোজালি আর কুকরি, আর একটা তলোয়ার। এই তলোয়ারটা নিয়েই আদিত্যনারায়ণ বাঘ মারতে গিয়েছিলেন। পাগল না হলে এমন কাজ কেউ করে না, কারণ তলোয়ারটা খুব বেশি বড় নয়। বিকানিরের কেল্লায় রাজপুত রাজাদের যে তলোয়ার দেখেছিলাম সেগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি বড় আর ভারি।

ইতিমধ্যে মহীতোষবাবু একটা সিন্দুক খুলে তার ভিতর থেকে একটা হাতির দাঁতের কাজ করা ছোট্ট বাক্স বার করে এনেছেন। এবার সেটা থেকে একটা পুরোন ভাঁজ করা কাগজ বার করে বললেন, 'ডিটেকটিভদের ত নানারকম ক্ষমতা থাকে শুনেছি। আপনি হেঁয়ালির সমাধান করতে পারেন কি, মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদা বলল, 'এককালে ওদিকটায় ঝোঁক ছিল সেটা বলতে পারি।'

ফেলুদা একটা ইংরিজি সংকেতের সমাধান করেছিল সোনার কেল্লার ব্যাপারে। বাংলা আর ইংরেজি হেঁয়ালির অনেক বই ওর কাছে আছে, আর 'বিদগ্ধমুখমণ্ডনম' বলে একটা সংস্কৃত হেঁয়ালির বইও আছে। মহীতোষবাবু এবার হাতের কাগজটা ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'আপনারা তিনদিন থাকবেন বলছিলেন। তার মধ্যে যদি এই সংকেতের সমাধান না হয়, তাহলে আরো তিনটে দিন সময় দিতে পারি। তারপরে—আর না।'

শেষের ক'টা কথা বলার সময় ভদ্রলোকের স্বরটা যে কিরকম-ভাবে বদলে গেল তা ঠিক লিখে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে মহীতোষবাবুর ভিতরে একটা কঠিন মানুষ রয়েছে, আর সময় সময় সেই মানুষটা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। যেমন এখন পড়ল। গলার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষবাবুর চোখের চাহনিটাও বদলে গিয়েছিল, আর সেটা স্বাভাবিক হবার আগেই ফেলুদার প্রশ্ন এল—

'আর যদি পারি?'

ফেলুদা যে ঠিক কড়া ভাবে প্রশ্নটা করেছিল তা নয়। এমন কি করার সময় ঠোঁট আর চোখের কোণে একটা হালকা হাসির ভাবও ছিল; কিন্তু এও বুঝতে পারলাম যে মহীতোষবাবুর ভিতরে শক্ত মানুষটাকে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি ফেলুদার আছে।

মহীতোষবাবু এবার বেশ সহজভাবে হেসে বললেন, 'যদি পারেন ত আমার মারা বড় বাঘের একটা ছাল আমি আপনাকে উপহার দেব।'

আজকালকার দিনে একটা রয়েল বেঙ্গলের ছাল যে নেহাত ফেলনা জিনিস নয় সেটা আমি জানতাম।

মহীতোষবাবুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে তাতে মুক্তোর মতো হাতের লেখা সংকেতটা ফেলুদা একবার বিড় বিড় করে পড়ল—

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।

আপনার ঠাকুরদা কি কোনো গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছেন এই সংকেতে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আপনার কি তাই মনে হয়?'

'শেষের লাইনটাতে ত সেই রকমই একটা ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়। সন্ধানে ধন্দায় নবাবে। এমন জিনিস যার সন্ধান পেলে নবাবের মনও ধাঁধিয়ে যায়। ধনদৌলতের কথাই ত মনে হয়। অবিশ্যি আপনার ঠাকুরদা সেরকম লোক ছিলেন কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। সকলে ত আর সংকেত লিখে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে না।'

'ঠাকুরদার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব ছিল। তিনি চিরকালই খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন, রং-তামাশা করতে ভালোবাসতেন, প্রাকটিক্যাল জোক পছন্দ করতেন। ছেলেবয়সে একবার বাড়ির গুরুজনদের উপর রাগ করে মাঝরাত্তিরে উঠে তাঁদের প্রত্যেকের চটি জুতো খড়ম নাগরা সব নিয়ে তালগাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন। এটা যদি গুপ্তধনের সংকেত হয় তাহলে সেটাও তার খামখেয়ালিপনারই একটা নমুনা বললে বোধহয় ভুল হবে না। মোটকথা আপনি—কী চাই, তড়িৎ?'

তড়িৎবাবু যে কখন দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন তা

টেরই পাইনি। ভদ্রলোক শান্তভাবেই বললেন, 'চরিতাভিধানটা নিয়েছিলাম, সেটা রেখে দিতে এসেছি।'

'ঠিক আছে, রেখে যাও। আর প্রুফটা দেখা হয়ে গিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে কাল ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আর সেকেন্ড প্রুফেও এত ভুল থাকে কেন এই নিয়ে কড়া করে কথা শুনিয়ে দিয়ে এস ত।'

তড়িৎবাবু হাতের বইটা আলমারির তাকে একটা ফাঁকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

মহীতোষবাবু বললেন, 'তড়িৎ কাল দিন সাতেকের জন্য কলকাতা যাচ্ছে। ওর মা-র অসুখ।'

ফেলুদা এখনো ছড়াটার দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সংকেতের কথা আর কে জানে?'

মহীতোষবাবু ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এটা পাওয়া গেছে এই দিন দশেক হল। আমাদের বংশের ইতিহাস লিখব বলে পুরোন বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটে দলিলপত্তর বার করছিলাম। একটা স্টীল ট্রাঙ্কে ঠাকুরদার চিঠিপত্র ছিল। ফিতের বাঁধা চিঠির তাড়ার তলা থেকে এই কাগজটা বেরোয়। আসলে কী জানেন—এটার কথা যে-ক'জন জানে—অর্থাৎ আমি, শশাঙ্ক আর আমার সেক্রেটারি—তাদের কারুরই ক্ষমতা নেই এর মানে উদ্ধার করার। এটার জন্যে একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। ভাষার মার-প্যাঁচ জানা চাই। সেটা আপনি জানেন কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।'

ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

'সে কি, আপনি কি হাল ছেড়ে দিলেন নাকি?' মহীতোষবাবু ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলেন।

ফেলুদা হেসে বলল, 'না। ওটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ঘরে গিয়ে খাতায় লিখে নিচ্ছি। এটা আপনাদের মূল্যবান পারিবারিক সম্পত্তি, এটা আপনাদের কাছেই থাকুক।'